রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

শালবীথিকা

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

প্রমথনাথ বিশী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

অধ্যায়সূচী

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

চিত্রগুলি রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত। 'ঘরের বাহিরে ক্লাস', 'বীথিকাগৃহ' ও মলাটের ছবি Raymond Burnier -কর্তৃক গৃহীত; এই গ্রন্থের অন্যান্য ছবিগুলি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণলাল ঘোষ, সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, পিনাকিন ত্রিবেদী প্রভৃতি -কর্তৃক গৃহীত

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনতম ছাত্র

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করকমলেষু

প্রথম অভিজ্ঞতা

এতদিন পরেও আজ আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার দিনে বোলপুরের রেলস্টেশনটি ছোটো ছিল; স্টেশনের বাহিরে বটগাছের তলে কয়েকখানা গোরুর গাড়ি থাকিত; তারই একখানা গাড়ি চড়িয়া শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা হইলাম। যখন আশ্রমে গিয়া পৌছিলাম তখন অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কোথায় নামিলাম, কোন্ ঘরে গিয়া বসিলাম, কাদের সঙ্গে প্রথম কথা বলিলাম, সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ পরেই খাবার ডাক পড়িল। এখন যেখানে লাইব্রেরি তার উত্তর দিকে বড়ো একখানি টিনের ঘর ছিল, তখনকার দিনে সেটি ছিল খাবার ঘর, আর এখন যেখানে আপিস-বাড়ি তারই খানিকটা অংশ ছিল রান্নাঘর। এই টিনের ঘরে লম্বা করিয়া চটের আসন পাতা, শালপাতা আর গেলাস-বাটি সাজানো—এই রকম পাঁচ-ছয়টি সুদীর্ঘ শ্রেণী। খাবারের আয়োজনের মধ্যে খিচুড়ি ও পায়েসের ব্যবস্থা ছিল মনে পড়ে। প্রথম সূচনা নেহাত মন্দ লাগিল না।

তার পরে কে যেন আমাকে শোবার জন্য 'বীথিকা' ঘরে লইয়া গেল। সেবার বোধ করি বীথিকা-গৃহ নূতন তৈরি হইয়াছে। বিছানায় গিয়া শুইলাম। সন্ধ্যাবেলা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, নূতন-ছাওয়া চালে খড়ের সিক্ত গন্ধ পাইলাম। এই উদ্ভিজ্জ স্নিগ্ধ সুবাসেই আমার শান্তিনিকেতনের প্রথম যথার্থ অভিজ্ঞতা। তার পরে তো কত বছর কাটিয়া গিয়াছে, কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্তর জীবনের উপর জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখনই খড়ের চালের সিক্ত সুগন্ধ পাই, আমার সেই প্রথম রাত্রিটির কথা মনে পড়িয়া যায়। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, যখন জাগিলাম দেখি অনেক বেলা। অন্য ছেলেরা অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, আমাকে নূতন ছেলে বলিয়া বোধ করি জাগাইয়া দেয় নাই। সেই প্রথম দিনের আলোয় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয়—যেখানে জীবনের সতেরো বছর-কাল কাটিবে সেখানকার সেই প্রথম প্রভাত।

বাহিরে আসিয়া সবচেয়ে বিস্ময়ের লাগিল—ব্যাপারখানা কী! ছেলেরা মাঠের মধ্যে ইতস্তত আসন পাতিয়া বসিয়া কেন? ইহার অনুরূপ তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! গ্রামের ছেলে আমি, মনে কৌতূহল ছিল, কিন্তু

কৌতূহলনিবৃত্তির সাহস যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। তার পর দেখিলাম, ছেলের দল এক জায়গায় সমবেত হইয়া সমস্বরে কী যেন আবৃত্তি করিয়া গেল। একটা সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া মনে হইল। এই পর্ব সমাধা হইলে সকলে সারবন্দীভাবে জলযোগের জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

এতদিন পরে সব কথা অবিকল মনে থাকিবার নয়। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হয়তো দশটা ঘটনা মিলিয়া একটা ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; কত ঘটনার মেল-বন্ধন ভাঙিয়া নূতন পর্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; আবার পরের ঘটনা আগের উপরে আরোপিত হইয়াছে।

ইহার পরে মনে পড়ে— আমাকে ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিবার কথা। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এক-এক বিষয় উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতে পাইত; ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসকে যদি প্রথম শ্রেণী বলা যায়, তবে দশম শ্রেণী নিম্নতম। কোনো ছেলে বাংলা-ইংরেজীতে হয়তো সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, গণিতে সে অষ্টম-শ্রেণীভুক্ত। বছর-শেষে সব বিষয়ে যাহাতে সে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া লাভ কী— আমি নিজেই এইরূপ বিচিত্র শ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলাম।

গণিতে আমি বরাবর এক শ্রেণী নীচে পড়িতাম। বছর-শেষে আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করিয়া তুলিতে কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু গণিতে শূন্যবাদ প্রচার করিবার জন্যই যাহার জন্ম কর্তৃপক্ষের তাড়না তাহার কী করিবে? ফলে এই হইত যে, বছর-শেষে গণিতে আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমান করিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইত। দু-একদিন সেই নূতন ক্লাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া গণিতে নীচের ধাপে ফিরিয়া আসিতাম। ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই নিশ্চিন্ত হইতেন।

একবার এই রকম একটা ডবল প্রমোশনের কথা বেশ মনে আছে। এই ব্যাপারে আমার আর-একজন সঙ্গী ছিল— ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কোনো বিষয়েই যে আমার অনন্যসাধারণত্ব নাই, ইহা তাহাই মাত্র প্রমাণ করে। এখন আমরা তো দুটিতে নূতন ক্লাসে গুটি গুটি গিয়া এক টেরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলাম। শরৎবাবু ছিলেন শিক্ষক; আমাদের গণিতবিদ্যার খ্যাতি অজ্ঞাত

ছিল না, পাছে তাঁহার চোখে পড়িয়া যাই সেই ভয়ে একটু আড়ালেই বসিয়াছিলাম। শরৎবাবু ব্ল্যাক্‌বোর্ডে একটি অঙ্ক লিখিয়া দিলেন, তাতে 'হন্দর' কথাটি ছিল। এখন, আমরা দুজনে ইতিপূর্বে কখনো হন্দর শব্দ শুনি নাই। প্রথম শ্রবণে শব্দটা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একে অঙ্কের ক্লাস, তার উপরে শরৎবাবুর কালবৈশাখীর মেঘের মতো গাম্ভীর্য ও শিলাবর্ষণের খ্যাতি, কাজেই হাসিবার মতো আমাদের ঠিক মনের অবস্থা ছিল না— আমরা সর্বজ্ঞের গম্ভীরতা মুখে টানিয়া আনিয়া খাতার পাতায় আঁকজোক কাটিতে লাগিলাম।

সঙ্গী আমাকে শুধাইল, " 'হন্দর' মানে কী?"

আমি বলিলাম, "ওটা বোধ হয় লেখার ভুল। হাঙ্গর হবে।"

সে বলিল, "জিজ্ঞাসা করো-না।"

আমি বলিলাম, "চুপ করো। অন্তত একটা দিনও ডবল প্রমোশন ভোগ করতে দাও।"

অগত্যা চুপ করিয়া থাকিবার পরামর্শই গৃহীত হইল। কিন্তু এত বিদ্যা কি অধিকক্ষণ চাপা থাকিতে পারে! কিছুক্ষণের মধ্যেই শরৎবাবু আমাদের সম্যক পরিচয় লাভ করিলেন এবং পত্রপাঠ নীচের ক্লাসে পাঠাইয়া দিলেন। আসিবার পূর্বে বুঝিলাম, শরৎবাবু সম্বন্ধে যে-সব খ্যাতি আছে তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক-ভাবে সত্য।

আমার গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে এরকম উদাহরণ অগণিত— আর-একটা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নগেন আইচ মহাশয় আমাদের গণিতশিক্ষক ছিলেন, আবার পরীক্ষকও। সেবার প্রশ্নপত্রে বারোটি অঙ্ক দিয়াছিলেন, যে-কোনো দশটি করিতে হইবে। আমি দেখিলাম অত্যল্পকাল মধ্যে দশটি হইয়া গেল, দুটাই বা বাকি থাকে কেন! সে দুটাও করিলাম। কেবল একটি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলাম না, তবে কি আমি একশো নম্বরের মধ্যে একশো কুড়ি পাইব। মন্দ মজা হইবে না। মজা ভালোই হইল এবং তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতে হইল না। বিকালবেলায় ভূগোলের পরীক্ষা, আমি দ্রাঘিমা ও বিষুবরেখার আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিচারে নিযুক্ত, এমন সময়ে আইচ মহাশয়ের প্রবেশ; হাতে একখানা খাতা। নিমেষপাত মাত্রে বুঝিলাম খাতাখানা আমারই। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল একশো নম্বরের মধ্যে একশো কুড়ির সমাধান করিতে না পারিয়া অবশেষে আমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছেন।

(ভুল তো আমার কখনোই হইতে পারে না)। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল এ তো অভিনন্দনজ্ঞাপক মূর্তি নহে। তিনি রুদ্রকণ্ঠে শুধাইলেন, "এ কী করিয়াছ?"

"আজ্ঞে, ভুল হইয়াছে কি?"

"ভুলের কথা হইতেছে না, ভুল ছাড়া তুমি কী করিবে। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় এটা কী?"

"একটি কবিতা।"

"একে তো সবগুলি অঙ্ক ভুল করিলে, সে কথা ধরি না, কবিতা লিখিতে গেলে কেন?"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "হাতে কিছু সময় ছিল, ভাবিলাম কেন নষ্ট করিব তাই কবিতাটা লিখিলাম।"

ততক্ষণে কয়েকজন অধ্যাপক আসিয়া জুটিয়াছেন— ব্যাপার কী?

"দেখুন ছোকরার কাণ্ড। অঙ্কগুলি তো সব ভুল করিয়াছে, সে কথা ধরি না, উহার কাছে সদুত্তর কেহ প্রত্যাশা করে না, তার পরে কিনা অঙ্কের খাতায় কবিতা।"

ভাবটা এই যে ইতিহাস বা ভূগোলের খাতায় হইলে অপরাধ অমার্জনীয় হইত না।

"এখন একে নিয়ে কী করা যায় বলুন।"

কে কী বলিবেন। কারণ এ রকম অপরাধের নজির আশ্রমের ইতিহাসে নাই— কাজেই সকলে গভীর চিন্তার নীরবতা অবলম্বন করিলেন।

"চলিলাম আমি গুরুদেবের কাছে।"

আইচ মহাশয় সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। আমার বিষুবরেখা তখন শূন্যময় এবং দ্রাঘিমা লঘিমায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের ও গুরুদেবের যথেষ্ট রসিকতা জ্ঞান থাকায় সুপ্রীম কোর্টে আমার সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল।

গুরুদেব খাতাখানা আগাগোড়া দেখিয়া বলিলেন, "নগেন, অঙ্কগুলা তো হয় নাই দেখাই যাইতেছে, কিন্তু যাই বলো বাপু, কবিতাটা কিন্তু তো হইয়াছে। আহা কী সরল স্বীকারোক্তি ও আন্তরিকতা। শোনো না—

হে হরি হে দয়াময়
কিছু মার্ক দিয়ো আমায়।
তোমার শরণাগত
নহি সতত
শুধু এই পরীক্ষার সময়।

"ওর বয়সের কথা ছাড়িয়া দাও, এমন কয়জন প্রবীণ ভক্ত কবি আছে যে প্রশ্নপত্রের দশটা অঙ্কের উদ্যত দশখানা খড়্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এভাবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারে। ওকে অঙ্ক কষাইতে চেষ্টা করো, তাই বলিয়া কবিতা লেখায় বাধা দিয়ো না।"

আমি তখনো লঘিমা সিদ্ধি করিতেছি এমন সময়ে বিচারে সর্বস্ব খোয়ানো মুখচ্ছবি নগেনবাবু প্রবেশ করিয়া খাতাখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, "নাও, এখন থেকে অবাধে কবিতা লিখিয়া যাও, কেহ বাধা দিবে না!" নগেনবাবু আমার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন। এ রকম কত না লোকের কত না হতাশার ভগ্ন সেতুর উপর দিয়া না আমার জীবনযাত্রার পথ। এ পর্যন্ত যে টিকিয়া আছি ইহাই আশ্চর্য।

গণিত সম্বন্ধে অজ্ঞতা কবুল করায় লোকের সন্দেহ হইতে পারে, ম্যাট্রি-কুলেশনের ঘাঁটি পার হইলাম কী উপায়ে! বলা বাহুল্য, জ্যামিতির সাহায্য না পাইলে ইহা কখনোই সম্ভব হইত না। জ্যামিতি এমন মুখস্থ করিয়াছিলাম যে, প্রথম হইতে শেষ, আবার শেষ হইতে প্রথম পর্যন্ত অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতাম। লোকে বলিত, জ্যামিতি বুঝিয়া লইলে নাকি মুখস্থ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। হয়তো তাই। কিন্তু ওরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি লইবার সাহস আমাদের ছিল না।

এ-সব তো অনেক পরের ঘটনা। প্রথম দিন আমার যখন শ্রেণীনির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিল কে একজন যেন বলিলেন, "একে গুরুদেবের ক্লাসে নিয়ে যাও।" গুরুদেব বলিতে যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝায় তাহা জানিতাম না। আর সত্য কথা বলিতে কী, তখন রবীন্দ্রনাথের নামই শুনি নাই— এমন-কি, তাঁহার কোনো কবিতাও পড়ি নাই।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের দোতালায় থাকিতেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার বয়সের কয়েকটি ছেলে, আর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ। অমনো

তাঁহার চুলদাড়ি সব পাকে নাই; কাঁচা-পাকায় মেশানো, কাঁচার ভাগই বোধ করি বেশি। পরনে পায়জামা ও গায়ে পাঞ্জাবি। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, আগের সূত্র অবলম্বন করিয়া অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। তিনি একজন ছাত্রকে বলিলেন, "আচ্ছা, ইংরিজিতে বল্ তো— সবির একটি গাধা আছে।"

সবি ক্লাসের অপর একটি ছেলের নাম।

ছাত্রটি নির্বিকারচিত্তে বলিয়া গেল Sabi is an ass। আমরা কেহ হাসিলাম না, কারণ গাধা থাকার ও গাধা হওয়ার ভেদ সেই বয়সে বোধ করি আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দেখলি সবি, তোকে গাধা বানিয়ে দিলে?" ইহাতেও সবি হাসিল না। বোধ করি পদবৃদ্ধির লোপ হওয়াতে সে কিছু ক্ষুণ্ণই হইল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথমতম স্মৃতি। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ সূত্রটাকেই অবলম্বন করিয়া বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথের কত স্মৃতি জমিয়া উঠিয়াছে। ফলে এই ঘটনাটি যেন আমার কাছে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়া তাঁহার রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার রসসৃষ্টির শক্তি, শিশুমনের সঙ্গে সমসূত্রে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন— এ সমস্তই রবীন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাদান যাহার ব্যাবসা তেমন লোক হইলে এই ঘটনায় না জানি কী অনাসৃষ্টি করিয়া বসিত! কিন্তু শিক্ষাদানে যাঁহার সহজাত প্রতিভা তিনি কী অনায়াসে সমস্ত ঘটনাটির উপরে শুভ্র কাশকুসুমের মতো একটি হাসির হিল্লোল বুলাইয়া দিয়া ইংরেজি তর্জমার আবহাওয়া হইতে তাহাকে একেবারে রূপকথার অনির্বচনীয়তা দান করিলেন!

প্রাচীন শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এখন সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু সে ইতিহাস এমনই চিত্তাকর্ষক যে তাহার পুনরুক্তিতে দোষ নাই। যে ভূখণ্ড জুড়িয়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এক সময়ে তাহা জনশূন্য তরুশূন্য নির্জন প্রান্তর মাত্র ছিল। কথিত আছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময়ে এই স্থানটির প্রতি আকৃষ্ট হন। রায়পুরের সিংহ জমিদারেরা মহর্ষির ভক্ত

ছাতিমতলায় তিনি ধ্যানের আসন পাতিলেন

হারই পূব দিকে উপাসনার জন্য একটি মন্দির

পৃ. ১৮
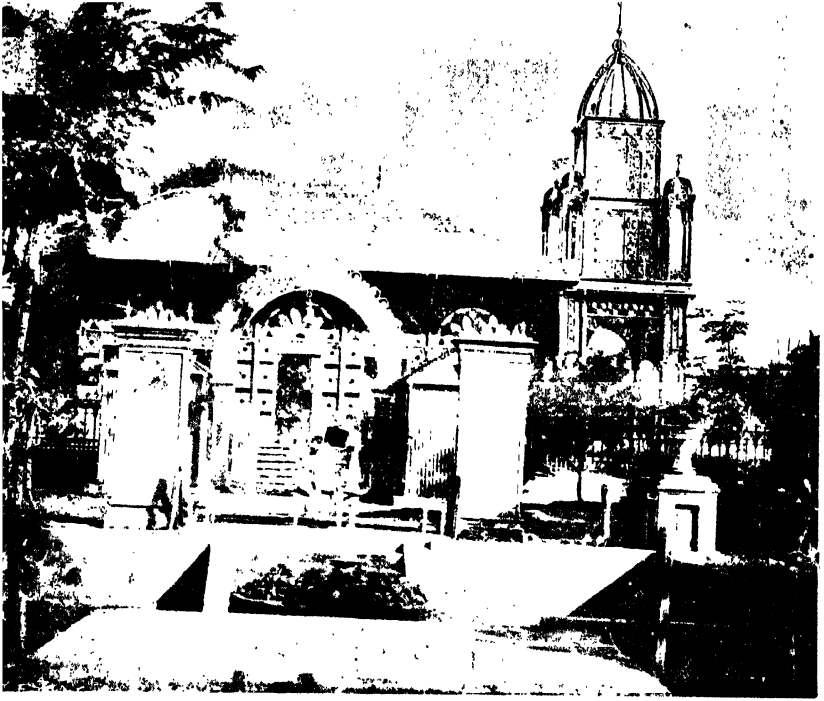
ছিলেন। এই পরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহর্ষির একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন— ইঁহার কথা 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার পাকা সড়ক আছে— এই সড়ক ধরিয়া রায়পুর গেলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ পড়িবার কথা নয়। তবে মহর্ষির পথে এই মাঠ পড়িল কেমন করিয়া? আমার বিশ্বাস, কোনো একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময় মহর্ষি আমদপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন। সিউড়ি হইতে বোলপুর যাইবার যে সড়ক আছে আমদপুর স্টেশনে নামিয়া তাহা ধরিয়া বোলপুর হইয়া রায়পুর যাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চলিলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। সে যাই হোক, এখানকার অবারিত অনন্ত শূন্য প্রান্তর মহর্ষির বড়োই ভালো লাগিয়া যায়। মাঠটি একেবারে রিক্ত ছিল না— ইহারই একান্তে ছিল দুটি ছাতিমতরু; এই বৃক্ষযুগলই প্রান্তরটির আদিমতম অধিবাসী। এই মাঠ রায়পুরের জমিদারির অন্তর্গত। মহর্ষি রায়পুরের বাবুদের কাছ হইতে ছাতিমতরুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েক বিঘা জমি কিনিয়া লইলেন। এইখানে তাঁহার ধ্যানের আসন পাতিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প।

মহর্ষি-চরিত্রের অনেকগুলি বিশিষ্টতার মধ্যে ধ্যানপরায়ণতা ও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র এই দুটি পৈতৃক গুণের সব চেয়ে বেশি অধিকারী হইয়াছেন। একাধারে ধ্যানী ও প্রকৃতিরসিক না হইলে কোনো ব্যক্তির এই নির্জন প্রান্তর ভালো লাগিবার কথা নয়। মহর্ষির অন্তরে যে অনন্ত বিরাজ করিতেছিলেন এই অবারিত মাঠে সেই বিরাটের আকাশ-ভরা সিংহাসন স্থাপিত দেখিতে পাইলেন। ছাতিমতলায় তিনি ধ্যানের আসন পাতিলেন। ছাতিম গাছ-দুটির পুব দিকে একটি দোতালা বাড়ি তৈরি হইল— ইহাই শান্তিনিকেতনের আদিতম নিবাস।

এই মাঠ তরুশূন্য হইলেও এখানে যেমন দুটি ছাতিম গাছ ছিল, তেমনি ইহা জনশূন্য হইয়াও একেবারে বিজন ছিল না— এখানে এক দল ডাকাতের বাস ছিল। ডাকাতি করিবার এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায় পাওয়া যাইবে! শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে একটি জলাশয় আছে, তারই ধারে ভুবনডাঙা গ্রাম। ডাকাতেরা এই গ্রামের অধিবাসী। শুনিয়াছি যে, ডাকাতেরা মহর্ষির প্রভাবে এই ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য গ্রহণ করে। এই ডাকাতদলের সর্দারকে ছোটোবেলায় আমরা শান্তিনিকেতনের পরিচারকরূপে দেখিয়াছি।

লম্বা একহারা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, গোঁফদাড়ি কামানো, চুল পাকা, রঙ কালো, স্বল্পভাষী লোকটি। সে নাকি লাঠি ও তরবারি খেলায় ওস্তাদ ছিল, আর রণ্‌পা চড়িয়া এক রাত্রিতে নাকি বর্ধমান গিয়া ডাকাতি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, ভোররাত্রিতে নিজের বাড়িতে ভালোমানুষটির মতো ঘুমাইয়া থাকিত।

আমি শান্তিনিকেতনের রীতিমত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, স্মৃতিকথা মাত্র লিখিব। স্মৃতির ঝুলিতে হাত ঢুকাইয়া দিব, কী যে উঠিয়া আসিবে তাহা আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না—যদি কেহ কৌতূহলী পাঠক থাকেন, তবে তাঁহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তবু প্রাচীন শান্তি-নিকেতন-পল্লীর আভাস এখানে দিবার চেষ্টা করিব, স্মৃতিগ্রন্থের পক্ষে হয়তো তাহা অপ্রাসঙ্গিক—কিন্তু ত্রিশ বছরেরও বেশি আগে এখানকার কী চেহারা ছিল তাহা কৌতূহলজনক মনে হইতে পারে। বিশেষত, দ্রুতবিবর্তনশীল এই প্রতিষ্ঠানের পূর্বরূপ একেবারে বিস্মৃত হইবার মতো হইয়াছে। হঠাৎ ত্রিশ বছর পরে কেহ এখানে গেলে পূর্বতন পল্লীকে কিছুতেই আর চিনিতে পারিবে না—কাজেই এই উপলক্ষে আগের চেহারাটা এক জায়গায় অঙ্কিত হইয়া থাক্।

শান্তিনিকেতনের আদিম দোতালাটিকে কেন্দ্র করিয়া ধরিলে ইহার উত্তরে লাল কাঁকরের পথের দুই দিকে দুই সারি আমলকী গাছ—এই আমলকীবীথি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি ফটক, কিন্তু তাহাতে কোনোকালে কপাট ছিল না। ইহারই পুব দিকে উপাসনার জন্য একটি মন্দির। শ্বেত-পাথরের মেঝে, টালির ছাদ, লোহার ফ্রেমে নানা রঙের কাচের চৌকা দেয়ালের কাজ করিতেছে; চারি দিকে টগর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। মন্দিরের পুবে একটা অর্ধখনিত পুকুর, বেলে মাটি বলিয়া জল ওঠে নাই, বর্ষাকালে বৃষ্টির জল জমে মাত্র। এই পুকুর-খোঁড়া মাটি তুলিয়া পুব দিকে একটা স্তূপ—আমরা সেটাকে পাহাড় বলিতাম। এই পাহাড়ের উপরে কালক্রমে বট-আমলকীর গাছ জন্মিয়া জংলা হইয়া গিয়াছে। বট গাছটার তলায় ছোটোবেলায় শ্বেতপাথরের একটা বেদী দেখিয়াছি। মহর্ষি নাকি প্রাতঃকালে এখানে বসিয়া সূর্যোদয় সম্মুখে করিয়া উপাসনা করিতেন। ছাতিমতলার বেদী সূর্যাস্তমুখী। প্রচ্ছন্ন কবি না হইলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া নিজের অধ্যাত্মজীবনকে কে আর গড়িয়া তুলিতে পারে—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার যোগ্য পুত্র।

শান্তিনিকেতনের পাকা বাড়ির দক্ষিণে আর-একটি লাল পথ— দু দিকে আম-বাগান। এই পথ যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানেও একটি কপাটহীন ফটক— এই দুই ফটকের শ্বেতপাথরের ফলকে ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্ত্রগুলি সানুবাদ লিখিত। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে-লম্বা আর-একটি কাঁকরের লাল পথ— তার দক্ষিণ দিকে বনস্পতি শালের শ্রেণী। এই শাল গাছের ছায়ায় ছাত্রদের বাসের জন্ত খড়ের লম্বা লম্বা ঘরগুলি। এই পথটির পূর্ব প্রান্ত বোলপুর-সিউড়ি সড়কে আসিয়া মিশিয়াছে। সেখানে আম কাঁঠাল পেয়ারা আমলকী গাছের মধ্যে আর-একটা ছোটো কোঠাবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করিবার জন্ত ইহা গড়িয়া লইয়াছিলেন। এই পথের পশ্চিম প্রান্ত মাঠের মধ্যে গিয়া শেষ হইয়াছে— সেখানে আর-একটা ছোটো কোঠাবাড়ি ছিল— তাহা একাধারে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। তাহারই পাশে আশ্রমের পাকশালা। আশ্রমের কিছু দক্ষিণে পূর্বোক্ত জলাশয়ের উত্তর তীরে কয়েকখানি টালির ঘর লইয়া ছোটো একটি বাড়ি— ইহাকে নিচুবাংলা বলিত। জলাশয়ের দক্ষিণ তীরে ভুবনডাঙা গ্রাম— গ্রামের কোলাহল জলাশয়ের উপর দিয়া স্নিগ্ধতর মৃদুতর হইয়া এই বাংলাবাড়িতে আসিয়া পৌঁছায়।

আশ্রমের রোগীদের জন্ত একটি ঔষধালয় ও হাসপাতাল ছিল— সেই পাহাড়টার পুব দিকে। তখনকার দিনে না ছিল বিদ্যুতের আলো, না ছিল জলের কল। রবি নামে একজন ভৃত্য লণ্ঠন সাজাইয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। প্রত্যেক ঘরে গোটা-দুই করিয়া ঝোলানো লণ্ঠন থাকিত। কাগজ ও আঠা দিয়া ভাঙা চিম্‌নি জোড়া দিবার কাজে রবি এমনই 'এক্‌স্‌পার্ট' হইয়াছিল যে আমরা বলিতাম, সে চিম্‌নির এক টুকরা কাচ পাইলেই একটা আস্ত চিম্‌নি তৈরি করিয়া ফেলিতে পারে। তার পরে এক সময়ে বিদ্যুতের আলো খুঁটিতে খুঁটিতে তার বিস্তার করিয়া দেখা দিল, তখন রবির শতভিন্ন চিম্‌নিসহ লণ্ঠনগুলা কোথায় গা-ঢাকা দিল। অনেকে বলে, আর কোথাও নয়, স্বয়ং রবির বাড়িতেই হইবে। এই রবিকে লইয়া মাঝে মাঝে বেশ মজা হইত। সন্ধ্যাবেলা কোনো ঘরে হয়তো আলো পৌঁছে নাই, রবির নাম ধরিয়া কেহ ডাকিতেছে। অন্ধকারে আম-বাগানের মধ্য দিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়তো যাইতেছিলেন, তিনি নিজের নাম শুনিয়া উত্তর দিয়া বসিলেন। তখন অপর পক্ষের সে কী অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুত পলায়ন!

আশ্রমে ইতস্তত কয়েকটি গভীর ইঁদারা ছিল। পশ্চিমী পালোয়ান চাকরেরা জল তুলিয়া চৌবাচ্চা ভরিয়া রাখিত— ভোরবেলা স্নান করিতে হইবে। মেটে কলসীতে করিয়া জল লইয়া ছেলেদের ঘরে ঘরে গিয়া রাখিয়া আসিত— পান করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ইঁদারার জল শুকাইয়া যাইত— কোনোক্রমে পানের জলটা মাত্র পাওয়া যায়। তখন আমরা সকলে সারি বাঁধিয়া ভুবনডাঙার জলাশয়ে স্নানের জন্য যাইতাম। কিংবা যখন ইঁদারার জলেই স্নান অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিত তখন ছেলের দলের সঙ্গে তাহাদের কাপ্তেনরা দাঁড়াইয়া থাকিত, জল 'রেশন' করিয়া দিত। হয়তো বলিত, কেহ পাঁচ মগের বেশি জল লইতে পারিবে না। মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করিয়া দিত, "তোমার তিন মগ হইল, তোমার আর দুই মগ পাওনা আছে।" তখন অনেকে আবার বড়ো আকারের মগ আমদানি করিয়া আইন ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কাপ্তেনরা বড়ো সহজ লোক নয়, তাহারা নানারকম নজির দেখাইয়া মগের আকার নির্দিষ্ট করিয়া দিত। এই-সব কাপ্তেনদের আমরা বড়ো ভয় করিতাম; ইহাদের কথা পরে বলিব।

গ্রীষ্মকালে এই যেমন এক ধরনের জলকষ্ট, শীতকালে তেমনি আর-এক ধরনের জলকষ্ট ছিল। রাত্রিবেলা চাকরেরা বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা ভরিয়া জল তুলিয়া রাখিত। সারা রাত্রি ধরিয়া শীত ও শীতল বাতাস সেই জলকে প্রায় বরফের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিত— ভোরবেলা তাহাতে স্নানের পালা। তখনো সূর্য ওঠে নাই, দিবালোকের হ্রস্বতা পূরণের জন্য শীতকালে সূর্য-অভ্যুদয়ে শয্যা-ত্যাগ করিতে হইত। আর ঠিক স্নানের সময়েই কোথা হইতে যেন উত্তরে বাতাসটাও সময় বুঝিয়া বহিতে শুরু করিত। ইহাকে জলকষ্ট বলিব না তো কী! আর কাপ্তেনদের এমনই সতর্ক দৃষ্টি যে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া পরিত্রাণের উপায় একেবারেই ছিল না। অনেক দিন এমন জলকষ্ট সহ্য করিলাম। তার পরে, যখন বয়স কিছু বাড়িল তখন কয়েকজনে মিলিয়া জলকষ্ট হইতে ত্রাণের উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া ফেলিলাম। মাঝরাত্রে আমরা উঠিয়া গিয়া চৌবাচ্চার নল খুলিয়া দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িতাম। ভোররাত্রে দেখা যাইত, চৌবাচ্চা খালি। কাজেই ভোররাত্রির স্নানের সময় বেলা সাড়ে দশটায় খাবার আগে নির্দিষ্ট হইত। সে কী মুক্তির আনন্দ! পর পর যখন এইরূপ কয়েক দিন হইল তখন কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, ব্যাপারটা আকস্মিক নয়; কিন্তু অপরাধীকে

ধরিবার উপায় কি! যখন সর্বজ্ঞ কাপ্তেনরাও অকৃতকার্য হইল তখন চৌবাচ্চা পাহারা দিবার জন্য কুকৃকিধারী নেপালী দারোয়ান কুয়াতলায় বসিল। রাত্রিবেলা আপিস ও খাজাঞ্চিখানা পাহারা দিবার জন্য সখা নামে একজন দারোয়ান ছিল, সে নূতনতর কাজ পাইল, কুকৃকি লইয়া কুয়াতলায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা দেখিলাম, এ এক নূতন বিপদ। দু-একদিন সময়োচিত উপায়-উদ্ভাবনে কাটিল। পরদিন রাত্রে কাছাকাছি একটা কুকুরকে ঢিল মারিলাম, সেটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই কর্তব্যপরায়ণ নেপালী সেই দিকে ছুটিল, অমনি সেই অবসরে নিয়মঘাতক বাঙালি আসিয়া চৌবাচ্চার নল খুলিয়া পলাতক। সখা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল জল পড়িয়া যাইতেছে। তা পড়ুক; সে তো জানে না যে এই জলতরঙ্গ রোধ করিবার জন্য তাহার নিয়োগ। সে ভাবিয়াছে, নিশ্চয় ঐ ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন আবিষ্কৃত হইয়াছে, নতুবা সে খাজাঞ্চিখানা ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আদিষ্ট হইবে কেন?

কী করিয়া এই চৌবাচ্চা-খোলা বন্ধ হইল মনে নাই। বোধ করি আমরা কাপ্তেনশ্রেণীতে নির্বাচিত হইলাম, অমনি নল খোলা বন্ধ হইল। কাপ্তেনরা সকলের উপরে খবরদারি করিত, তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কর্তব্যের চাপে যেন যথাসময়ে স্নান করিবার সময় পাইতাম না, এমন ভাব দেখাইয়া পীড়াদায়ক প্রাতঃস্নান হইতে রক্ষা পাইতাম।

আমার এই স্মৃতিকথা শান্তিনিকেতনের ছেলেদের হাতে পড়িলে তাহারা এইরূপ দুর্নীতিমূলক দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবে না, এই ভরসায় সব লিখিলাম। এখনকার গণতন্ত্রের দিনে সকলের প্রতাপই কমিয়াছে, বোধ করি কাপ্তেনদেরও আর সে প্রতাপ নাই; কাজেই এখনকার ছেলেদের স্বাধীনতা আমাদের চেয়ে নিশ্চয় বেশি।

আর শুধু স্বাধীনতাই বা বলি কেন, এখনকার শান্তিনিকেতনিকদের সুখ-সুবিধা আমাদের সময়কার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অতীতের সুখদুঃখের পরিমাপ প্রায়ই বস্তুর দ্বারা হয় না; বস্তুর অভাব রসের দ্বারা পূরণ করিবার শক্তির উপরেই সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। তখন আমরা বস্তুদীন ছিলাম, কিন্তু তৎকালীন আবহাওয়ার প্রসাদে জীবনের প্রাচুর্যে সে দীনতা আমাদের চোখে পড়িত না, বরঞ্চ বস্তুর দীনতা জীবনরসের দ্বারা পূরণ করিতে গিয়া জীবন যেন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিত। এখনকার শান্তিনিকেতনিকদের সঙ্গে হয়তো এ বিষয়ে

মতের মিল হইবে না। ইহাই স্বাভাবিক, তাহারা তাহাদের কালকে ভালোবাসিবে, আমরা যেমন আমাদের কালকে ভালোবাসিতাম।

রবীন্দ্র-সান্নিধ্য

এক বিষয়ে শান্তিনিকেতনের আধুনিক ছেলেদের উপরে আমাদের জিত ছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের যে সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম পরবর্তীকালের ছেলেরা তাহা পায় নাই। ছেলেদের কাছে থাকিবার জন্য কবি তখন নূতন বাড়ির দোতালায় থাকিতেন— এখন যার নাম দেহলিভবন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি ছেলেদের একটি ঘরেই বসিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে বসিয়া সারাদিন তিনি লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু এ সময়ে আমরা ছোটো।

আর একটু বেশি বয়স হইলে দেখিয়াছি, এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ছেলেদের এক-একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন; নানা রকম নূতন খেলা তিনি উদ্‌ভাবন করিতেন। দু-একটা খেলা আমার মনে আছে। ইহাকে মিলের খেলা বলা যাইতে পারে। একটা শব্দ তিনি মনে ভাবিতেন। তাহার অনুরূপ মিল বলিয়া, প্রশ্ন করিয়া করিয়া, মূল শব্দটিকে বাহির করিতে হইত। হয়তো তিনি মনে করিলেন 'ঘর'। তিনি বলিলেন, শব্দটার সঙ্গে 'খর' শব্দের মিল। এখন আমাদের অনুরূপ মিল বলিয়া আসল শব্দটিকে আবিষ্কার করিতে হইত। অনেক সময়ে আমরাও ঐরূপ একটি শব্দ ভাবিতাম। তিনি প্রশ্ন করিয়া অনায়াসে মিলটা বাহির করিয়া ফেলিতেন। সব সময়ে যে পারিতেন এমন নয়। আর-একটা খেলা ছিল— তিনি কবিতার একটা ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সংগতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। অধিকাংশ সময়ে আমাদের হাতে পড়িয়া হয় মিলটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হইত, নয় তো অর্থের সংগতি থাকিত না। এখনো তাঁহার রচিত গোটা-দুই ছত্র আমার মনে আছে। একটা নদী-পারাপারের বর্ণনা চলিতেছিল— নদীর স্রোতে আমাদের মিলের নৌকা বানচাল হইবার উপক্রম হইলে তিনি বলিয়া গেলেন:

সে কি পাড়ি দিল এই ভাদ্দরে?
ও বাবা! কার সাধ্য রে!

আবার অনেক সময়ে তিনি একটা গল্পের সূত্রপাত করিয়া পালাক্রমে আমাদের চালাইয়া লইতে বলিতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দু-এক ধাপ

পরেই গল্পটা ভুতুড়ে ধরনের হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভূত ছাড়াইয়া গল্পটাকে সংগত পরিণামে পৌঁছাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে নিজের কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। সন্ধ্যাবেলা যখন যে বাড়িতে তিনি থাকিতেন, নূতন গান শিখাইবার আসর বসিত। শিক্ষার্থী ও শ্রোতা কাহারো সেখানে প্রবেশনিষেধ ছিল না। এ-সব ছাড়া ছেলেদের নানারকমের ছোটো-বড়ো সভায় তিনি নিয়মিত আসিতেন। ছোটো কথাটি নিরর্থক, কারণ যে সভাতে তিনি আসিতেন তাহাই বিরাট আকার ধারণ করিত।

পাঠচর্চার আরম্ভ

এখন একবার আগে ফিরিয়া গিয়া আমাদের লেখাপড়া কিভাবে আরম্ভ হইল বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। আমার যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য-গ্রন্থ দিয়া আমাদের পাঠ আরম্ভ হয়। সেটা বোধ হয় নিম্নতম শ্রেণী ছিল, অর্থাৎ অক্ষরপরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ। শিশুর 'কাগজের নৌকা' আমার প্রথম-পঠিত রবীন্দ্র-কবিতা— প্রথম শব্দটার উপরে খুব জোর দিতে চাই না, কারণ তার আগে বোধ হয় আর কারো কবিতা পড়ি নাই— কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ছাড়া। কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দিয়া বালক ভাবিতেছে :

আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন্ গাঁয়ে ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি!

রাত্রে বালক বিছানায় শুইয়া ভাবে :

চোখ বুজে ভাবি— এমন আঁধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে!
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি!

এই ছবি আমার প্রবাসী বালকচিত্তে সন্ত-ছাড়িয়া-আসা সুদূর পল্লীর কথা মনে আনিয়া দিত। তখন এই কবিতার ছত্রে ছত্রে কাগজের নৌকাকে অনুসরণ করিয়া অভাবিতের বাঁকে বাঁকে যে রহস্যের সন্ধান পাইতাম, এখন আর তাহা পাই না।

সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য এই যে, অল্পবয়সে 'জোড় করি হাত করি প্রণিপাত'-জাতীয় কবিতা-নামধেয় অপদার্থ রচনা পড়িবার দুর্ভাগ্য আমাদের হয় নাই। ছোটো ছেলেকে বাজে কবিতা পড়াইবার মতো অত্যাচার খুব অল্পই আছে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের শিশুদের কবিতা দুর্বোধ্য, কাজেই ছেলেরা তাহা পড়িয়া লাভবান হয় না। বড়োদের জন্যই হোক আর ছোটোদের জন্যই হোক, যে কবিতা ষোলো-আনা বোধ্য তাহা কবিতাই নয়। কবিতার খানিকটা বোঝা যাইবে, খানিকটা যাইবে না। যেটুকু বোঝা গেল তাহাতে কবিতার প্রতিষ্ঠা, যেটুকু গেল না তাহাতেই কবিতার প্রাণ। অর্থের দ্বারা নিরেট কবিতা পাঠকের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ; সাহিত্যের শোভাযাত্রায় এই দণ্ডধারীর হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী যে সোনার চতুর্দোলে চাপিয়া আসেন তাহা এমন নিরেট নয়। তাহাতে অবকাশ আছে, আর অবকাশ আছে বলিয়াই কাব্যলক্ষ্মী হাঁপাইয়া ওঠেন না। ছেলেদের গোড়া হইতে ভালো কবিতা পড়িতে দিলে তাহারা একরকম করিয়া বুঝিয়া লয়— অল্পবয়সে যেটুকু বোঝা দরকার বা উচিত ঠিক ততটুকু রসগ্রহণ তাহারা করিতে পারে। পরন্তু কান ও রুচি তৈরি হইয়া ওঠে। অর্থবোধের চেয়ে কান ও রুচি অধিকতর মূল্যবান। বাংলাদেশের ইস্কুলে বালকদের কান ও রুচির সর্বনাশ যে আরো কতকাল চলিবে কে জানে।

এই ক্লাসে আর-একখানি পাঠ্য পাইলাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত'। শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রামায়ণ মহাভারত ও রবীন্দ্র-কাব্যের উপরে প্রতিষ্ঠা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার সব চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি এই যে, বালকদের স্কুলপাঠ্য ও অতিরিক্ত পাঠ্যের তালিকায় রামায়ণ-মহাভারতের স্থান নাই বলিলেই চলে। ফলে, বাংলাদেশের বালকচিত্ত ত্রিশঙ্কুর মতো প্রতিষ্ঠাহীন হইয়া বায়ুভূত নিরাশ্রয়ে দোদুল্যমান। এখন কলেজে পড়াই— দেখিয়াছি, বি. এ. শ্রেণীতেও এমন ছাত্র অবিরল যাহারা রামায়ণ মহাভারত পড়ে নাই। ইহারা দাঁড়াইবে কোথায়? যখন

আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে ছোটো ছেলেদের কী বই পড়াইবে, আমি অসংকোচে বলিয়া বসি, "রামায়ণ মহাভারত আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াও।" আরো বলি, "দোহাই তোমাদের, নীতিমূলক কবিতাগুলা পড়াইয়ো না। যাহারা সুনীতি দুর্নীতির কিছুই জানে না, অ-নীতির জগতে যাহাদের বাস, তাহাদের ঘাড়ে এখনই ও-সব বোঝা চাপানো কেন? যখন তাহারা নীতির জগতে প্রবেশ করিবে তখন এই-সব বই হইতে যথার্থ নির্দেশ পাইবে; তোমার নীতিমূলক কবিতা কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিবে না, মাঝে হইতে অপকাব্যের কানমলা দিয়া বেচারাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিবে।"

তেজেশবাবুর কাছে বাংলা পাঠ শুরু হইল। ঘরের বাহিরে গাছের তলায় ক্লাস বসিত। কেহ জামগাছতলায় ক্লাস লইতেন, কেহ বটগাছতলায়, কেহ আমবাগানের মধ্যে। তেজেশবাবুর ক্লাস বসিত নূতন বাড়ির কাছে একটা গোলকচাঁপা গাছের তলে। জগদানন্দবাবুর ক্লাসের জায়গা ছিল নাট্যঘরের কাছে ফটকটার তলায়; সেই ফটকের উপরে ছিল একটা মাধবী আর একটা মালতী-লতা। কিন্তু তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল গণিতশাস্ত্র। মালতীর সুগন্ধ যে গণিতশাস্ত্রকে কিছুমাত্র মনোরম করিতে পারিয়াছিল এমন মনে হয় না। যদিচ জগদানন্দবাবু প্রায়ই বলিতেন, "একবার প্রবেশ করিলে দেখিবে, এমন সরস বিষয় আর নাই।" তাঁহার কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

প্রত্যেকের বসিবার জন্য একখানি করিয়া আসন থাকিত। অধ্যাপকদেরও একখানা করিয়া আসন। খাতা বই ও আসন লইয়া সকলে ক্লাসে গিয়া বসিতাম। ক্লাস হইতেছে এমন সময়ে বৃষ্টি আসিলে কী হইত? যার যার আসন লইয়া কোনো ঘরে গিয়া আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

অঙ্কের ক্লাস হইতেছে। জগদানন্দবাবু আবার অঙ্ককে আঁক বলিতেন। অঙ্ক শব্দটাই যথেষ্ট শঙ্কাজনক, কিন্তু জগদানন্দবাবুর মুখে আঁক শব্দটা একেবারে ছিটেগুলির মতো মারাত্মক মনে হইত। জগদানন্দবাবু বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আঁকটা কতদূর। আমরা নিবিষ্টমনে ঘাড় হেঁট করিয়া খাতার পাতায় আঁকজোক কাটিতেছি আর বারংবার আকাশ মেঘখানার দিকে চাতকের চেয়েও করুণতর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছি। শেষে যখন তিনি খাতাখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন সেই মুহূর্তে সদয় দেবরাজ বারিপাতের আদেশ

দিলেন। এক ফোঁটা জল পড়িয়াছে কি না পড়িয়াছে অমনি আমরা আসন-পাতি গুটাইয়া দৌড় মারিলাম, জগদানন্দবাবুর হাতখানা তখনো শূন্যে উদ্যত। কিন্তু সব ছাত্রই যে আমাদের মতো চাতকবৃত্তি করিত তাহা নহে, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেও আঁক কষিতেছে এমন ছাত্র ছিল। বুঝিতাম, তাহারা গণিতশাস্ত্রের ম্যাজিনো লাইন ভেদ করিয়াছে। কিন্তু হায়, এ জগতে সর্ববিদ্যা-বিশারদ কে? ইংরেজি অনুবাদের ক্লাসে দেখিতাম, সেই গণিতধুরন্ধরেরা আমাদের চেয়েও দ্রুততর পায়ে বৃষ্টির প্রথম সংকেতেই ক্লাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে ধাবমান। আসন্ন বিপদের মুখে প্রকৃতির হাতে এইরূপ সাহায্য বারংবার পাইতে পাইতে শেষ পর্যন্ত মানুষের চেয়ে প্রকৃতির উপরে আমার আস্থা দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মারিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু কখনো যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এমন নয়। বিশেষ, তখনকার দিনে অনেকেই দুরন্ত ছেলেটিকে সামলাইতে না পারিয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইবার মনোবৃত্তি লইয়া শান্তি-নিকেতনে পাঠাইয়া দিতেন। যাই হোক, কখনো কোনো ছেলে মার খাইলেও কেহ কিছু মনে করিত না, কারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে যথার্থ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাহাতে মারের দাগ মনের মধ্যে পৌঁছিত না।

আমি নিজেই তেজেশবাবুর কাছে একবার মার খাইয়াছিলাম। দোষটা সম্পূর্ণ আমার ছিল না, কিন্তু সেই বয়সেই বুঝিয়াছিলাম, আসামী প্রতিবাদ করিলে বিচারকের মেজাজ প্রায়ই রুক্ষতর হইয়া ওঠে। তাই চুপ করিয়া রহিলাম। কাছেই মেদি গাছের ডাল ছিল, তেজেশবাবুর হাতেও বেশ শক্তি ছিল, আমার পিঠের চামড়া এখনকার মতো পুরু না হইলেও পিঠে কোটের আস্তরণ ছিল, ফলে যা হইবার হইল। বেশি বয়সে তেজেশবাবু যখন আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে এই গল্প বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাঁহার মনে নাই। অভ্যস্ত আচরণই মনে থাকে, যিনি একবার জীবনে মারিয়াছেন তাঁহার মনে থাকিবার কথা নয়। যাই হোক, দুজনে খুব হাসিয়া লইয়াছি।

আর-একবার জগদানন্দবাবু একটা ছেলেকে কিল না চড় কী যেন মারিয়া-ছিলেন। ইহার ফল জগদানন্দবাবুর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। জগদানন্দ-বাবুকে দেখিয়া আমরা ভয় করিতাম, কিন্তু তাঁহার মনটি স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ

ছিল। তর্জন গর্জন যতই করুন, বর্ষণ কদাচিৎ করিতেন। সেই ছেলেটাকে মারিয়া তাঁহার মনে বড়ো কষ্ট হইল, তিনি কিছুক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে খানকয়েক বিস্কুট দিলেন। উহাই তাঁহার কাল হইল। এই সংবাদ ছাত্রমহলে রটিবামাত্র তাঁহার কাছে মার খাইবার জন্য সকলেই উমেদারি আরম্ভ করিল। কিন্তু কী বিপদ! তিনি যে আর কাহারো গায়ে হাত তোলেন না! ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিস্কুটের বাক্সটা তো দেখিয়াছিলে, কত-গুলা ছিল?" সে বলিল, "বাক্স প্রায় ভরা।" চলো চলো, জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে চলো। তিনি হয়তো তখন নিরিবিলি বসিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পুস্তকরচনায় নিযুক্ত— যে-সব দুর্গ্রহ তাঁর দরজায় চপেটাঘাতের উমেদার হইয়া ধর্না দিয়াছে তাহাদের প্রতি কি তাঁহার মন আছে! অবশেষে হতাশ হইয়া নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আমরা ঘরে ফিরিলাম।

ক্ষিতিমোহনবাবুর সম্বন্ধে প্রহারের একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ক্ষিতিমোহনবাবু চাম্বা রাজ্যে কাজ করিতেন, আশ্রমে যখন আসিলেন তখন তাঁহার প্রচুর স্বাস্থ্য ও প্রচুরতর পাণ্ডিত্য। শিক্ষক যতই পণ্ডিত হোন তাঁহাকে যাচাই করিয়া লওয়া ছাত্রমহলে একটা সনাতন রীতি। ক্ষিতিমোহনবাবু যখন ক্লাসে বসিয়াছেন একটি ছেলে নিজের জুতাজোড়া ক্লাসের মধ্যে রাখিল। তখন জুতা পায়ে দিবার নিয়ম ছিল না, অসুখবিসুখ হইলে কেহ কখনো পরিত। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, "জুতাজোড়া বাইরে রাখো।" ছেলেটি নূতন শিক্ষককে বলিল, "আমাদের এখানে ক্লাসের ভিতরে জুতা রাখাই নিয়ম।" ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, "ওরকম অবাধ্যতা করলে মার খাবে।" তখন ছাত্রটি আশ্রমিক নিয়মের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল, বলিল, "এখানে আশ্রমের ভিতরে মারার নিয়ম নেই।" ইহা শুনিয়া ক্ষিতিমোহনবাবু আর কোনো কথা না বলিয়া ছেলেটির কান ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "এখন তুমি তো আশ্রমের বাইরে?" এই বলিয়া এ গালে এক চড়, আবার অন্য কান ধরিয়া তুলিয়া অপর গালে আর-এক চড়। তার পরে ছেলেটিকে আবার আশ্রমের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। এই একটি ঘটনাতেই ছাত্রমহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা পাকা হইয়া গেল। তার পরে কোনো ছাত্র আর তাঁহাকে যাচাই করিয়া লইবার দুঃসাহস প্রকাশ করে নাই। বলা বাহুল্য, ইহা আমার শোনা গল্প, এবং

অনেক জনশ্রুতির মতো বাস্তবের সহিত হয়তো ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

আমি যখন আশ্রমে গেলাম তখন ক্ষিতিমোহনবাবু সর্বাধ্যক্ষ। ও পদটা অনেকটা ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারের অনুরূপ। তিনি ছেলেদের নানা কাজে ডাকিয়া পাঠাইতেন। কোনো ছেলের ডাক পড়িলেই সে শঙ্কিত হইয়া উঠিত। তাঁহার কাছে যাইবার সময়ে পুরু গরম জামা গায়ে দিয়া যাইত— অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। ছেলেরা কানাঘুষায় এই যাত্রাকে দার্জিলিং-যাত্রা বলিত। গিরি-রাজের মতো তাঁহার দেহের বিপুলতা ইহার অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু একমাত্র কারণ নিশ্চয় নয়। একদিন আমার ডাক পড়িল। আমি খালি গায়েই রওনা হইতেছিলাম। আমার অনভিজ্ঞতায় বিস্মিত বালকের দল আমার গায়ে যার যত গরম জামা ছিল পরাইয়া দিয়া পিছনে পিছনে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিল। ক্ষিতিমোহনবাবু আমার সঙ্গে কী দুই-একটা কথা বলিয়া বিদায় দিলেন ; আমার কৌতূহলী অনুচরদের মুখে সে কী আশাভঙ্গের ছাপ !

শরৎবাবুর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তিনি ছিলেন মোটা মানুষ, পাখা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার পাখাকে যুগপৎ মক্ষিকা ও ছাত্রদল ভয় করিত। কারণ, ছাত্রদের মারিবার প্রয়োজন হইলে সহজলভ্য সেই পাখার ডাঁট তিনি ব্যবহার করিতেন। দু-এক ঘা মারিয়া বলিতেন, "হাঁটু গাড়িয়া থাকো।" তিনি ছিলেন বরিশালের লোক, সেই হইতে বরিশালের লোকের মুখের 'ইয়া' প্রত্যয় আমাদের মনে আতঙ্ককর হইয়া আছে।

এক সময়ে তিনি আমাদের ঘরে থাকিতেন। প্রত্যেক ঘরেই দু-একজন করিয়া শিক্ষক বাস করিতেন। দুপুরবেলা খাবার কিছুক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বাজিত, সেই ঘণ্টা বাজিলেই প্রত্যেককে নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে হইত। একদিন এইরকম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা যথাসময়ে ঘরে ফিরিতে পারি নাই। আমি ও আমার সঙ্গী গোপাল, দুজনেই বুঝিলাম আজ অদৃষ্টে কী আছে। গোপাল বুদ্ধি দিল, "চলো, কানে তেল মাখিয়া যাওয়া যাক।" শরৎবাবুর অভ্যাস ছিল বাম হাত দিয়া কান ধরিয়া প্রথমে ছেলেটাকে আয়ত্ত করিয়া লইতেন, তার পরে ডান হাতে পাখা চলিত। যুক্তি সমীচীন মনে হওয়াতে দুজনে পাকশালা হইতে কিঞ্চিৎ তেল সংগ্রহ করিয়া দু কানে মাখিয়া ঘরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রবেশের সময়ে আমি গোপালকে ধাক্কা দিয়া আগে ঢুকাইয়া দিলাম। শরৎবাবু আসিয়া গোপালের কান ধরিলেন, মসৃণ কান

ফস্‌কিয়া গেল। তখন গোপালেরই ধুতি দিয়া গোপালের কান ধরিয়া পাখার ডাঁট-বর্ষণ, আর 'হাঁটু গাড়িয়া থাকো' তর্জন। গোপাল হাঁটু গাড়িলে যখন তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন আমি আমার তক্তপোশের উপরে অনেকক্ষণ হইল নিতান্ত সুবোধের মতো হাঁটু গাড়িয়া আছি। যে আসামী স্বেচ্ছায় ফাঁসটা গলায় পরিয়া বিচারকের পরিশ্রম বাঁচাইয়া দিল তাহার প্রতি সদয় ভাব না হয় এমন পাষাণ বিচারক বোধ করি নাই— আমার কান দুটা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

এইরকম প্রহারের ব্যাপার কখনো কদাচিৎ হইলেও ছাত্র-শিক্ষকের স্নেহের সম্বন্ধ এখানে যেমন দেখিয়াছি, তেমন বোধ করি আর কোথাও নাই। স্নেহের সম্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের ধরনটা স্পষ্ট বলা হয় না, তখনকার দিনে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানটিতে একটি নিবিড় পারিবারিকতার ভাব ছিল। যথার্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই পারিবারিক চৈতন্য একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন; অন্য সব অভাব এই একটিমাত্র সদ্ভাবে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

প্রথম ছুটি

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। আশ্বিনের আকাশ নির্মল হইয়া উঠিল; শিউলি গাছের তলা ঝরা-ফুলের আল্‌পনায় খচিত হইয়া গেল; ধানের খেতের সবুজে আর কাশের ফুলের সাদায় হিল্লোল তুলিবার প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল; মাঠে মাঠে ঘাসের ডগায় শিশিরকণার ঝল্‌মলানি দেখা দিল; আর তাল গাছের কলাপিত শাখায় শাখায় উত্তরে বাতাস সির্‌সির্ করিয়া উঠিল।

পড়াশুনা কাজকর্ম শিথিল হইয়া আসিল; সময়জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনির কাংস্য-কণ্ঠেও যেন কোমলের আভাস লাগিল, এমন-কি, জগদানন্দবাবুর ছাত্রভীতিকর মুখমণ্ডলকেও আর তেমন ভীষণ বলিয়া বোধ হইল না।

এই সময়কার একটি দিনের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমি পাহাড়ের উপরে স্টেজ বাঁধিবার জন্য ডালপালা ভাঙিতে গিয়াছি, দূরে নাট্য-ঘরে শারদোৎসব-নাটকের রিহার্সাল চলিতেছিল; সেখান হইতে গানের একটি পদ কানে ভাসিয়া আসিল:

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা—

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

এই দূরাগত গানের সুর হঠাৎ কী মন্ত্র যেন পড়িয়া দিল! চাহিয়া দেখি, পরিচিত পৃথিবীর চেহারা যেন বদলাইয়া গিয়াছে, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে কে যেন কখন অপরূপের বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছে— আমি ডাল ভাঙা ভুলিয়া স্বপ্নগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রবীন্দ্রনাথের আর-একখানি নাটক আমার মনের উপরে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিল। সেদিনের ডাল ভাঙার পরে ৫-৬ বছর চলিয়া গিয়াছে— তখন আমার সদ্য জাগ্রত কৈশোর, চোখে জলস্থলের রঙ বদল শুরু হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে ফাল্গুনী নাটক তাহার গানগুলি ও নবযৌবনের দল লইয়া আসিয়া রত্নাকর দস্যুর মতো আমার উপরে পড়িল। সেদিনের শারদোৎসব নাটকখানি যদি হয় আশ্বিনের স্নিগ্ধ প্রভাত, শেফালি শিশির ও কচি ধানের আভায় সদ্যঃপাতী, ফাল্গুনী নাটকখানি তবে শালের ফুল আমের বোল মাধবী ও মুচুকুন্দর গন্ধে মদির মন্থর চৈত্রের অপরাহ্ণ। এ-ও এক চাবি খুলিয়া দিল তবে আরো ভিতরকার মহলের। এরা সব অপরূপের দূতী, সোনার চাবি হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিতান্ত কৃপণের মতো নিজেকে আড়াল করিয়া না রাখিলে এই দূতীর দল কৃপা করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি স্বর্ণ-কুঞ্চিকার গুচ্ছ। এই-সব সোনার চাবি আমার জীবনের অজ্ঞাতপ্রায় কত দরজা জানলা কুলুঙ্গি কুঠুরি না খুলিয়া দিয়াছে তাহার ইতিহাস যদি লিখিতে পারিতাম। কিন্তু মুশকিল এই যে সব কথা লিখা যায় না।

ছুটির সময় ছেলেদের লইবার জন্য দেশ হইতে অভিভাবকেরা আসিতেন। ট্রেনের সময় হইলেই আমরা ছুটিয়া গিয়া পথের ধারে অপেক্ষা করিতাম, বেশি দূর নয়, চারি দিকে চারটি সীমানা-চিহ্ন ছিল, কোনো দিকে বা একটা গাছ, কোনো-দিকে বা সড়ক, তাহার বাহিরে যাইতে হইলে সেই কাপ্তেনদের অনুমতির দরকার হইত। অনুমতির প্রয়োজন না হইলে বোধ করি বাড়ির লোকের আগমন-আশায় স্টেশন পর্যন্ত যাইতাম। যাহার অভিভাবক আসিল সে খুশি; সে তখন আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া অভিভাবকের সঙ্গে জুটিয়া গিয়া আগাম গৃহসুখ অনুভব করিত। যার অভিভাবক আসিল না সে ক্ষুণ্ণ হইয়া পরবর্তী ট্রেনের ভরসায় থাকিত।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু ছেলে ছিল। বহু দূরদেশ হইতে অভিভাবক আসিতেও অনেক খরচ বলিয়া আশ্রমের কর্তৃপক্ষ এই-সব ছেলেদের দলবদ্ধ করিয়া কোনো-একজন শিক্ষকের সঙ্গে প্রেরণ করিতেন। একটি ঢাকা-ব্যাচ, অপরটি ত্রিপুরা-ব্যাচ। ঢাকার ছেলেরা নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত একত্র গিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া যাইত, অনেক অভিভাবক সেখানে অপেক্ষা করিতেন। ত্রিপুরার ছেলেরা চাঁদপুর পর্যন্ত একসঙ্গে যাইত। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ আগে চিঠি লিখিয়া জানিতেন কে ব্যাচে যাইবে, কে একাকী যাইবে, কার বা অভিভাবক আসিবেন। এ বিষয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অভিভাবক তাঁহার ছেলে ব্যাচের সঙ্গে যাইবে কি না জিজ্ঞাসিত হইয়া লিখিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহার ছেলে ব্যাচের সঙ্গে যাইবে। ব্যাচ সাহেব কবে আসিয়া পৌঁছিবেন, তাঁহার জন্য আহারাদির কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে, এ-সব বিষয় জানিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ছুটি হইয়া গেলে ছেলেরা অসময়ে গোধূলি সৃষ্টি করিয়া দলে দলে স্টেশনের দিকে চলিয়া যাইত। সঙ্গে জিনিসপত্রও তাহাদের সামান্যই থাকিত, একটা করিয়া বোঁচকাই যথেষ্ট, পায়ে তো জুতার বালাই ছিলই না, গায়েও জামা একটা নাম মাত্র। দুই-এক দিনের মধ্যেই আশ্রম জনশূন্য হইয়া যাইত, তখন আমবাগানের মধ্যে ছেলেদের কোলাহলের পরিবর্তে দোয়েলের শিস জাগিয়া উঠিত।

আশ্রমের ছুটি হইবার সময় ছেলেদের অভিভাবক, কবির ভক্ত প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিতেন। তাঁহারা সকলেই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি। দু-তিন দিন তাঁহারা থাকিতেন, রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় দেখিতেন। এই উপলক্ষে প্রথম রামানন্দবাবুকে দেখিলাম। তাঁহার বিদুষী কন্যাদ্বয়ও আসিতেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলির কথা মনে আছে। আর আসিতেন সুনীতি চাটুজ্জে, প্রশান্ত মহলানবিশ, কালিদাস নাগ, অমল হোম। এখন তাঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তখন তাঁহারা যুবক, অনেকেই সবে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। জগদীশ বসু ও যদুনাথ সরকারও কখনো কখনো আসিতেন।

এখন আশ্রমে অতিথিদের কাছ হইতে সামান্য কিছু দক্ষিণা 'গেস্ট চার্জ' বলিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অনেকের আপত্তি। কিন্তু, যে বিশেষ ঘটনার ফলে

এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। একবার ছুটির সময়ে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার লোভে কলিকাতা হইতে হঠাৎ পাঁচ-সাত-শো অতিথি আসিয়া উপস্থিত। শান্তিনিকেতনের মতো সীমাবদ্ধ স্থানে অত অতিরিক্ত লোক আসিয়া পড়িলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে সত্যই মুশকিল হয়; থাকিতে দিবার স্থানও নাই, খাদ্য সংগ্রহ করাও সহজ নয়। সেবার অভিনয় দুই রাত্রি করিতে হইল; এক রাত্রে আশ্রমের লোক ও অতিথিদের নাট্যালয়ে ধরিবার কথা নয়। তখন হইতে অতিথিদের নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা লইবার ব্যবস্থা করা হইল।

প্রথম নাট্যদর্শন

এবার ছুটির সময়ে দুটি নাটক হইল, শারদোৎসব ও বিসর্জন। ইহাই আমার প্রথম অভিনয়-দর্শন। ইহার পূর্বে বাড়িতে যাত্রাগান শুনিয়াছি, তবে তাহা কর্তৃপক্ষের চক্ষু এড়াইয়া, সে না-দেখারই শামিল। সকাল হইতে নাট্যঘরে স্টেজ সাজানো আরম্ভ হইল। আয়োজন যৎসামান্য। দেবদারুর ডালপালা দিয়া চারখানা উইংস্ রচনা করা হইল, পিছনে একখানা কালো পর্দা, সম্মুখের যবনিকায় মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য আঁকা। আমরা ছোটো ছেলেরা এতই নগণ্য যে, কেহ কোনো কাজের ফর্মাশ করে না। করিবে এই ভরসায় আমরা বসিয়া স্টেজ বাঁধা দেখিতেছি, আর কে কোন্ পাঠ লইয়াছে এ বিষয়ে নিজ নিজ বক্তব্য বলিতেছি। এমন সময়ে বিকালের দিকে স্টেজ-বাঁধা সাঙ্গ হইলে যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হইল। সর্বনাশ! এ যে পর্দা পড়িয়া গেল! এখন দেখিব কেমন করিয়া? আগে যাত্রা দেখিয়াছি, তাহাতে পর্দার বালাই ছিল না; পর্দার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, নিশ্চয়ই দেখিবার কোনো একটা কৌশল আছে, নতুবা এত আয়োজন হইবে কেন? ভাবিলাম, অত সূক্ষ্ম কৌশলের মধ্যে গিয়া কাজ নাই, সময় হইবামাত্র উইংসের পাশ দিয়া স্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িব—ওখানে বসিলে নিশ্চয় দেখা যাইবে। অভিনয়ের ঘণ্টা বাজিবামাত্র আমি সবেগে ঘরে ঢুকিয়া দেবদারুপাতার উইংসের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আগে ঢুকিতে হইবে, স্টেজের মধ্যে স্থান অল্প, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এমন সময়ে স্টেজের মধ্য হইতে একখানি পরুষ বাহু ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল; পর্দার ফাঁক দিয়া একবার যেন খানিকটা দাড়িও দেখা গেল। দৃশ্য হাতের অদৃশ্য মালিক বলিল, "বাইরে যাও।"

আমি বলিলাম, "দেখব কেমন করে? পর্দা যে!"

কণ্ঠ বলিল, "পর্দা উঠে যাবে। বাঙাল!"

না, এ পটলদা না হইয়া যায় না, অর্থাৎ যিনি রঘুপতি সাজিয়াছেন। বাস্তবিক, রঘুপতি, তোমার পক্ষে শিশুহত্যা, রাজহত্যা, কিছুই অসম্ভব নয় দেখিতেছি। নির্বাসনদণ্ড তো তোমার পক্ষে বে-কসুর খালাস।

গোবিন্দমাণিক্য সাজিয়াছিলেন সন্তোষ মজুমদার; নক্ষত্ররায় দেবলদা; গুণবতী সুধীরঞ্জন দাস— রাজবিধান ভঙ্গ করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া রাজবিধান-রক্ষায় সাহায্য করিতেছেন। মুগ্ধের মতো বসিয়া নাটকের শেষ কথাটি পর্যন্ত পান করিলাম। এই নাটক আমার কাছে অপরূপের আর-একটা বাতায়ন খুলিয়া দিল।

শীতের প্রারম্ভ

ছুটির পরে যখন ফিরিলাম তখন শান্তিনিকেতনের মাঠে রীতিমত শীত পড়িয়া গিয়াছে। বিবিক্ত সংযত জলে স্থলে মহাদেবের তপোবনের শান্তি, আর নন্দীর ধবল উত্তরীয়প্রান্তের মতো উত্তরে বাতাসের স্পর্শ মজ্জার অন্তঃস্থল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে।

শীতারম্ভের চিত্রের সঙ্গে বেগুন-ভাজার স্মৃতি জড়িত, তখন নূতন-ওঠা বেগুনই ভাজায় এবং তরকারিতে আহার্যের প্রধান উপকরণ। কোন্ নিয়মে জানি না, শীতের সূত্রপাত ও সদ্য-ওঠা বেগুন আমার মনে হরগৌরীর মতো একাঙ্গ হইয়া আজ পর্যন্ত বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু, নূতন-ওঠা বেগুন বা কচিৎ-দর্শন ফুলকপি কিছুই ভালো লাগিত না, প্রথম কয়দিন বাড়ির জন্য মনটা বড়ো খারাপ থাকিত। আশ্রম ছাত্র-অধ্যাপকে ভরিয়া উঠিতে কয়েক দিন সময় লাগিত; ছুটির আরম্ভে যেমন এক দিনেই খালি হইয়া যাইত, তেমন দ্রুত পূর্তি হইত না।

আমাদের ইংরেজি পড়াইতেন দেবলদা। তিনি তখন এন্ট্রান্স পাস করিয়া ওখানেই বাস করিতেছিলেন। তখন ওখানকার ডাকঘর পরীক্ষাধীন-ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতেও বোধ করি কাজ করিতেন। এ-সমস্তই বুঝিতাম, কেবল বুঝিতাম না এত জায়গা থাকিতে আশ্রমের উত্তর প্রান্তে একেবারে খোলা মাঠের ধারে, একটা মহুয়া গাছের তলায়, তিনি কেন ক্লাস লইতেন।

কন্‌কনে উত্তরে হাওয়াটা আশ্রমে ঢুকিবার আগেই আমাদের উপরে আসিয়া পড়িত। বেশ মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ইংরেজি পাঠ লইবার উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু আমাদের একেবারে মগজটা সুদ্ধ জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত।

যে-কোনো একটি দিন

আশ্রম-জীবনের এক বছরের অভিজ্ঞতার একটা আভাস দিলাম; এবারে ওখানকার জীবনের যে-কোনো একটি দিনের বিবরণ দেওয়া যাক।

খুব ভোরে আমাদের উঠিতে হইত; উদ্‌বোধনের জন্য একটা ঘণ্টা বাজিত। শীতকালে আর ভোর নয়, দিবালোকের স্বল্পতা-পূরণের জন্য যখন উঠিতে হইত তখন রীতিমত অন্ধকার, আকাশে তখনো তারা আছে। খুব ছোটো ছেলেরা কিছুক্ষণ পরে উঠিত। বয়সের কম-বেশি অনুসারে ছাত্ররা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; আদ্যবিভাগে বয়স্ক ছেলেরা, মধ্যবিভাগে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছেলে, শিশুবিভাগে একেবারে ছোটোর দল।

শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত-মুখ ধুইবার পালা। তার পরে পালাক্রমে ছেলেদের নিজের নিজের ঘর ঝাঁট দিতে হইত, আশপাশ পরিষ্কার করিতে হইত। তার পর মিনিট পনেরো সারিবদ্ধভাবে ব্যায়ামের সময়। ব্যায়ামের পর স্নান; স্নানের পর উপাসনা। উপাসনার সময়ে প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে মিনিট দশেকের জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইত। কে কী ভাবিবে তাহার নির্দেশ ছিল না; যাহার যা খুশি ভাবিত। দিনের মধ্যে দশ-বিশ মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া বসিবার শিক্ষাটাও বড়ো কম নহে। সন্ধ্যাবেলাতেও আবার উপাসনার পালা ছিল, তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। তখন যে ছোটো ছেলেরা সবাই একেবারে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিত এমন মনে করিবার হেতু নাই, কারণ, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে ছিটেগুলির মতো কাঁকর আসিয়া হয়তো একজনের মাথায় আঘাত করিল। সে নিরুপায়ের উপায় কাপ্তেনের শরণাপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাপ্তেন, কাঁকর ছুঁড়ছে।" ধ্যানরত কাপ্তেন কর্তব্য ভুলিবার লোক নয়, সে হাঁকিয়া উঠিল, "এখন চুপ করো, উপাসনার পরে নালিশ কোরো।" অন্ধকারে আসামী-সনাক্ত-করণ সহজ নয়, কাজেই ব্যাপারটা ওখানেই মিটিয়া যাইত। ফলে সন্ধ্যা-উপাসনার অন্ধকারে কাঁকরকে ছিটেগুলির কাজে ব্যবহারের আর অবসান ঘটিত না।

উপাসনার পরে সকলকে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। তার পরে জল খাওয়ার পালা; সকলকে সারিবদ্ধ হইয়া নিজের বাটি হাতে রান্নাঘরের দিকে যাইতে হইত।

প্রত্যেক কাজের জন্য ঘণ্টা বাজিত, ঘণ্টার ধ্বনিবৈচিত্র্য শুনিয়া কোন্ পর্ব চলিতেছে বুঝিয়া লইতে হইত। কোনোবার হয়তো ঘণ্টা বাজিল ২ : ৩; কোনোবার হয়তো বাজিল ৩ : ৩; কোনোবার হয়তো বাজিল ঢং ঢং শব্দে অনর্গল; আর ৫ : ৫ রবে ঘণ্টা বাজিলে বুঝিতে হইবে, কোনো একটা বিপদ ঘটিয়াছে, খুব সম্ভবত কোথাও আগুন লাগিয়া গিয়াছে। কোনো কাজ আমাদের যথেচ্ছভাবে করিবার উপায় ছিল না; প্রত্যেক কাজের জন্যই কাপ্তেনের নির্দেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইত। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নাম ছিল লাইন করা। উপাসনার জন্য লাইন, জল খাইতে যাইবার জন্য লাইন, ভাত খাইতে যাইবার জন্যও লাইন, লাইন ছাড়া এক পা চলিবার উপায় ছিল না। দিনের মধ্যে আট-দশবার লাইন করিতে করিতে লাইন ব্যাপারটা খুব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন খাদ্যনিয়ন্ত্রণের দিনে দোকানের সম্মুখে লোকজন যখন বাঁকাচোরা লাইন করে তখন আমি মনে মনে হাসি, এ-সবে আমরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত। প্রয়োজন হইলে জ্যামিতির সরল রেখার মতো লাইন গড়িয়া তুলিব! আক্ষেপের আবশ্যক নাই শীঘ্রই লাইনে দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু মনে আশঙ্কা হইতেছে—এবারেও পিছনের লোক ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আমার আগেই সওয়া সের চাল মাপিয়া লইয়া খসিয়া পড়িবে।

জল খাওয়ার পরে ও ক্লাস আরম্ভ হইবার আগে আশ্রমের ছোটো বড়ো ছাত্র অধ্যাপক সকলে একত্র হইত; গানের দল সময়োচিত একটি গান করিলে সকালবেলাকার ক্লাস আরম্ভ হইত। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া সুরের স্বস্তিবাচন গ্রহণ করিয়া মনকে কর্মারম্ভের জন্য প্রস্তুত করিত। এক সময় এই বৈতালিক গান কখনো কখনো অতি প্রত্যূষে হইত; পরে ক্লাস আরম্ভের পূর্বে নিয়মিত-ভাবে এই বৈতালিকের ব্যবস্থা হয়, গানের পর ক্লাস আরম্ভ হইত। পঁয়তাল্লিশ মিনিট করিয়া এক-এক পর্ব, এমন পাঁচ-ছয়টা পর্ব। তার পরে আবার ঘণ্টা, আবার লাইন; এবারে মধ্যাহ্নভোজনের পালা।

আমরা যখন প্রথম যাই তখন নিরামিষ-ভোজন প্রচলিত ছিল, তবে ডিম আমিষের পর্যায়ে ছিল না। তার পরে এক সময়ে আমিষ-ভোজন প্রবর্তিত

হইল, পরে পুনরায় নিরামিষ প্রবর্তিত হইল, এখন আবার আমিষ-ভোজন প্রবর্তিত হইয়াছে। ফলকথা, নিরামিষ-ভোজনকে কোনোদিনই ওখানে ধর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয় নাই; কেবল সুবিধা-অসুবিধার মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিয়া কখনো গৃহীত কখনো বর্জিত হইয়াছে।

প্রথম আমলে শরৎবাবু পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে খাওয়ার যেমন সুবিধা ছিল, শাসন তেমনি কড়া; যথাসময়ের পরে রান্নাঘরে উপস্থিত হইলে খাইতে না পাইবার আশঙ্কা ছিল। তিনি বলিতেন, সকলকে যথাসময়ে আসিতে হইবে, কাহারো জন্য 'আলাহিদা' ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তৎপূর্বে 'আলাহিদা' শব্দ শুনি নাই, ঐ শব্দটিতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

দুপুরবেলা খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ এ ঘরে ও ঘরে গল্পগুজব করিতে যাওয়া চলিত। কিন্তু, ঘরে ফিরিবার ঘণ্টা বাজিলেই আপন-আপন জায়গায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। ঘণ্টা-দুই পাঠ ও বিশ্রামের পরে বিকালবেলা আবার ক্লাসের ঘণ্টা পড়িত। বিকালে তিন-চারটা পর্বের বেশি হইত না।

ক্লাস শেষ হইলে নিজ নিজ ঘর ঝাঁট-দেওয়া। আবার ঘণ্টা, আবার লাইন, জল খাওয়া। জল খাওয়া শেষ হইলে, আবার ঘণ্টা, আবার লাইন, তার পরে খেলিবার পালা।

শীতকালে ক্রিকেট, অন্যসময় ফুটবল; ফুটবল খেলাই বেশি জমিত। সপ্তাহে সাত দিনই যে খেলা হইত তাহা নয়; একদিন সকলকে ড্রিল শিখিতে হইত; আর-একদিন জঙ্গল-পরিষ্কার বা ঐ-জাতীয় কোনো কাজ করিতে হইত। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কাজ-দুটি জনপ্রিয় ছিল না; অনেকেই ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিত। আমার তো খেলাটাও হাস্যকর বোধ হইত, কাপ্তেনের পাল্লায় পড়িয়া নিতান্ত বাধ্য না হইলে কখনো যে খেলিয়াছি তাহা মনে হয় না। আশ্রমে পাহাড় নামে যে মাটির ঢিবিটা পরিচিত সেটা কাটিয়া পুকুরটা বুজাইবার একটা প্রয়াস বহুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। বিকালবেলা পালাক্রমে ছেলেরা ঐ স্তূপটা কাটিয়া পুকুর ভরাট করিতে চেষ্টা করিত। আমাদের আগের ছেলেরাও ইহা করিয়াছে, আমরাও করিয়াছি, বোধ করি এখনকার ছেলেরাও করিতেছে। কিন্তু কাজ এত সামান্য পরিমাণে হইত যে, পাহাড়ের গম্ভীরতা ও পুকুরের গভীরতা দুটিরই কিছুমাত্র লাঘব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

খেলার পরে হাত-পা ধুইয়া, আবার উপাসনা। উপাসনার পরে গল্পগুজব

করিবার জন্ত খানিকটা সময়; এটার ভদ্র নাম বিনোদন-পর্ব। বড়ো ছেলেরা ছাড়া রাত্রে কেহ পড়িতে পাইত না, কোনো-না-কোনো প্রকার বিশ্রম্ভ-ব্যাপারে যোগ দিতে হইত। এই সময়ে নানারকম সভাসমিতি হইত, কোনোদিন বা ছোটোখাটো অভিনয় হইত, কিংবা কোনো অধ্যাপক গল্প বলিতেন।

জগদানন্দবাবু বেশ মজলিশি রসিক লোক ছিলেন। গল্প বলিবার তাঁহার অসামান্ত ক্ষমতা ছিল; গল্পের আখ্যানের চেয়ে ব্যাখ্যানের উপরেই তিনি বেশি নির্ভর করিতেন। তিনি ডিটেক্‌টিভের গল্প বলিতেন; বানাইয়া বলিতেন কি পড়া গল্প বুঝিতে পারিতাম না।

ক্ষিতিমোহনবাবুরও গল্প বলিবার অসামান্যতা ছিল। তিনি নিপুণ হাস্থ-রসিক; শব্দকে মোচড় দিয়া অপ্রত্যাশিত রস বাহির করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। ছেলেবুড়া সকলেই সমানভাবে তাঁহার গল্পে আনন্দ পাইত।

অথচ, জগদানন্দবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবু দুজনেই স্বভাবত গম্ভীরপ্রকৃতির লোক। হাস্যরসিক লোক স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির; যথার্থ হাস্যরসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে। যে-সব লোককে আমরা চলিত ভাষায় আমুদে লোক বলি, তাহাদের স্বভাবে গভীরতার অভাব। আর গভীরতার অভাবের ফলেই তাহারা হাস্যরসিক না হইয়া হাস্যকর মাত্র হইয়া থাকে।

নেপালবাবু 'লে মিজারেবল' গল্পটা আগ্যন্ত বলিয়াছিলেন, আমার মনে হয়।

নগেনবাবুর গল্পের পালাও বেশ জমিত। স্বর্ণলতার নাট্যরূপ যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি সহকারে তিনি বলিয়া যাইতেন; গদাধরচন্দ্রের অভিনয়ে দর্শকদের হাসি আর থামিতে চাহিত না।

বিনোদনের পরে আহার, আহারান্তে বৈতালিক দলের গান; নারীভবন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পালাক্রমে একদিন ছেলেরা, একদিন মেয়েরা। বৈতালিক শেষ হইয়া গেলে আশ্রম নিদ্রানীরব হইয়া যাইত, কেবল পরীক্ষার্থীদের ঘরের আলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাইত, অবশেষে সেগুলিও কখন নিবিয়া যাইত।

এই দিনস্থচীতে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। সকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত দৈহিক ব্যায়াম হইতে মানসিক আনন্দ পর্যন্ত, চিহ্নিত ও নিয়মের দ্বারা একেবারে ঠাসা ভর্তি, কোথাও যেন নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। প্রথমে দূর হইতে কেবল কাগজে কলমে দেখিলে ঐরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বাস্তবে ঠিক তাহার বিপরীত। নিয়মের ঠাসবুনানির ফলে আনন্দের

ক্ষেত্র হয়তো সংকীর্ণ হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে তাহার রসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। পাথরের চাপ চারি দিকে পড়ে বলিয়াই উৎস ঊর্ধ্বগামী। শহরের মধ্যে হইলে নিয়মের এই আতিশয্য হয়তো পীড়াদায়ক হইত, কিন্তু শান্তিনিকেতনে প্রান্তর-লক্ষ্মীর স্নিগ্ধশুশ্রূষার মধ্যে নিয়মপালন কখনো কঠিন মনে হয় নাই।

কাপ্তেনগণ

এবারে কাপ্তেনদের কথা বলিব। কাপ্তেনদের আমরা কিরকম ভয় করিতাম, তাহা আগে বলিয়াছি। এমন অনেক কর্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেন ছিল যাহাদের অধ্যাপকেরা পর্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদের কথার প্রায়ই অন্যথা করিতেন না। কিন্তু সব কাপ্তেন যে সমান ছিল এমন নয়। কাজ-ফাঁকি-দেওয়া কাপ্তেন ছিল, নিয়মভঙ্গে পরোক্ষ প্রশ্রয় দেয় এমন কাপ্তেন ছিল; তৎসত্ত্বেও মোটের উপরে ইহাদের ধারা ছাত্র অধ্যাপক সকলেরই বশ্যতা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। আর সবচেয়ে ভীতিজনক কাপ্তেন ছিল তাহারাই যাহারা সাধারণ ছাত্র হিসাবে নিয়মভঙ্গের গুরু। চোরকে চৌকিদারের কাজ দিলে নাকি পাহারা-কার্য সুনির্বাহ হইয়া থাকে। চৌকিদার চোর হওয়ার চেয়ে চোর চৌকিদার হওয়া বোধ করি অধিকতর নিরাপদ। এই কাপ্তেনদের প্রতাপ বড়ো কম ছিল না। তাহারা এক রকম আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল বলিলেও চলে। কাপ্তেনরা ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিত, হাঁটু গাড়িয়া রাখিতে পারিত, অন্যের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত, জল-খাবার, এমন-কি, ভাত পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। তাহারা কোনো বালকের নামে সর্বাধ্যক্ষের কাছে বারংবার রিপোর্ট করিয়া তাহাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিতেও পরোক্ষে সমর্থ ছিল। এমন অপ্রতিহত প্রতাপ যাহাদের তাহাদের ভয় না করিয়া উপায় কী?

ছাত্রদের মধ্যে যাহারা প্রবল স্বভাবতই তাহারা কাপ্তেনদের লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিত। তেমনি যাহারা দুর্বল, বিপদের ছায়া দেখিবামাত্র তাহারা কাপ্তেনের শরণাপন্ন হইত। সব ইস্কুলেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছাত্র থাকে, তাহারা দুর্বলদের মারপিট করে। এখানেও তেমনি ছিল। এইরূপ কোনো ছাত্রকে আক্রমণোদ্যত দেখিবামাত্র দুর্বল ছেলেটি চীৎকার করিয়া উঠিল। বিপদে পড়িলে, স্বভাবতই নাকি ভগবানের নাম জিহ্বাগ্রে আসে। আমাদের আসিত

'কাপ্তেন' শব্দটি। দুর্বল ছেলেটি চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাপ্তেন!" ভগবান সর্বব্যাপী হইলেও সর্বদা যে প্রত্যক্ষভাবে বিপদ-উদ্ধারে অবতীর্ণ হন তাহা নয়, কিন্তু এ বিষয়ে কাপ্তেনরা ভগবানের চেয়েও অধিকতর ফলপ্রদ ছিল। 'কাপ্তেন' শব্দটি শুনিবামাত্র, হয়তো গাছের আড়াল হইতে, নয়তো মাটির ঢিবির আড়াল হইতে সশরীরে আবির্ভাব। এই-সব অসম্ভব স্থান হইতে যাহারা কাপ্তেনের অভ্যুদয় দেখিয়াছে তাহারা স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙিয়া নৃসিংহমূর্তির উদয় কিংবা জালে-পড়া কলসী হইতে ধূম-দৈত্যের নির্গমন কখনো অবিশ্বাস করিবে না।

আহারে বসিয়া খুব গোলমাল চলিতেছে, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তের ছেলেটির মুখ হইতে অর্ধোক্তিমাত্র বহির্গত হইল—'কাপ্'—অমনি প্রকাণ্ড ঘর মুহূর্তে মন্ত্রশান্ত হইয়া গেল। আমাদের শয়নে ভোজনে আসনে ব্যসনে কাপ্তেনের অস্তিত্ব সর্বব্যাপী ছিল; এমন-কি, কোনো কোনো ভীরুপ্রকৃতির ছেলে স্বপ্নে পর্যন্ত সংকটত্রাণের জন্য কাপ্তেনের নাম ফুকারিয়া উঠিত।

কাপ্তেনদের সংখ্যাও বড়ো কম ছিল না। প্রত্যেক ঘরে তিন-চারটি ভাগ, প্রত্যেক ভাগে একজন কাপ্তেন। তাহাদের উপরে প্রত্যেক ঘরে একজন করিয়া কাপ্তেন। তিন-চারখানি ঘর মিলিয়া একটি বিভাগ, একজন বিভাগীয় কাপ্তেন। আর, তিনটি বিভাগ মিলিয়া সমস্ত আশ্রম; সকলের উপরে জেনারেল কাপ্তেন বা অধিনায়ক। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধিনায়ক যখন সমস্ত কাপ্তেন পরিবৃত হইয়া শোভা পাইত, তখন সর্বশক্তিমান এই নাতিক্ষুদ্র দলটি দেখিয়া মনে হইত অস্টারলিজের যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বয়ং নেপোলিয়ান বুঝি বা সেনাপতিবৃন্দপরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান।

সমস্ত কাপ্তেন-পদই নির্বাচনমূলক ছিল। কোনো পদের স্থায়িত্ব সপ্তাহান্তিক, কোনো পদের পক্ষান্তিক, কোনোটার বা মাসান্তিক। ছেলেদের ভোটের উপরে নির্ভর করিলেও অধিকাংশ সময়ে কর্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেনরাই নির্বাচিত হইত।

আমাদের সমবয়স্কদের মধ্যে কড়া মেজাজের কাপ্তেন ছিল শ্রীহট্টের শচীন্দ্র সিংহের পুত্র শশধর। আর-একজন ছিল কালিকচ্ছের মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র সাধক। গোবিন্দ চৌধুরী বলিয়া আর-একজন ছিল। আর, সবচেয়ে ভীতি-উৎপাদক ছিল নরভূপ রাও। সে একে খাস নেপালী, অর্থাৎ সামরিক জাতি, তার উপরে কেহ কেহ নাকি তাহার বাক্সে একখানা কুক্‌রি দেখিয়াছে; তা ছাড়া নেপালের জঙ্গলে প্রত্যেক দিন বিকালে বাঘ শিকার করিয়া তাহারা খেলা করে—এই

গল্পই তাহার আদেশ পালিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নরভূপকে ভৃত্যেরা, এমন-কি, আশেপাশের গাঁয়ের লোক পর্যন্ত ভয় করিত। মুখে মুখে তাহার নামটা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কেহ বলিত নরভূত, কেহ বলিত নরভুক।

শশধর সিংহ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লইয়া সেখানেই বহুকাল বাস করিয়াছেন।

কাপ্তেন হিসাবে তাহাকে কিরকম ভয় করিতাম তাহার একটা গল্প এখনো মনে আছে।

তখন আমাদের বয়স বছর তেরো-চৌদ্দ হইবে। শশধর বোধ করি ঘরের কাপ্তেন। চার-পাঁচজনে মিলিয়া আমাদের ছোটো একটি দল ছিল, নিরাপদ-ভাবে নিয়ম ভঙ্গ করাই ছিল আমাদের পেশা। একদিন আমরা গোটা চার-পাঁচ মুরগির ডিম জোগাড় করিয়া ফেলিলাম। কাজটা যত সহজ মনে হইবে তত সহজ নয়। প্রথমত, কাছে পয়সা রাখিবার হুকুম ছিল না, কাজেই পয়সার পরিবর্তে বিনিময় প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সাঁওতাল ছেলেরা ডিম বেচিতে আসিত। খান-দুই পুরানো ধুতি দিয়া ডিমগুলি সংগৃহীত হইল। খুব সম্ভব নিজেদের ধুতি দিই নাই—রোদে মেলিয়া দেওয়া বহু ধুতি ছিল, তারই খান-দুই দিয়া ফেলিলাম।

তার পরে সমস্যা, ডিমগুলি খাওয়া যায় কী প্রকারে? রান্নাঘরের বাহিরে অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণের হুকুম ছিল না। আর, ডিম তো কাঁচা খাওয়া চলে না; তার জন্য সরঞ্জাম অনেক প্রকার চাই। প্রথম দিন কোনো মীমাংসা করিতে না পারিয়া মাঠের মধ্যে গর্ত করিয়া ডিম কয়েকটি পুঁতিয়া রাখিলাম। ঘরে আনিবার উপায় নাই, কাপ্তেনের সর্বভেদী দৃষ্টি আছে। সারারাত্রি ডিমের চিন্তায় ঘুম হইল না; কোনো কুক্কুটমাতাও বোধ করি ডিমের জন্য এমন দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটায় না।

পরদিন আমরা মরিয়া হইয়া উঠিলাম। আজ ডিমগুলি ভাজিয়া খাইবই খাইব; তাহাতে অদৃষ্টে যাহাই থাক্। প্রয়োজন হইলে শশধর-কাপ্তেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিব।

সেদিনটা ছুটি ছিল; উঠিয়াই দেখিতে গেলাম ডিম অটুট আছে কি না। ভগবান মঙ্গলময় সন্দেহ নাই, ডিমের নিটোলে একটিও টোল পড়ে নাই। সেখানে আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতি বসিল। আমি সভাপতিরূপে প্রশ্ন

ঘণ্টার ধ্বনিবৈচিত্র্য শুনিয়া কোন্ পর্ব চলিতেছে বুঝিয়া লইতে হইত

ছেলেদের নানারকমের ছোটো-বড়ো সভায় তিনি নিয়মিত আসিতেন পৃ. ২৩

করিলাম : সিদ্ধ না অম্‌লেট ? অনেক বিতর্কের পরে স্থির হইল সিদ্ধ করা সহজ, কিন্তু অম্‌লেট খাইতে অনেক ভালো। ইহার পরিণাম যখন বিপজ্জনক তখন স্বাদুতর খাদ্য খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব অম্‌লেট করাই সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু তাহাতে তেল চাই, নুন চাই, লঙ্কা চাই, উনুন চাই, তৈজস চাই ; এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আমাদের সব জিনিসেরই যে অভাব !

তখন সভাপতির আদেশে চারজন সদস্য চার দিকে বাহির হইয়া পড়িল—সাজসরঞ্জাম-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন কতজনের যে কত জিনিস হারাইল তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সরঞ্জাম-সংগ্রহ শেষ হইল। স্নানের তেল হইতে খানিকটা তেল, রান্নাঘর হইতে ভৃত্যদের সাধ্য-সাধনা করিয়া একটু লঙ্কা ও নুন, কার যেন একটা কেরোসিনের ডিবে, অন্য কারো একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ও চামচ। কিছুদূরে মাঠের মধ্যে একটা মাটির ঢিবি ছিল, তার পাশে একটা শিরীষ গাছ ; সেখানে গিয়া পাঁচজনে পাঁচটা ডিমের পাঁচটি অম্‌লেট ভাজিয়া খাইতে হইবে। পাঁচজনে তো রওনা হইলাম। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন আমাদের দিকে চাহিতেছে, প্রত্যেকের চাহনিতেই যেন একটা বিশেষ অর্থ। আমরা চলিতেছি, কিন্তু বাঁশঝোপের আড়ালে ও কাহার মাথা ? ভগবান, তোমার পরমকারুণিক বিশেষণ কি একেবারেই শূন্যগর্ভ ? যত সত্য কি তোমার ঐ ন্যায়বিচারক উপাধিটা ? আসন্ন ভর্জিত ডিম্বের চরম মুহূর্তে শশধর কাপ্তেনকে সম্মুখে না আনিয়া ফেলিলে এই বিশ্ববিধানের এমন কী ক্ষতি হইত ? হায়, হায়, ও যে আর কেউ নয়, স্বয়ং শশধর ; ডিমের ভাগ দিলেও যে টলিবে না ! এমন নীরস লোককে কেন তোমার সৃষ্টি, বিধাতঃ ! নাঃ, ভগবান যে পরমকারুণিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই, শশধর-কাপ্তেন অন্য দিকে চলিয়া গেল।

শিরীষ গাছের আড়ালে ডিবের আগুনে কাঁচা তেলে অম্‌লেট ভাজা শেষ হইল। পাছে এই আগুন হইতে ধূমকেতু উঠিয়া শশধরকে ইশারা করে সে ভয় ছিল, কারণ জলস্থল, জীবজড় সমস্তই যে আমাদের প্রতিকূল সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

বহু দুঃখের তাপে ভর্জিত সেই অম্‌লেট যখন মুখে দিলাম, স্বর্গের অমৃত যে ইহার চেয়ে মধুর তাহার প্রমাণাভাব। সেই অম্‌লেটের স্বাদে হঠাৎ মনে এমন একটা উদারতা অনুভব করিলাম যে, তখন শশধরকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে

বোধ করি ক্ষমা করিতে পারিতাম। এই অভিজ্ঞতার ফলে আজ পর্যন্ত আমার কাছে উপাদেয়তম খাদ্য— অম্‌লেট, কিঞ্চিৎ কাঁচা তেলে ভাজা।

আশ্রমে বুধবার অনধ্যায়। এইদিন সকালে মন্দিরে উপাসনা হইত। গুরুদেব উপস্থিত থাকিলে তিনিই উপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে ক্ষিতিমোহনবাবু, শাস্ত্রীমহাশয়, নেপালবাবু বা অন্য-কেহ উপাসনা করিতেন। কারো কারো উপাসনার দিনকে আমরা বড়ো ভয় করিতাম; প্রথমত তাঁহাদের বক্তৃতার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শ্লোক থাকিত, দ্বিতীয়ত শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক উপকারের জন্য কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া বক্তৃতা চলিত। একবার স্বর নামিয়া আসিত; মনে হইত, এইবার বুঝি থামিবেন। কিন্তু হায়, সমবেত আশাকে হতাশ করিয়া পুনরায় স্বর উঁচু হইয়া উঠিত। আবার নিচু হইল, এবারে নিশ্চয় শেষ; কিন্তু না, আবার স্বরের পুনরুজ্জীবন ঘটিল। এমনিভাবে কণ্ঠস্বরের চড়াই উৎরাই ভাঙিতে ভাঙিতে অবশেষে হঠাৎ এক সময়ে থামিতেন। কিন্তু, থামাটা আকস্মিক বৈ নয়, ইচ্ছা করিলে সারাদিন চালাইতে পারিতেন; কখনো মুখে অবসাদের কোনো চিহ্ন দেখি নাই।

অনেকের ধারণা আছে যে, শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মপদ্ধতিতে উপাসনা হইয়া থাকে। এখানকার উপাসনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক; ধর্মের সর্বজন-গ্রাহ্য মূলতত্ত্বই বিবৃত হইয়া থাকে মাত্র। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশও যেমন প্রদত্ত হয় তেমনি খৃস্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি ধর্ম-গুরুদের কথাও বর্ণিত হয়।

আমরা যখন ছোটো তখন দেখিয়াছি, বুধবারে সকালে বড়োদের জন্য, সন্ধ্যায় ছোটোদের জন্য উপাসনা হইত। সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা হওয়াতে আমাদের ভালোই লাগিত, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া আমরা নিরুদ্‌বেগে ঘুমাইয়া লইতাম। এইভাবে বেশ শান্তিতে চলিতেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সুষুপ্তি সরব হইয়া উঠিল, ঘুমের সঙ্গে নাসিকাধ্বনি যুক্ত হইল। তখন হইতে গুরুদেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উপদেশদান শুরু করিলেন, কাজেই আমাদেরও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। প্রায় প্রত্যেক বুধবারে উপাসনার জন্য তিনি নূতন গান রচনা করিতেন। কখনো তিনি স্বয়ং, কখনো দিনুবাবু গান করিতেন।

একবার গুরুদেবের উপাসনাকালে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। গুরুদেব কেবল সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া বসিয়াছেন, উপদেশ আরম্ভ করিবেন। এমন সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। একজন অধ্যাপক, ধরা যাক তাঁহার নাম রামবাবু, হঠাৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, রামবাবু লোকটি ভালোমানুষ, আর ভালোমানুষ না হইলে এমন কাণ্ড কেহ করে না। রামবাবু ভালোমানুষ হইলে কী হয়, বড়ো ভাবালু ছিলেন। তিনি সর্বদা যত্রতত্র নাকি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তার আগের দিনই নাকি পায়েস রাঁধিতে রাঁধিতে সুগন্ধি ধোঁয়ার আড়ালে অস্পষ্টভাবে তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্শন ঘটিয়াছিল। সেই অভিনব অভিজ্ঞতা তিনি ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কখনো কাঁদিয়া কখনো হাসিয়া প্রকাশ করিয়া চলিলেন। গুরুদেবের কাছেও বোধ করি এই অভিজ্ঞতা অভিনব। আর, আমাদের কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ব্যাপারটা মন্দ লাগিল না। এক-ঘেয়েমির মাঝে একটু নূতনত্বের ছিটা।

৭ই পৌষের উৎসব

৭ই পৌষের উৎসব আশ্রমের সবচেয়ে জমকালো পর্ব। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা, এই সময়ে আশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা। কাজেই দুইদিন খুব ধুমধাম হইত।

অঘ্রান মাসের শেষে দেখিতাম একদল আতসবাজির কারিগর আসিয়া পৌঁছিত। তাহারা বাঁখারি বাঁশ কাগজ বারুদ ও অন্যান্য মসলা দিয়া নানারকম আতসবাজি তৈরি করিত। হাউই, তুবড়ি, কত কী বাজি? কিন্তু সবচেয়ে যা আমাদের মনোহরণ করিত তা হইতেছে একটা কাগজের জাহাজ ও একটা কাগজের কেল্লা। অন্য সব বাজি পোড়ানো শেষ হইয়া গেলে এই দুটি গোলা-ছোঁড়াছুঁড়ি যুদ্ধ করিয়া ভস্ম হইয়া যাইত। জনতা উল্লাসধ্বনি করিত, বলিত এবারে জাহাজ জিতিল, অন্য দল বলিত কেল্লা জিতিল; অবশেষে দুই দলে একমত হইয়া আনন্দ করিয়া বাড়ি ফিরিত। আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই জাহাজ ও কেল্লার একই লীলা ও একই পরিণাম দেখিতাম যাহাতে হার-জিতের কোনো আভাস ছিল না। তখনো জনতার মতের প্রতিবাদ অভ্যাস করিতে পারি নাই; তাই ভাবিতাম, বোধ হয় উহাদের কথাই সত্য। জনতার চোখই আলাদা ধাতুতে গঠিত। এখনো প্রকাশ্যে জনতার মতের প্রতিবাদের দুঃসাহস

নাই, তবে জনতার দৃষ্টি সম্বন্ধে এখন যে মত পোষণ করি তাহা প্রকাশ করিয়া না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উৎসবের দিন অন্ধকার থাকিতে উঠিতে হইত। ভোরবেলা মন্দিরে উপাসনা হইবে। মন্দিরটি দেবদারুপাতা গাঁদাফুল আলপনা দিয়া কী সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে; তার উপরে আবার অগুরুধূপের গন্ধ! মন্দিরের উত্তরের মাঠখানা এক রাত্রির মধ্যে দোকানে তাঁবুতে গাড়িতে নাগরদোলায় শামিয়ানায় ভরিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার লোক। সাঁওতাল বাঙালি মাড়োয়ারী কেহ বেচিতে, কেহ কিনিতে, কেহ তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। কত রকমের দোকান! সন্দেশ, লোহার বাসন, কাটা কাপড়, তেলে-ভাজা, খেলনা, এমন-কি, সিউড়ি হইতে কয়েকখানা মোরব্বার দোকানও আসিয়াছে। মাঝখানে পাল খাটানো হইয়াছে; যাত্রাগান হইবে। এক দিকে নাগরদোলা ইতিমধ্যেই আরোহী লইয়া বন্ বন্ শব্দে পাক খাইতেছে আর মেলার শত রকমের কোলাহলকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হইতেছে রসুনচৌকির হরিষে-বিষাদের হরগৌরী রাগিণী।

এ দিকে আশ্রমও অতিথিসজ্জনে পূর্ণ হইয়া যাইত। আমরা ছোটোরা বড়োদের নেতৃত্বে মেলায় যাইবার হুকুম পাইতাম। কিন্তু, চিহ্নিত স্থান ছাড়া কোথাও যাইবার উপায় ছিল না, পিছনে অভিশাপের মতো সেই কাপ্তেনের দল লাগিয়াই আছে। কিছু যে কিনিব সে উপায় নাই, প্রথমত টাকাপয়সা নিজেদের কাছে রাখিবার নিয়ম ছিল না, তার উপরে আবার কাপ্তেনদের সতর্ক দৃষ্টি।

দুপুরবেলা আহারান্তে যাত্রাগান আরম্ভ হইত। আমরা সারিবদ্ধভাবে আসরে গিয়া বসিতাম। যাত্রাগান আমাকে চিরদিন অত্যন্ত মুগ্ধ করে, আমি তন্ময় হইয়া বসিয়া দেখিতাম। নীলকণ্ঠ অধিকারীর কৃষ্ণবিষয়ক কোনো-একটা পালা। গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ যখন হুঁশ হইত, দেখিতাম শীতের রোদ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, বাতাস শীতল হইয়া উঠিয়াছে, মেলার কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, আর তার সঙ্গে তাল রাখিয়া বাজিতেছে বাজিওলার ডুগ্‌ডুগি, বাউলের একতারা, ফিরিওলার বাঁশি, আর সাঁওতাল-নাচের মাদল।

সন্ধ্যার আগে আহার; খাওয়াটা বেশ রাজকীয় ধরনে হইত। খাবার পরে আবার মন্দির, মন্দিরের সে কী আলোকসজ্জা! ঝাঁচটা ঝাড়ে মোমবাতির আলো, মেঝেতে বাতিদানে অসংখ্য মোমবাতি। সন্ধ্যার সময়ে মেলার ভিড় এত বাড়িয়া উঠিত যে, তাহা সংযত করার সাধ্য রায়পুরের রবিসিংহ ছাড়া আর

কাহারো ছিল না। হাঁ, জনতা সংযত করিবার মতো চেহারা বটে! রবিসিংহের ধুতি লাল, চাদর লাল, পাগড়ি লাল, চক্ষুদুটাও যেন লাল। পুলিসের তো শুধু পাগড়ি লাল। এই শক্তি-পুরুষ বেত হাতে সপাসপ জনতাকে আঘাত করিয়া চলিয়াছেন, জনতা শশব্যস্ত হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এ বিষয়ে রবিসিংহের টেক্‌নিক নিখুঁত। দোষী বাছিয়া জনতাকে শাসন করা সম্ভব নয়। জলের উপরে এক জায়গায় চাপ দিলে তাহা যেমন সর্বত্র সমানভাবে সঞ্চালিত হয়, জনতা-শাসনের টেক্‌নিকও তদনুরূপ। জনতার যে-কোনো একটা জায়গায় আঘাত করো, তাহার ফল সর্বত্র সমানভাবে দৃষ্ট হইবে। রবিসিংহ আধুনিক ডিক্টেটরদের অখ্যাত পূর্বপুরুষ।

সবশেষে বাজিতে আগুন দেওয়া হইত। তুবড়িগুলা মুহূর্তমধ্যে অগ্নিময় তরুতে অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত। উল্কামুখী হাউই-গুলা আকাশের তারার প্রতি বিদ্যুদ্বেগে সঙিন চার্জ করিয়া অবশেষে এক সময়ে বিচিত্র স্ফুলিঙ্গে ঝরিয়া পড়িত। সবশেষে জাহাজ ও কেল্লায় অগ্নিসংযোগ হইত। ততক্ষণে রাত্রি গভীর হইয়াছে, শীতের শিশির রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক তৃণের উপর পড়িয়া একপ্রকার সিক্ত গন্ধ জাগাইয়া দিয়াছে; সেই সময়ে উৎসবের পালা সাঙ্গ করিয়া আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

৮ই পৌষ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসব। আমবাগানে সভা বসিত। প্রাক্তন ছাত্ররা সারবন্দীভাবে সভায় প্রবেশ করিত; সর্বাগ্রে প্রাক্তনতম রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

৯ই একটা স্মরণ-উৎসব। আশ্রমের যে-সব ছাত্র, অধ্যাপক, কর্মী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষে হবিষ্যান্ন-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।

দুর্দৈব

উৎসব ও দুর্দৈবের মধ্যে একটি দিনের মাত্র ভেদ। ১০ই কি ১১ই পৌষ বার্ষিক ক্লাস-প্রমোশনের পালা। সকলে ক্লাস-অনুসারে সারবন্দীভাবে দাঁড়াইতাম, সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় উন্নীত ছাত্রদের নাম ডাকিয়া যাইতেন। যাহারা অনুন্নীত থাকিত তাহারা দু-চারদিনের জন্য লজ্জায় আত্মগোপন করিত। কিন্তু, আমাদের খুব বেশি লজ্জা হওয়ার কথা নয়। পড়াশুনাটা জীবনের মুখ্য নয়, এমন-কি, পড়াশুনার জন্যই এখানে আসি নাই, এই কথাগুলা একবার এতভাবে শুনিয়া-

ছিলাম যে ফেল হইলে লজ্জার ভাবটা একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। এমন-কি, এক-একবার সন্দেহ হইত, অনেকে বোধ করি ফেল করাকেই জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে উন্মুখ ছিল। তা ছাড়া, বছরে বছরে নিয়মিত পাস করিয়া গেলে শীঘ্রই এমন প্রিয়স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এমন আশঙ্কাও যে কারো কারো মনে ছিল না তাহা নয়।

কিন্তু, ইহার বিপরীত ঘটনাও কখনো কখনো ঘটিত। একবার ব্যাপার মারাত্মক আকার ধারণ করিল। সেবার আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই, আমাদের সঙ্গে পড়িত দ্বিজেন পাল। তখন আমাদের টেস্ট্ পরীক্ষা দিয়া আসিতে হইত চুঁচুড়াতে স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের আপিসে। যাহারা পাস করিত, তাহাদের নামে পরীক্ষা দিবার একখানা করিয়া অনুমতিপত্র সেই আপিস হইতে পাঠাইয়া দিত।

দ্বিজেনের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত; একদিন বোধ হয় দু-এক ঘা চড়ও মারিয়াছিল। বাহুবল দুর্বলের শক্তি নয় জানিয়া তাহাকে জব্দ করিবার অন্য পন্থা খুঁজিতে লাগিলাম। ভজু নামে আমার আর-এক সহপাঠী পরামর্শ দিল, দ্বিজেনের অনুমতিপত্রখানা লুকাইতে হইবে। বোধ করি ভজুও দু-একটা চড় খাইয়া থাকিবে। আমরা জানিতাম, দ্বিজেন পাস-ফেল সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর, কিন্তু তাহার তীব্রতা যে কতখানি তাহা কেহই জানিতাম না। যথাদিনে আমরা সকলেই ডাকঘরে গেলাম, সকলের নামেই চিঠি আসিল, দ্বিজেনের নামে আসিল না। এমন সাধে বাদ সাধিল দেখিয়া ইন্‌স্‌পেক্টরের উপর আমাদের রাগ হইল। দ্বিজেন কোথায় গেল কেহ খোঁজ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে বোলপুর স্টেশন হইতে সংবাদ আসিল শান্তিনিকেতনের কাছে রেল লাইনে একজন কাটা পড়িয়াছে। সকলে রেল লাইনের দিকে ছুটিলাম, লাইনটা সেখানে খাদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। উপরে দাঁড়াইয়া নীচে চাহিলাম, গাছপালা ছিল বলিয়া সব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু সবটা দেখিবার প্রয়োজনও ছিল না, এক পাশে রক্ষিত দ্বিজেন পালের চাদরখানাই যথেষ্ট!

প্রথমেই মনে হইল, ভাগ্যে তাহার চিঠি আসে নাই! সে চিঠি লুকাইলেও এই ব্যাপার হইত। কোনো দিন কি আর নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতাম!—পরের দিন দ্বিজেনের নামে অনুমতিপত্র আসিল।—মাখন নামে তার এক ভাই নীচের ক্লাসে পড়িত, সে অন্ত্যেষ্টি সমাধা করিল।

পরদিন মাখনের ঘরে গেলাম, দেখি সে কেমন আছে। সেখানে গিয়া দেখি, তার তিন-চারিজন সহপাঠী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গীতা পাঠ করিয়া শুনাইতেছে; নিছক সংস্কৃত শুনিয়া পাছে সান্ত্বনা পাইতে অসুবিধা হয় তাই বোধসৌকর্যার্থে অনুবাদও করিয়া দিতেছিল। এম সময় একটা ধাতুরূপে ঠেকিয়া গেল; টীকাতেও কুলাইল না। প্রধান উপদেষ্টা শমীনাথ বেগতিক দেখিয়া বলিল, "দেখো দেখি একবার ব্যাকরণকৌমুদীখানা।" হায়, কে জানিত গাম্ভীর্যের চূড়া হইতে এক পা ফসকাইলেই একেবারে হাস্যকরতার অতলস্পর্শী খাদ! ব্যাকরণকৌমুদী-সহযোগে শোকসান্ত্বনা আমার কাছে এমনই হাস্যকর মনে হইল যে পাছে তাহার গাম্ভীর্য নষ্ট করিয়া ফেলি সেই ভয়ে স্থান ত্যাগ করিলাম। উপদেষ্টাদের দোষ দেওয়া যায় না; তাহারা শুনিয়াছে, গীতা সর্বরোগের মকরধ্বজ। কিন্তু, কঠিন ধাতুরূপ যে নিরপেক্ষ। উৎসবের আনন্দ ও মৃত্যুর শোক উভয়ের প্রতিই সে সমান নির্বিকার।

শীতের ভ্রমণ

নূতন বৎসরের ক্লাস আরম্ভ হইতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ হইত। উৎসবের পর হইতে এ পর্যন্ত ছুটি। অল্প দিনের ছুটি বলিয়া ছেলেরা বাড়ি যাইত না। কাছে যাহাদের বাড়ি তাহাদের অনেকে যাইত বটে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এ সময়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া এক-এক দিকে বেড়াইতে যাইত। অধিকাংশ দলই হাঁটিয়া যাইত; কোনো কোনো দল রেলে করিয়া বেড়াইয়া আসিত।

এই সময়ে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের পীঠস্থানে প্রকাণ্ড মেলা বসে, অনেকে সেখানে যাইত। নাবার নান্নুরে চণ্ডীদাসের পীঠস্থানও অনেকের আকর্ষণের বস্তু ছিল। বীরভূম এক সময়ে হয়তো বীরভূমি ছিল, কিন্তু চিরকালের জন্য ইহা কবিভূমি নামে পরিচিত হইয়াছে—জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুর।

গ্রীষ্মের ছুটির অপেক্ষায়

নূতন বছরের ক্লাস আরম্ভ হইলে কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি আর আসে না। গ্রীষ্মের ছুটির পরে পূজার ছুটি পর্যন্ত মাস তিনেক কাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইত কিন্তু পূজার ছুটির পর হইতে গরমের ছুটি প্রায় ছ-মাসের ধাক্কা, দিন আর কাটিতে চায় না।

পৌষ মাস গেল, শালপাতা ঝরিতে আরম্ভ করিল; মাঘ মাস আসিল, আমের মুকুল ধরিল; ফাল্গুন মাসে শালের কচি পাতা উঁকি মারিল; ইহারা যেন ঋতুর গাঙে লগি ঠেলার মতো; উজান ঠেলিয়া আমাদের নৌকাখানাকে ছুটির ঘাটের দিকে লইয়া চলিয়াছে। উঃ, কত ধীরে!

অবশেষে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িল। বিকালবেলায় ক্লাস করা আর সম্ভব নয়, এত গরম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, শান্তিনিকেতনে ক্লাস দুইবেলা হয়; একবার সকালে, একবার বিকালে, মাঝখানে বিরাম। বিকাল-বেলার ক্লাস বন্ধ হইয়া কেবল সকালে ক্লাস চলিতে লাগিল। ইঁদারার জল কমিয়া আসিল; মগ-মাপা স্নান শুরু হইল। তরকারিতে বেগুন কপি কবে লোপ পাইয়াছে; এখন চলিতেছে লাউ ঝিঙে সজনের ডাঁটার পালা। দুধ বিক্ষুব্ধ হইয়া ঘোল নাম ধরিয়াছে।

বড়োদের মহল হইতে কানাঘুষায় আভাস পাই এবারে কী অভিনয় হইবে। কখনো শুনি 'রাজা', কখনো শুনি 'অচলায়তন'। অধ্যাপকমহলে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, কবে ছুটি দেওয়া যায়। কেহ বলেন, বৈশাখের প্রথমে, এবারে এত গরম! কেহ বলেন, ২৫শে বৈশাখের পরে, এবারে গুরুদেবের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি!

"জলের কী হইবে? ইঁদারা যে শুকাইল।"

"ছেলেদের বাঁধে স্নান করিতে পাঠাও। ইঁদারার জলে রান্না ও পান চলিবে।"

অবশেষে একদিন পাকা রকমে শুনিলাম, ছুটি ২৫শে বৈশাখের পরে। ছুটি বিলম্বে হইবে বটে, কিন্তু গুরুদেবের জন্মোৎসব, কাজেই কাহারো বিশেষ দুঃখ হইল না।

ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলের ছেলেরা ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যস্ততাও যাওয়ার আনন্দের রূপান্তর, কেহ কেহ বা একখানা সাদা খাতা বাঁধিয়া ফেলিল। পথের স্টেশনগুলার নাম লিখিবে। প্রয়োজনের হিসাবে ইহা একেবারে নিরর্থক, আর টাইম-টেব্‌ল্ হইতে অনায়াসে নামগুলা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, পথের আনন্দটাকে পর্বে পর্বে চিহ্নিত করিয়া দীর্ঘতরভাবে ভোগ করিবার জন্যই এই আয়োজন। সহযাত্রী ছেলেরা এখানে-ওখানে বসিয়া প্রায়ই সলাপরামর্শ করে। গোয়ালন্দের কোন্ হোটেলটা ভালো

এ বিষয়ে মতভেদ ঘটিলেও বেশিক্ষণ অনৈক্য থাকে না; যাওয়ার আনন্দে বাদী প্রতিবাদী অবিলম্বে আপস করিয়া ফেলে। কলিকাতা প্রভৃতি কাছের যাত্রী-দের প্রতি দূরের যাত্রীদের কী অবজ্ঞা! তাহাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথাও বলে না। ভাবটা, 'আমরা এখন বড়ো ব্যস্ত, তোমাদের মতো সুখের যাত্রা আমাদের নয়। তোমাদের চিন্তা নাই, কিন্তু আমাদের এখন বড়োই উদ্‌বেগে দিন কাটিতেছে।'— দুঃখে কষ্টে মানুষ কখনোই বাঁচিতে পারে না, যদি-না দুঃখের সঙ্গে দুঃখের গৌরব থাকে।

বসন্তরাত্রির বৈতালিক

গ্রীষ্মকালের সব চেয়ে আরামের সময়টি রাত্রি। গরমের জন্য সকলেরই ঘরের বাহিরে শুইবার ব্যবস্থা। তক্তপোশখানা টানিয়া মাঠের মধ্যে আনিয়া চারখানা বাখারি বাঁধিয়া মশারি টাঙাইবার বন্দোবস্ত। এমনি করিয়া মাঠের মাঝে, শাল-গাছের ছায়ায়, বহু তক্তপোশ পড়িয়া গিয়াছে। সারাদিন রোদে পুড়িয়া রাত্রে সে কী স্নিগ্ধ বিরাম! সূর্য ডুবিতেই পশ্চিম হইতে হাওয়া ওঠে; সেই হাওয়ার উপরে সোয়ার হইয়া ধূলিকণা বালক ক্রুজেডারদের মতো প্রবলবেগে সর্বনাশের মুখে ছুটিয়া চলে। কিন্তু আমাদের কি তাতে হুঁশ আছে? কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া গল্প করিতেছি; কেহ বা আপনমনে গান জুড়িয়া দিয়াছি। এমন-কি, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছাত্রের মনেও 'পড়া হইল না' বলিয়া বিবেক দংশন করিতেছে না।

একটা কোকিল বসিয়াছে আমবাগানের কোন্ গাছে, আর-একটা নিশ্চয় ঐ শিরীষ-শাখায়। দুটিতে উত্তর-প্রত্যুত্তরে কুহু-বিনিময়ের মাকু ছুঁড়িয়া সুরের সূক্ষ্ম মলমল বুনিয়া তুলিতেছে। বাতাস একটু পড়িতেই শালফুলের গন্ধ আকাশের ভাঁজে ভাঁজে জমিয়া চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করে। এমন সময়ে সাঁওতালগ্রামের ঊর্ধ্বে, বিলম্বিত পথিকের মতো কৃষ্ণপক্ষের ক্লান্ত চন্দ্রের আবির্ভাব। পুষ্পিত শালবীথিকার শীর্ষ পুরাতন হস্তীদন্তের মতো ঘনশুভ্র। মুকুলের মধুতে মসৃণ আমের পাতা বর্শাফলার মতো উজ্জ্বল। আর অন্ধকার বনভূমিতে পরিবর্তনশীল ঐ সাদা-কালো দাগ, না জানি কোন্ লিখনপ্রয়াসী দেবশিশুর স্লেটের পাটে আঁকা অপটু হাতের আঁকজোখ।

দূর হইতে সুর ভাসিয়া আসিল, ঐ-যে বৈতালিকদল গান আরম্ভ

করিয়াছে ! ও কাহারা চলিয়াছে আলোছায়ার ভাঁজে ভাঁজে, শালবীথিকার তলে তলে, ঝরা পাতার মঞ্জীর যাহাদের পায়ে পায়ে ধ্বনিত, ভুঁয়ে-ঝরা ফুলের মধু অনেকক্ষণ যাহাদের পদতল ঘিরিয়া সুনিপুণ অলক্তকবেষ্টন আঁকিয়া দিয়াছে !

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা !

কোকিল-দুটি পরস্পর প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া ঐ গানের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য সহযোগিতা করিতেছে। বাতাসে বনভূমি নড়ে, ছায়ার দোলরজ্জুতে জ্যোৎস্না যেন ঐ গানের তালে তাল রাখিয়া দুলিতেছে !

আনন্দেরই ছবি দোলে
দিগন্তেরই কোলে কোলে ;
গান দুলিছে নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা !

কাহাদের স্রস্ত কেশে এতক্ষণ শালফুল ঝরিল, কাহাদের কবরীর রক্তকরবী অন্ধকারের পথকে চিহ্নিত করিয়া করিয়া মিলাইয়া গেল, কাহাদের সুরে মানুষে-প্রকৃতিতে রাখীবিনিময় ঘটিল !

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলিছে,
আজি আমার হৃদয়দোলায়
কে গো দুলিছে !

তখন কেবল আলোছায়ার দোরোখা আস্তরণের তলে শুইয়া সম্মিলিত সুরের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিচিত কণ্ঠটি অনুধাবন করিবার প্রয়াসে ছুটিতে ছুটিতে অজ্ঞাতসারে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সুষুপ্তির মধ্যে অকস্মাৎ কখন আত্মবিস্মরণ !

গান দূরতর, বাতাস মৃদুতর, চারি দিক প্রায় নীরব। শালবীথিকার পূর্বতম প্রান্ত হইতে, রূপকথার জগৎ হইতে যেন ভাসিয়া আসিল :

দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি—
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা অতলা !

একি স্বপ্ন না সত্য! মনের কল্পনা না জ্যোৎস্নার মরীচিকা! বিস্মৃতির উজান ঠেলিয়া উজ্জয়িনীর কোন্ স্বপ্ন যেন দক্ষিণ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল।

দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা অতলা।

আশ্রম নীরব। তখন সেই কোকিল-থামা, বাতাস-ধরা, গন্ধস্তিমিত আকাশে কেবল স্পন্দিত তারাগুলি মাত্র জাগ্রত— আর কেহ কোথাও জাগিয়া থাকে না।

ছাত্র-স্বরাজ

এই বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ ছাত্রস্বরাজ-প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বৎসরে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সে সময়ে ছাত্রদের কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের স্বাধীনতার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল; শিক্ষক, অভিভাবক, এমন-কি, ছাত্রগণও এই সংকীর্ণতার পরিপোষক ছিল। এরূপ অবস্থায় এই ছাত্রস্বরাজ-প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

'ডিসিপ্লিন' শব্দটাতে একটা মোহজনক ঝংকার আছে; সে ঝংকার অনেকটা বন্দীশালার লোহার শিকলের ঝংকারের অনুরূপ। জীবনে ডিসিপ্লিনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহা যখন উপলক্ষ হইতে লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন এমন বালাই আর নাই। কিন্তু, উপলক্ষ কোন্ অগোচরে যে লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, তাহা দেখিবার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রায়ই থাকে না; ফলে ভৃত্য মনিবের স্থান অধিকার করিয়া দাসরাজত্ব স্থাপন করিয়া বসে।

ইহার একটা উদাহরণ আমার চোখে বহুবার পড়িয়াছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে দুপুরবেলার রোদে, ভরা পেটে, ঘুম-ভরা চোখে, ছাত্ররা বটতলায় দাঁড়াইয়া ড্রিল করে। ড্রিল-মাস্টারের অবস্থাও তদনুরূপ— কৃশ, রুগ্‌ণ, মুখে চোখে বিরক্তি, পায়ে একজোড়া চটি! এমন বিসদৃশ ড্রিল-মাস্টার যে কোথা হইতে সংগৃহীত হয় তাহা একমাত্র কর্তৃপক্ষেরাই জানেন। এই ছাত্র ও শিক্ষক অসরল রেখায় দাঁড়াইয়া তালে তালে হাত-পা নাড়ে, গল্পগুজব করে, হাসিঠাট্টা করে— এবং ছাড়া পাইবা মাত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আবার ইস্কুলের কোঠায় ফিরিয়া যায়। সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি তাহাদের নিছক বিরক্তি, অবিশ্বাস, ধিক্‌কার ও ঘৃণার

ভাব। এ দিকে শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ পরম নিঃসন্দেহে বৈদ্যুতিক পাখার তলে বিরাজমান থাকিয়া মনে করেন যে, এই ব্যাপার দ্বারা দেশের প্রতি, বালকদের বর্তমান স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ চরিত্রের প্রতি, তাঁহারা কর্তব্য সমাপন করিতেছেন। এমন মূঢ়তা অল্পই দৃষ্ট হয়; উপলক্ষ লক্ষ্য হইয়া উঠিবার ইহা একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

বস্তুত, বাঙালি ছাত্রের জীবনে এই ড্রিল উপলক্ষও নয়। ইংরেজ ছাত্র যখন ড্রিল শেখে তখন সে ভাবী সামরিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, ড্রিল তাহাদের পক্ষে সত্যই উপলক্ষ। আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্যই নাই; তবু কাগজে-কলমে খাঁটি থাকিবার জন্য মাধ্যাহ্নিক ড্রিলের এই বিরক্তিকর অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ডিসিপ্লিন বিষয়ে নানারূপ বাধার সম্মুখীন হইলেন। শিক্ষকদের তো তিনি গড়িয়া-পিটিয়া তৈরি করেন নাই, তাঁহারা পুরাতন ছাঁচেই মানুষ। ডিসিপ্লিন শব্দটাতে তাঁহারা অভ্যস্ত। তাঁহারা দেখিলেন, এখানে ডিসিপ্লিন কই! এমন-কি, ইঁহাদের চাপে প্রথম প্রথম কবিকে অনেক পরিমাণে স্বমতের সাময়িক পরিবর্তন করিতে হইল। বস্তুত, আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে ডিসিপ্লিনের কিছু যেন কড়াকড়ি ছিল।

এই সমস্যার কবিজনোচিত সমাধান রবীন্দ্রনাথ করিলেন। ডিসিপ্লিন একেবারে ঘুচিল না, কিন্তু তাহার ভার শিক্ষকদের হাত হইতে লইয়া সর্বতোভাবে ছাত্রদের হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন। ইহার প্রধান উপকার এই হইল যে, পরের হাতের শাসন হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় শাসনের গ্লানি যেন অন্তর্হিত হইল। ইহাতেও কম বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু, এজন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না, দেশের মধ্যেই তখন এ বিষয়ে প্রতিকূলতা ছিল। ছাত্রেরা নিজেদের শাসন করিবে, কী আশ্চর্য! বিজ্ঞজনেরা ইহাকে কবির খেয়াল বলিয়া মনে করিল। কবি যে 'আন্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল' তাহার যেন আর-একটা নূতন প্রমাণ মিলিল। ঘরে-পরে বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের ভার প্রায় ষোলো-আনাই ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিলেন। কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এতখানি স্বাধীনতা আর-কখনো দেওয়া হইয়াছে কি না, জানি না।

ছাত্রদের কার্যপরিচালনের জন্য একটি সভা ছিল; ইহার নাম আশ্রম-সম্মিলনী। ইহাকে ছাত্রদের পার্লামেন্ট বলা যাইতে পারে। সমস্ত ছাত্রই

ইহার সদস্য। সকলে মিলিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত করিয়া দিত। এই সমিতিই প্রকৃতপক্ষে শাসনকর্তা। সম্মিলনীর একজন সম্পাদক থাকিত। কাপ্তেনগণ ভীতিকর ছিল বলিয়াছি; আবার, সম্পাদক কাপ্তেনগণের পক্ষেও ভীতিকর ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, আশ্রমসম্মিলনীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন সরোজরঞ্জন চৌধুরী।

নিয়ম প্রস্তুত করিয়া দেওয়া ছিল সম্মিলনীর মুখ্য কর্তব্য; এবং যে-সব নিয়ম প্রস্তুত হইতেছে সেগুলি যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না তাহা দেখিত কার্যনির্বাহক সমিতি।

গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য একটি বিচারসভা ছিল। সম্পাদক ও কাপ্তেনগণ বিচারক। রাত্রে আহারান্তে কোনো নিভৃত স্থানে বিচারসভা বসিত। বিচারসভায় কাহারো নাম প্রেরিত হইয়াছে শুনিলে মুখ শুকাইয়া যাইত। কাপ্তেন সম্পর্কে ছাত্রদের যে আতঙ্ক, সম্পাদক সম্পর্কে কাপ্তেনগণের যে আতঙ্ক, বিচারসভা সেই-সমস্ত আতঙ্কের ঘনীভূত দুগ্ধ।

মাসে আশ্রমসম্মিলনীর দুটি অধিবেশন হইত। অমাবস্যার রাত্রে একটি, পূর্ণিমার রাত্রে একটি। ঐ দুইদিন বিকালবেলায় অনধ্যায় থাকিত। অমাবস্যার সভায় কেবল কাজের কথা হইত। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে তিনি সভাপতি হইতেন। ছাত্ররা বিতর্ক করিত, ভোট দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইত। ছাত্রেতর সকলে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন।

পূর্ণিমার অধিবেশন আনন্দোৎসবের। গান, বাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি হইত। আশ্রমের ছোটোবড়ো সকলেই এই আনন্দের অংশভাক্ ছিল।

প্রত্যেকদিন একজন ছাত্র পাকশালার অধ্যক্ষকে সকলপ্রকার কাজে সাহায্য করিত। সেদিন ক্লাসের পড়া হইতে তাহার ছুটি।

আবার প্রত্যেকদিন পালাক্রমে চার-পাঁচজন ছাত্র অতিথিদের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হইত। অতিথিপরিচর্যার যাবতীয় ভার ছিল তাহাদের উপরে।

সাহিত্যচর্চা

সাহিত্যচর্চার দিকে যে আমি কী করিয়া ভিড়িয়া পড়িলাম তাহা আজ আর আমারও মনে নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পূর্বসংস্কার ছিল না, কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম যে এখানেই ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নাই। শান্তিনিকেতনে বালকচিত্তকে চারি দিক হইতে জাগাইয়া তুলিবার নানা আয়োজন ছিল। খেলাধুলা, লেখাপড়া, সংগীতনৃত্য, আবৃত্তি-অভিনয়, সেবাশুশ্রূষা এবং চিত্র ও সাহিত্য। খেলাধুলার মতো অতি-পুরুষোচিত ব্যাপারে আমার ভীরু মন কোনো দিন সাড়া দেয় নাই। ওর মধ্যে বোধ করি সাহিত্যটাই সব চেয়ে নিরীহ ছিল, তাই কোন্‌দিন নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সেই দিকেই ভিড়িয়া পড়িলাম। আমার ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন নাই। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া কিভাবে ছাত্রদের সাহিত্যের দিকে টানিয়া লইত তাহা লেখাই আমার উদ্দেশ্য। বস্তুত, এই স্মৃতিগ্রন্থকে আমার জীবনী বলিয়া গ্রহণ করিলে পাঠক ভুল করিবেন। আমার স্মৃতিকে উপলক্ষ করিয়া শান্তিনিকেতনের কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। এজন্য যে-কোনো ছেলের কাহিনী লইলেই চলিত, তবে নিজের স্মৃতি নিজের কাছে স্পষ্ট বলিয়া সুবিধার খাতিরে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। আর, আমি সাধারণ মাপের বালক ছিলাম বলিয়া এই স্মৃতিকথাকে শান্তিনিকেতনের সাধারণ অভিজ্ঞতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যসভা সাজাইবার কাজ দিয়া আমার সাহিত্যজীবন শুরু করি, সাহিত্যরচনা দিয়া নয়। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সাহিত্যসভা শান্তিনিকেতন-জীবনের একটি অঙ্গ ছিল। ফুল লতা পাতা দিয়া সভা সাজাইয়া ছেলেরা নিজেদের রচনা পড়িত, নূতন-শেখা গান গাহিত। কিন্তু, বড়ো ছেলেদের সভার কেন্দ্রে ঘেঁষিতে পারিতাম না, দূর হইতে দর্শকরূপে দেখিতে হইত; দর্শকরূপেও যে সব বুঝিতে পারিতাম তাহা নয়। এমন নিষ্ক্রিয় নির্বোধ দর্শক সাজিয়া থাকিতে বেশিদিন মন চাহিল না। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া ছোটোদের সাহিত্যসভার আয়োজন করিয়া ফেলিলাম। আশ্রমের বাগানে ফুল লতা পাতার অভাব ছিল না; যত খুশি ভাঙিয়া আনিয়া ঘর সাজাইলাম, কিন্তু রচনা? সে তো আর প্রকৃতির দান নয় যে যত্র তত্র অজস্র ফুটিয়া থাকিবে! কিন্তু, সেজন্যও খুব বেশি বেগ পাইতে হইল না। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'কাব্য পাঠ্য ছিল, সেই কাব্যমালঞ্চে ডাকাতি করিয়া কবিতা লিখিত হইল। তিনটি ছত্র বা কবির, চতুর্থ ছত্রটি কবি-যশোলিপ্সুর! ধরিবার কেহ ছিল না, কারণ শ্রোতা ও লেখক প্রায় সকলেই কবিযশঃপ্রার্থী। পরিণত বয়সে আজও সেই কাজ করিতেছি; রবীন্দ্রনাথের কাব্যমালঞ্চের চৌরকবি সাজিয়া সুরঙ্গ কাটিয়া চলিয়াছি. কিন্তু

হায়, সেদিনের বালক-শ্রোতাদলের পরিবর্তে আজ চারি দিকে সতর্ক কোটাল সমালোচনার দণ্ড হাতে পাহারায় নিযুক্ত। তবে সান্ত্বনা এই যে, কবি যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাব-চোর, তেমনি সমালোচক যে-দণ্ডের আঘাত করিতেছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের। তবে কবিরা নাকি নিরীহ, মার খাইয়া স্বীকার করে, আর সমালোচকেরা হয় সম্পাদক নয় প্রকাশক ; মার খাইলেও বুঝিবার মতো চামড়ার বেদনাগ্রাহিতা অনেক দিন তাহাদের চলিয়া গিয়াছে।

সেই বালককালের সভাপর্বের এক দিনের কথা আমার মনে আছে। সেটা ছিল চৈত্র মাসের সন্ধ্যা, ছেলেরা খেলিতে গিয়াছে, আমরা দুই বন্ধুতে হাস-পাতালের বাগানে সভার জন্য ফুল তুলিতেছি। কে জানিত ফুল তুলিতে তুলিতে কখন বিনি-সুতায় মানুষে মানুষে হৃদয়ের গ্রন্থি পড়িয়া যায়, সাহিত্য ও বন্ধুত্ব একসূত্রে গ্রথিত হইয়া ওঠে। সেই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে দৈবাৎ সেদিনকার সঙ্গীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুধাইলাম, "অমুক কোথায় ?" তাহার দাদা বলিল, "আঙিনায় দেখো, নূতন মোটর কিনিয়াছে, তাই লইয়া বোধ করি ব্যস্ত।" আঙিনায় গিয়া নূতন মোটর দেখিলাম, আর দেখিলাম মোটরের তলা হইতে নিষ্ক্রান্ত দুইখানা পা, বাকি মানুষটা গাড়ির তলায় অদৃশ্য হইয়া বোধ করি ইস্‌ক্রুপ আঁটিতেছে। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সে উত্তর দিল, "তুমি !" বড়োই বিসদৃশ লাগিল— সেদিনের সেই ফুল তোলা আর আজকার ইস্‌ক্রুপ আঁটা ! তবে তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের এই যে, সে সাহিত্যিক হয় নাই, কাজেই নিজের মোটর চড়িয়া বেড়ায়। অবশ্য, আমার কৃতিত্বও কম নয়, কলিকাতায় হাজার হাজার মোটর থাকা সত্ত্বেও আমি এখনো মোটর-চাপা পড়ি নাই। যদি কোনো দিন হাজরা রোডের মোড়ে মোটর-চাপা পড়ি, তবে তাহার সেদিনকার অবস্থায় আর আমার দুরবস্থায় বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না— গাড়ির তলা হইতে শরীরের ভগ্নাংশমাত্র দৃষ্ট হইবে। কৌতূহলী পথিকের দল জমিয়া গিয়া কত প্রকার মন্তব্য করিবে। কেহ বলিবে 'বাঙাল', কেহ বলিবে 'মাতাল', কিন্তু কেহই জানিতে পারিবে না লোকটা সাহিত্যিক ছিল ! সাহিত্যিকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নয়।

অল্প দিনের মধ্যেই সকলে কবি বলিয়া জানিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য, নিজের 'রয়টার'এর কাজ নিজেই করিতাম। এখন ঠিক তার উল্‌টা ; আধুনিক কবিতা চলিত হইবার পরে, আমি যে কবি তাহা সযত্নে গোপন করিতে চেষ্টা করি।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনার নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। কালিদাসবাবু বলিয়া আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহাকে দিয়া আমাদের কবিতা সংশোধন করাইয়া লইতাম। সংশোধন কথাটার অপপ্রয়োগ হইল। কারণ, কোনোক্রমে গোটা তিন-চার লাইন লিখিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই তিনি একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া দিতেন। সেটা যে আমার কবিতা নয়, কখনো সে সন্দেহ তিলমাত্র মনে উদিত হইত না।

তার পরে, কেমন করিয়া জানি না, রবীন্দ্রনাথের কানেও কথাটা পৌঁছিল যে, আমি কবিতা লিখি। তিনি আমার কবিতা দেখিতে চাহিলেন। সেদিনকার মনের ভাব আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে সেদিন ক্লাসে গেলাম না। অন্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমের সহিত আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি দুপুরবেলায় শালগাছের তলায় একটা উইটিপির পাশে বসিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলাম। উইটিপির পাশে কেন বসিয়াছিলাম তাহা ঠিক বলিতে পারি না; বোধ করি, তখন বাল্মীকি শব্দটার অর্থ নূতন শিখিয়াছি। রবীন্দ্রবন্দনা করিয়া একটা দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কয়েকটা ছত্র আমার এখনো মনে আছে :

সেই মহাগীতছন্দে সেই মহাতালে
তুমি গাহিয়াছ গান উষাসন্ধ্যাকালে—

শেষের ছত্রটা :

শুনো গুরুদেব, তব শিশুদের গীতি।

তার পরে সলজ্জভাবে কবিতাটি লইয়া গুরুদেবের সমীপে চলিলাম। তিনি শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকিতেন। তখন তিনি বৈকালিক জলযোগে বসিয়াছেন— সময়-নির্বাচনটা হয়তো একেবারে আকস্মিক ছিল না। কবিতাটি লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম; তিনি এক পলকে পড়িয়া লইয়া হাসিলেন। তার পরে এক প্লেট 'পুডিং' আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। পুডিং অতি উপাদেয় খাদ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু, হায়, আমি কি ইহার জন্যই আসিয়াছি? আমি কি ইহার জন্যই সর্পসংকুল বল্মীকস্তূপের পাশে বসিয়া দুপুর-রোদে ঘামিতে ঘামিতে কবিতা লিখিয়াছি!

পুডিং শেষ করিলাম। কিন্তু, কই, প্রশংসা তো করিলেন না। আমি উস্‌খুস

ঘরের বাহিরে গাছের তলায় ক্লাস বসিত

পৃ. ২

বীথিকাগৃহ। যেখানে জীবনের সতেরো বছর-কাল কাটিয়ে

পৃ. ১১

করিতেছি দেখিয়া আমাকে আরো রসপিপাসু মনে করিয়া এক প্লেট আনারস দিলেন। আনারস বীতরস ও পুডিং তিক্ত মনে হইল। আর বসিয়া থাকা অনর্থক মনে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; ততক্ষণ টেবিলের খাদ্যও শেষ হইয়া গিয়াছে। চলিয়া আসিবার আগে প্রণাম করিলাম, তিনি চুল ধরিয়া একটু টানিয়া দিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিলাম, কবিতাটার প্রশংসা কেন করিলেন না! কবিতাটা যে প্রশংসার যোগ্য হয় নাই, এই সহজতম সমাধান কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

হঠাৎ মনে হইল, ঠিক ঠিক, আমি কী নির্বোধ! এ কবিতায় যে তাঁহার প্রশংসা ছিল, তিনি কী করিয়া ইহাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করিবেন! তাই তো! তখনই ম্লানপ্রায় আকাশ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পৃথিবীতে কালোর কলিযুগ শেষ হইয়া আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইল। মনে হইল, তাঁহার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন প্রশংসার আভাসও যেন দেখিয়াছি। হায় রে, আমার বালকমনের অনভিজ্ঞতা! সে প্রচ্ছন্ন প্রশংসা যে পুডিং-প্রস্তুতকারক পাচকের উদ্দেশে, তখন কি তাহা বুঝিয়াছি!

নীচে নামিয়া দেখি ফলাফল জানিবার জন্য অন্য ছেলেরা জুটিয়া গিয়াছে। সকলে সমস্বরে শুধাইল, "কী বলিলেন? কী বলিলেন?" এ প্রশ্নের জন্য তো প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু, ভাষাজ্ঞান থাকিতে অপ্রস্তুতই বা হইব কেন? তিনি যাহা বলেন নাই, কোনো কবিকে যাহা কখনো বলিবেন না, সেই-সব প্রশংসা-বাক্য শুনাইয়া দিলাম। শেষে অবান্তরভাবে বলিলাম পুডিং ও আনারসের কথা। আমার বন্ধুদের দেখিলাম প্রশংসার চেয়ে পুডিং ও আনারস সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি। বেরসিকের দল! মনে মনে স্থির করিলাম, এ লোকের সম্বন্ধে প্রশংসামূলক কবিতা আর কখনো লেখা হইবে না। সে প্রতিজ্ঞা আমি এ পর্যন্ত পালন করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার তিরোভাবের পরে সমস্ত বাঙালি কবি যখন কবিতায় শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, আমিই বোধ হয় একমাত্র কবি যে কোনো কবিতা লেখে নাই। আমি নিশ্চয় জানি, এজন্য তিনি স্বর্গ হইতে আমাকে অজস্র আশীর্বাদ করিয়াছেন।

তার পরে বড়ো হইলাম; বড়োদের সাহিত্যসভায় স্থান পাইলাম এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রসাদে দেশী মাল ছাড়িয়া বিদেশী চোরাই মাল আমদানি করিয়া গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পড়িতে শুরু করিলাম। প্রত্যেকটি

রচনাতেই যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিতেছে, এই ধারণা ক্রমে ক্রমে মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে সভায় আমন্ত্রণ করিতাম এবং তিনিও আগ্রহসহকারে সভাপতিরূপে যোগ দিতেন। সেদিন সভায় তিল-ধারণের স্থান থাকিত না। যে-সব লেখকের সাহস অল্প এবং কাণ্ডজ্ঞান বেশি, তাহারা সেদিন সভায় রচনা পড়িত না, কিন্তু আমি অকুতোভয়। আমার দুঃসাহস যেমন বেশি ছিল পিঠের চামড়াও তেমনি পুরু ছিল, অবিকম্পিত কণ্ঠে গল্প কবিতা যেদিন যাহা জুটিত পড়িয়া দিতাম। রবীন্দ্রনাথের ধৈর্য হৈমালয়িক; তিনি নীরবে সমস্ত শুনিতেন এবং শেষে সমালোচনা করিতেন। কী মারই না খাইয়াছি। কঠোর সমালোচনা দ্বারা আমার যুগান্তকারী রচনাগুলিকে তিনি তছনছ করিয়া দিতেন। সেরূপ ভর্ৎসনা একবার শুনিলে বাংলাদেশে এমন লেখক অল্পই আছেন যাঁহারা বৈতরণীর স্রোতে কলম ভাসাইয়া সাহিত্যিক-সন্ন্যাস না গ্রহণ করিবেন। আমি ক্ষতবিক্ষতপৃষ্ঠে ঘরে ফিরিয়া আত্মপ্রশংসার প্রলেপ লাগাইতাম এবং এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পুনরায় নূতন যুগান্তকারী রচনা লইয়া সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতাম।

একদিনের ঘটনা আমার মনে আছে। সেবার একটা গল্প ফাঁদিয়াছিলাম। সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, গল্পটা এমনভাবে আরম্ভ হইয়াছে, যেন অনেক আড়ম্বর করিয়া রেলে চড়িয়া বোম্বাইযাত্রার মতো; কিন্তু অকালে অকস্মাৎ শ্রীরামপুরে আসিয়া রেল-কলিসন ঘটিয়া সব শেষ হইয়া গেল। মনে ভাবিলাম, কিছুই তাঁহার ভালো লাগিবে না। সেদিনের পুডিং ও আনারসের কথা মনে পড়িয়া যাইত। সেদিন তবু সান্ত্বনার জন্য বাস্তব রস ছিল, আর আজ ছোটোবড়ো সকলের সম্মুখে এমন মার! এখন বুঝিতেছি, এই-সব নিদারুণ আঘাতে আমাদের সাহিত্যিক রুচি তৈরি হইয়া গিয়াছিল। প্রথম রচনা লিখিয়াই 'বাহবা, বেশ হইয়াছে' শুনিবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হয় তাহারা বড়োলোকের আদুরে দুলালের মতো, প্রথম যথার্থ আঘাতেই একান্ত অসহায় অনুভব করে। এখন যখন পাঠকেরা আমার লেখা সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করে তাহারা হয়তো ভাবে, লোকটা এইবার লেখা ছাড়িয়া দিলে বাঁচা যায়। কিন্তু, আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবি, 'তোমাদের সমালোচনা তো শিখণ্ডীর বাণ, আমি স্বয়ং গাণ্ডীবীর বাণ সহ্য করিয়াছি এমন শক্ত আমার প্রাণ।'

অনুরূপ আর-একটি ঘটনা মনে আছে। তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন-পাস-করা বিশ্বভারতীর ছাত্র। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটি সাহিত্যসভা ছিল। সেবার অধিবেশন হইল উত্তরায়ণে, স্বয়ং গুরুদেবের উপস্থিতিতে। শ্রোতার সংখ্যা বেশি ছিল না; ডক্টর উইণ্টর্‌নিজ্‌ ও ডক্টর লেজ্‌নি উপস্থিত ছিলেন। পাঠ্য প্রবন্ধ একটিমাত্র, রবীন্দ্রনাথের উপরে কালিদাসের প্রভাব; লেখক আমি। মনে হইল, আমার বক্তব্য অকাট্য যুক্তি দ্বারা অচ্ছিদ্র করিয়া বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় বলিলেন, তাঁহার কবি-মন হাঁসের পাখার মতো, তাহাতে বাহিরের প্রভাব জলের মতো গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু, আমার অবস্থা অন্যরূপ, আমার কপাল বাহিয়া তখন ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছিল— সেটা মাঘ মাস। হায় হায়, ঘরে-পরে আর কোথাও আমার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না— ইউরোপ হইতে পণ্ডিতরা আসিয়া আমার দুরবস্থা দেখিয়া গেল!

সেদিনের পরে অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সেদিনকার প্রবন্ধের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার মত দৃঢ়তর হইয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উপরে যে দুখানি কাব্যের প্রভাব সব চেয়ে বেশি, সে দুখানি কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। উপনিষদের প্রভাবও তাঁহার উপরে এত বেশি নয়। ইহা আমার সুচিন্তিত দৃঢ়ভিত্তি অভিমত। এ বিষয়ে যে-কোনো লোকের সঙ্গে দীর্ঘকাল তর্ক চালাইতে আমি প্রস্তুত, কেবল যাঁহার সঙ্গে পারিতাম না তিনি আজ নাই।

সেই অল্প বয়সেই ইউরিপিডীস'এর মিডিয়া নাটকের একটা সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তখন গ্রীক সাহিত্যের অপর কোনো গ্রন্থ পড়ি নাই। রবীন্দ্রনাথ এমন ছেলেমানুষি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে উপদেশ ষোলো আনা মানিয়া চলিতে হইলে লেখাই ছাড়িয়া দিতে হয়। কথাটা সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু গতিনির্দেশ হিসাবে মনে থাকিয়া গিয়াছে।

তখনো ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি নাই। আশ্রমে বিদ্যুতের আলো আনিবার আয়োজন চলিতেছে; সেজন্য পথের ধারে গাছের ডালপালা কিছু কিছু কাটিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বনলক্ষ্মীকে এরূপভাবে অঙ্গহীন করা, তাহাও আবার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য, আমাদের মনে বড়ো আঘাত করিল। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার উপস্থিতিতে সভায় পড়িলাম। আমার অজ্ঞতা যে প্রশান্তসাগরিক অতলস্পর্শ, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি কি আমার

ছিল! যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি, তাঁহাকে প্রকৃতির প্রতি সজাগ করিবার আমার প্রগল্‌ভ প্রয়াস! যথোচিত তিরস্কারের কর্ণমর্দন পাইলাম।

আমার সাহিত্যের সঙ্গীদের মধ্যে দু-একজন ছাত্র সুন্দর লিখিত। একজনের নাম শ্রীসতীশ রায়। সতীশের মতো কবিতা লিখিব, ইহাই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহার মতো লিখিতে পারিতাম না বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতাম। সতীশ স্বেচ্ছায় সাহিত্যের দীপ নিবাইয়া না দিলে নিজের আলোকে বঙ্গসাহিত্য-মঞ্চ আলোকিত করিতে পারিত।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া যখন আমি বিশ্বভারতীর ছাত্ররূপে পুরাতন রঙ্গমঞ্চে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইলাম তখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাইবার সৌভাগ্য ঘটিল। আমি নাটক লিখি জানিয়া, আমাকে নাটক লিখিয়া আনিবার জন্য একটা গল্প বলিয়া দিলেন। আমি খুব দ্রুত লিখিতে পারিতাম, তিন-চার দিনের মধ্যে একখানা নাটক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া তিনি মুখে মুখে পরিবর্তন করিয়া দিলেন এবং খাতাখানা নিজের কাছে রাখিয়া দিয়া পুনরায় লিখিয়া আনিতে বলিলেন। পুনরায় লিখিয়া দেখাইলাম। আবার কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়া তৃতীয় বার লিখিতে বলিলেন। তৃতীয় বার লিখিয়া দেখাইলাম; এবারে স্বহস্তে কাটাকুটি আরম্ভ করিলেন। কাটিয়া পরিবর্তন করিয়া, স্বয়ং কিছু লিখিয়া একরূপ দাঁড় করাইলেন। নাটক-রচনা-শিক্ষার ইহাই আমার একমাত্র শিক্ষানবিশি। ইহাতে আমার চোখ খুলিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ কেন নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া অপরিণত লেখকের রচনা সংশোধন করিতেন? এজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো স্নেহের দাবি যে করিতে পারি তাহা নয়। আরো বহু লেখকের রচনা লইয়া এমন সংশোধন তিনি করিয়াছেন। আসল কথা, তাঁহার অতিপ্রচুর সাহিত্যিক শক্তির বিকাশের ইহাও অন্যতম পন্থা। এই তুচ্ছ কাজের দ্বারাও তিনি যেন নিজের শক্তিকে নূতনভাবে লাভ করিতেন। আমার পক্ষে এ সাহায্যের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, তাঁহার নিজের পক্ষেও প্রয়োজন ছিল। শিলাখণ্ড খুদিয়া ভাস্কর মূর্তি গড়ে, সে আবশ্যক কি কেবল শিলাখণ্ডেরই? আমি তাঁহার হাতে শিলাখণ্ডের মতো অবান্তর, আমার পরিবর্তে যে-কেহ হইলেই চলিত— আর আমিও তো একক ছিলাম না।

কিন্তু, এই উপলক্ষে আমার যে লাভ হইল, তাহা পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ।

এক-এক সময় মনে হইত, বোধ করি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আমার মধ্যে কোনো সাহিত্যিক সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছে। আবার পরমুহূর্তেই তাঁহার কথায় আশাপ্রদীপ নিবিয়া যাইত। এক দিনের কথা বলি। আশ্রমের একটি ইঁদারার ধারে একটি গাব গাছ আছে। একদিন তাঁহার সঙ্গে আমি সেখান দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ তিনি গাব গাছটির কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জানিস্, এক সময়ে এই গাছের চারাটিকে আমিই খুব যত্ন করে লাগিয়েছিলাম? আমার ধারণা ছিল, এটা অশোক গাছ। তার পরে যখন বড়ো হল দেখি, অশোক নয়, গাব গাছ।" তার পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোকেও অশোক গাছ বলে লাগিয়েছি, বোধ করি গাব গাছ!"

'বোধ করি' দ্বারা আর কেন ক্ষীণ আশা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা! আমি যে নিতান্তই সাহিত্যিক গাব গাছ। সাহিত্যের বামুনপাড়ায় আমার স্থান নাই, গ্রামান্তের অন্ত্যজদের মধ্যে আমার স্থিতি। ইতিমধ্যেই সমালোচক-কাকের দল আমার ফল চাখিয়া ধিক্কারের স্বরে কা-কা রবে ব্যর্থতা প্রচার করিতেছে। এ ফল সাহিত্যিক ভোজে লাগিবার নয়। কেবল সম্পাদক সুধীবরেরা মাসিকের জাল মাজিবার জন্য ব্যবহার করিবে; কেবল প্রকাশকেরা সংসারসিন্ধু পার হইবার জন্য নৌকা তৈরি করিয়া এই ফল রাশীকৃত পাড়িয়া লইয়া নৌকায় রঙ করিবে। আর-দু-চারজন অনভিজ্ঞ পাঠক ফলের রঙে আকৃষ্ট হইয়া গলাধঃকরণ করিতে গিয়া গলায় বাধাইয়া ফেলিবে। এবং সেই সংকটের মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করিবে, এ ফল আর খাওয়া নয়। ফল নামিয়া গেলেই আবার গাবতলায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি যে গাব গাছ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, ঋষি-কবির দৃষ্টি মিথ্যা হইবার নয়। কিন্তু, গাব গাছ কি কেবল একটি? সমস্ত বাগানই যে গাব গাছে ভরিয়া গেল।

রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল তিরস্কারই পাইয়াছি এমন মনে করিবার কারণ নাই। কখনো কখনো প্রশংসাও করিয়াছেন; সে প্রশংসা ব্যক্তিগত স্নেহের দ্বারা অতিরঞ্জিত, বিপ্রলক্ষণের উদারতার দ্বারা স্ফীত, কাজেই সে-সব প্রকাশযোগ্য নয়। কিন্তু, একবার একটি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কোনো পত্রিকায় আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, কী কারণে জানি না সেটা তাঁহার ভালো লাগিয়া গেল। আমি উত্তরায়ণে দেখা করিতে গেলে কবিতাটার প্রশংসা করিলেন। উত্তরায়ণ হইতে আশ্রমে

ফিরিবার পথে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তিনিই বলিলেন, কবিতাটি বড়ো ভালো হইয়াছে। ইনি বলিলেন, উনি বলিলেন, তিনি বলিলেন; অমুক বলিল, তমুক বলিল, সমুক বলিল, আহা, কবিতাটি বড়ো উপাদেয়! কী করিয়া যেন তড়িৎ-বেগে বিনা-তারে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, কবিতাটি গুরুদেবের ভালো লাগিয়াছে। ইহার আগে কেহ কখনো আমার কবিতার প্রশংসা করে নাই। তাহাদের বড়ো দোষ দেওয়া যায় না। সাহিত্যসভায় তিরস্কারের তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত ফরমায়েশ করিতেন। তখন পূজার ছুটি, ছেলেরা বাড়ি গিয়াছে, আমরা অল্প কয়েকজন আশ্রমে আছি। সেদিন রাত্রে কোজাগরী পূর্ণিমা। বিকাল বেলা আমাকে বলিলেন, "আজ রাত্রে কোজাগরী উৎসব হবে। একটা কবিতা লিখে আন্।"

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পছন্দসই কবিতা লিখিয়া ফেলা সহজ কাজ নয়; কিন্তু, কাজটিকে আরো দুরূহ করিবার জন্যই যেন বলিয়া দিলেন, কবিতার প্রধান মিলগুলি যেন 'লক্ষ্মী' শব্দের সঙ্গে মেলে। কাজের দুরূহতা কাজ শেষ হইয়া গেলে তবেই মানুষ বুঝিতে পারে, এখন সেই ফরমায়েশ চিন্তা করিতেও ত্রাস উপস্থিত হয়, কিন্তু তখন সত্যই অনুরূপ একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার পছন্দও হইয়া গেল। সেদিনকার তারা-নেবা কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় উত্তরায়ণের ছাদে যে ক্ষুদ্র উৎসবসভাটি বসিয়াছিল তাহাতে গান হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা পড়িলেন, আমার কবিতাটিও পঠিত হইল। কবিতাটির দুটি ছত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব:

ঘুমাক সকলে, আমরা কজনই
উত্তরায়ণে জাগিব রজনী—

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পরে শেলি ও কীট্‌সের কবিতার ইন্দ্রজালে বন্দী হইলাম। শেলির কাব্যের চিরচঞ্চল, নিরুদ্দেশগতি, রঙের-তুফান-লাগা, অস্থিরসীমানা, অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয় মেঘলোকে যেন বিলীন হইয়া গেলাম। আবার, কীট্‌সের কাব্যের পুষ্পঘন, তমসুরভিত, লুপ্তপন্থা, অজস্র-উদ্ভিদ্, কোকিলাকুল, ইন্দ্রিয়-আতুর অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। 'এন্ডি-মিয়ন'-এর সুন্দরবনে অনেকক্ষণ যে পথ হারাইয়া গিয়াছে, সম্মুখেও যে পথ নাই, সে হুঁশ কি ছিল! আর, পথের কী প্রয়োজন? বাহির হইবার জন্য?

এমন মনোরম বনভূমি ছাড়িয়া কে বাহির হইতে চায়? ইহার শাখায় শাখায় ফুলের কী অভাবিত বিকাশ, ইহার নীড়ে নীড়ে বিহঙ্গের কী উল্লাস, পদ্মসনাথ সরসীতে অপ্সরীদের কী বিহার, মসৃণ পল্লবের পিচ্ছিল চিক্কণে জ্যোৎস্নার কী তির্যক পদস্খলন, বনভূমির বহুল সৌগন্ধ্য যেন স্পর্শযোগ্য! অপরূপসুন্দর বনভূমি ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় কে বাহির হইয়া আসে? কিন্তু, সব চেয়ে ভালো লাগিল কীট্‌সের নাইটিঙ্গেলের প্রতি কবিতা। কাব্যসংসারে ইহাই আমার প্রিয়তম কবিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটি আমার মনের উপরে যেন সোনার কাঠি ছোঁয়াইল; আজিও তাহার কাজ শেষ হয় নাই। শেলির মেঘলোকে আজ আর প্রতিষ্ঠা পাই না, কিন্তু কীট্‌সের বনভূমি পদতলে তেমনি অচল।

অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, সাহিত্যগুরুর আশ্রম হইতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কেন হয় নাই, বিশেষ সেখানকার ছাত্রদের মধ্য হইতে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, তবু চেষ্টা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলাদেশ হইতেই খুব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছে কি? বাংলাদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের শতকরা কয়জন ছাত্ররূপে গত চল্লিশ বৎসরে শান্তিনিকেতন গিয়াছে? এক-একজন যুগাবতার সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা যুগের সমস্ত সাহিত্যিক সম্ভাবনাকে নিঃশেষে পান করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া যান— দুর্বলদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। রবীন্দ্র-বনস্পতি বাংলাদেশের চিত্তের সমস্ত রস শুষিয়া পুষ্পে পল্লবে ফলে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এই বনস্পতির তলদেশে যে-সমস্ত দুর্ভাগ্য সম্ভাবিত বনস্পতির জন্ম তাহাদের প্রাণরসের আর প্রত্যাশা কোথায়? বর্তমান বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিকই হইলে-হইতে-পারিত বনস্পতি। এ দেশের চিত্তভূমিতে প্রাণের খোরাক স্বল্প, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন মিটাইতেই তাহা নিঃশেষ; অন্যরা মরুবাসীর তৃষ্ণা বহিয়া বেঁটে আগাছা হইয়া সাহিত্যিক-জন্ম শেষ করিতে বাধ্য। তবে দু-একটি বুদ্ধিমান পরগাছা ও লতা এই মহাবনস্পতিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বাকাশে শাখাবাহু প্রক্ষেপ করিয়া দেবলোকের উদ্দেশে তুড়ি মারিতেছে বটে। দেবতাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, বনস্পতির অসীম ধৈর্য, মাঝে হইতে কোনো কোনো পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটিতেছে।

বাংলাদেশের পক্ষে যদি ইহা সত্য হয়, তবে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিকদের পক্ষে ইহা তিনগুণ সত্য। বাঙালি জাতির একজন হিসাবে, বাঙালি সাহিত্যিক

হিসাবে, শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাহাদের উপরে ত্রিগুণিত; এত নিবিড় প্রভাব কাটাইয়া স্বকীয়তার ভাবলোকে উপস্থিত হইতে হইলে চরিত্রের যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন, বাঙালীদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। শান্তিনিকেতন হইতে কখনো কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হইবে না, এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী দুঃসাহসিক; তবে বিনা সাহসেও অনায়াসে বলা চলে যে, রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের উদ্ভব যদি কঠিন হয় তবে শান্তিনিকেতন হইতে তাহার উদ্ভব কঠিনতর।

পত্রিকাপ্রকাশ

আশ্রমে ছেলেদের অনেকগুলি হাতে-লেখা পত্রিকা ছিল। তাহারা নিজেরাই লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক; ছবিও নিজেরাই আঁকিত। মাসের প্রথমে বাহির হইত। বড়ো ছেলেদের কাগজ ছিল 'শান্তি', ইহার প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত;

এসো, শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা
নিশাচর পিশাচের রক্ত দীপশিখা
করিয়া লজ্জিত।

বড়োদের আর-একখানি পত্রিকা ছিল 'বীথিকা'। বীথিকাগৃহের ছেলেরা ইহা প্রকাশ করিত। মাঝারি ছেলেদের দুখানা কাগজ ছিল, 'প্রভাত' ও 'বাগান'। ছোটো ছেলেদের কোনো কাগজ ছিল না, কয়েকজন উৎসাহী সঙ্গী জুটাইয়া 'শিশু' বলিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া ফেলিলাম।

পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইলে ঘরে ঘরে পড়িবার জন্য দেওয়া হইত, আর শেষের দিকে লাইব্রেরিতে রাখিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এই-সব কাগজে অধ্যাপকদের রচনা আদায় করিয়া প্রকাশ করিতাম; আর রবীন্দ্রনাথের লেখার 'কপিরাইট' তো আমাদের কাছে ছিল না, কাজেই যেটা খুশি প্রকাশিত হইত। এই-সব কাগজ লইয়া ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, কোন্ কাগজ ভালো হয়। কিন্তু, বড়োদের কাগজের সঙ্গে পারিব কেন?

তার পরে এক সময়ে দৈনিক কাগজ বাহির করিবার হুজুক পড়িয়া গেল। একখানা লম্বা কাগজে নিজেদের মন্তব্য লিখিয়া আশ্রমে প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া দেওয়া হইত, সকলে পড়িত। ইহাতে সাহিত্যের চেয়ে সাংবাদিকতার আয়োজন বেশি ছিল। আশ্রমের দৈনন্দিন খবর ও তাহার সমালোচনা লিখিত হইত।

সর্বভীতিকর কাপ্তেনদের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য অনেক সময় থাকিত। যে সংখ্যায় 'সিডিশন' কিছু তীব্র হইত তাহাতে কাহারো নাম থাকিত না। কিন্তু, গুপ্তসংবাদ রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা কাপ্তেনগোষ্ঠীর ছিল; আসামী প্রায়ই অনাবিষ্কৃত থাকিত না, মাঝে মাঝে দণ্ডও পাইতে হইত। কিন্তু কাপ্তেন-দেরও এই-সব সমালোচনাকে ভয় করিয়া চলিতে হইত।

প্রথম ছাপার অক্ষরে কবে আমার লেখা বাহির হয় তাহা মনে নাই। বোধ করি 'মুকুল' নামে বালকদের কাগজে ধাঁধার উত্তরে নামটা প্রকাশিত হইয়াছিল। কাগজ আসিলে নামটার তলায় দাগ দিয়া রাখিলাম, এবং সকলের যাহাতে নজরে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিলাম। বহু দর্শকের ঘাঁটাঘাঁটিতে কাগজখানা ছিঁড়িবার উপক্রম হইলে কাঁচি দিয়া নামটা কাটিয়া পুস্তকের মলাটে লাগাইয়া রাখিলাম। সেই অল্প বয়সেই নিজের নাম রক্ষা করিবার দিকে দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু, ইহা তো কেবল নামমাত্র, রচনা নয়। অবশ্য, এখন বুঝিয়াছি, রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ ঐ সব-শেষের ছত্রটি। এই ছত্রটিকে বহন করিয়া আমার রচনা কলিকাতার ছাপা কাগজের উদ্দেশে নিয়মিত প্রেরিত হইত। কিন্তু হায়, সম্পাদকগোষ্ঠীর কী কঠিন প্রাণ! ছোট্ট একটি কবিতা প্রকাশ করিলে তাঁহাদের ক্ষতি হইত না, আর আধিব্যাধিজরাপরিপূর্ণ সংসারে বসিয়া একটি বালকের স্বর্গের আনন্দ লাভ ঘটিত। দেখিতাম, পাতার তলাতে অনেকটা করিয়া ফাঁক থাকিয়া যায়—সেখানে আমার কবিতাটি প্রকাশ করিলে তোমাদের তো কাগজ বেশি লাগিত না। ইতিমধ্যে সতীশের একটা কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইল। আমারই বা হইবে না কেন? আমি প্রত্যেক ডাকে প্রবাসীর ব্যূহ লক্ষ্য করিয়া কাব্যবাণ-নিক্ষেপ শুরু করিলাম। কিন্তু, রামানন্দবাবু হইতে হীনতম বেয়ারাটা পর্যন্ত কেহ বিচলিত হইবার লক্ষণ দেখাইল না। এ দিকে সতীশের কবিতা প্রকাশিত হওয়াতে তাহার খ্যাতি যেমন বাড়িল আমার খ্যাতি তেমনি পড়িয়া গেল। মান-অপমান সবই তো তুলনামূলক! তখন সম্পাদকদের নির্মম মনে হইত, এখন বুঝিতেছি সমবেদনায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ। একবার গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তোমার ধোপার হিসাবসুদ্ধ তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

ক্রমে কলিকাতার সম্পাদকদের ভরসা পরিত্যাগ করিয়া দূর মফস্বলের

কাগজে লেখা পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম এবং হঠাৎ একবার মফস্বলীর কোনো সম্পাদকের অনবধানতার সুযোগে আমার লেখা প্রকাশিত হইয়া গেল। যেদিন ডাকে আমার নামে পত্রিকাখানা আসিল, সেদিন আমার জীবন-ক্যালেণ্ডারে লাল-চিহ্নিত তারিখ। কাগজখানা লইয়া নিভৃত স্থানে গিয়া বসিলাম। দুর্ভিক্ষের আহারের মতো এক নিশ্বাসে লেখাটি পড়িলাম। একবার দুইবার করিয়া একশোবার পড়িলাম। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িলাম আবার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অবধি পড়িলাম; তার পর স্তবকে স্তবকে পড়িলাম! রচনাটি যে শুধু মুখস্থ হইয়া গেল তাহা নয়, কোন্ লাইনে কোন্ শব্দটি আছে, কোন্ শব্দটির কী চেহারা সব চোখস্থ হইয়া গেল। আর শেষতম ছত্রটিতে আমার নামটি, আহা সে কী নয়নভুলানো মূর্তি! দেখিয়া আর তৃপ্তি হয় না। আমি নির্বাক্ হইয়া সেই নিভৃত স্থানে বৈঁচিগাছের পাশে নামটির দিকে নিস্পন্দনেত্রে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম! বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময়ও কি ছাপা অক্ষর ছিল? নতুবা ও পদটির তো কোনো সার্থকতা দেখি না: জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল! ইহাই আমার ছাপার অক্ষরে রচনা প্রকাশের আদিম অভিজ্ঞতা।

কিন্তু, একাকী বসিয়া দেখিলে তো চলিবে না, অনেক কৃত্য এখনো বাকি। সতীশের ভক্তদের দলের মধ্যে কাগজখানা সগৌরবে নিক্ষেপ করিলাম। ইন্দ্রও বোধ করি এমন অসংশয়িতচিত্তে দধীচির হাড়-পিটিয়া-গড়া বজ্র নিক্ষেপ করেন নাই। দ্বিতীয়বার যখন সেই কাগজে রচনা পাঠাইলাম রচনা ফিরিয়া আসিল, সংক্ষিপ্ত হেতুবাদের উল্লেখ ছিল— কাগজ উঠিয়া গিয়াছে। দেখিলাম, দধীচির উপমাটা নিরর্থক হয় নাই। আমার প্রথম রচনা লইয়া কাগজের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কি দধীচির আত্মত্যাগের চেয়ে কম? যাই হোক, সম্পাদকের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল না; মনে মনে তাঁহার সদ্‌গতি প্রার্থনা করিলাম। আশা করি, এই সুকৃতির জোরে ভূতপূর্ব-সম্পাদক মফস্বল আদালতের পেশকার হইয়া দুর্লভ নরজন্ম সার্থক করিতেছেন।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা স্থাপিত হইল। এ যেন ঠিক বাড়ির পাশেই স্বর্গের সিঁড়ি-প্রতিষ্ঠা। এমন সুযোগ কোন্ সাহিত্যিক না গ্রহণ করিবে! বিভূতি গুপ্ত ও আমি মিলিয়া একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়া ফেলিলাম। নাম 'বুধবার'। বুধবার ছুটির দিন, সেইদিন কাগজখানা বাহির হইত।

একখানা ফুলস্কেপের দুই পৃষ্ঠা ছাপা, মূল্য দুই পয়সা। এখন বিক্রয়ের উপায় কী? আশ্রমে কিছু বিক্রয় হইত। কিন্তু তাহাতে কাগজের ভবিষ্যৎ তো উজ্জ্বল হইবার কথা নয়। শিশুবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিল অমূল্য। সে এক কালে আমার সহপাঠী ছিল। ম্যানেজার হিসাবে তাহার নাম ছাপিয়া দিলাম; সে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শিশুবিভাগের ছেলেদের পক্ষে কাগজ কেনা বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রচার করিল। সে বলিল, বুধবারে ছেলেরা বাড়িতে চিঠি লেখে; চিঠির সঙ্গে কাগজখানা বাড়িতে পাঠাইবে, অভিভাবকেরা আশ্রমের সংবাদ পাইবেন। ইহাতে আমাদের আয় বাড়িল। কিন্তু আশাতরু কেবল অঙ্কুরিত হইয়াছে, এখনো যে ফল ধরা বাকি। স্থির করিলাম, বোলপুর স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে কাগজ বেচিতে হইবে। অন্য কাগজ স্টেশনে বিক্রীত হয়, আমাদেরই বা কেন না হইবে? লোক ঠিক করিয়া কাগজ স্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া আশা-আশঙ্কায় দোল খাইতে লাগিলাম; ম্যানেজার তো একটা নূতন থলিই কিনিয়া ফেলিল। সন্ধ্যাবেলায় 'হকার' ফিরিয়া আসিল; দূর হইতে দেখিলাম, তাহার হাতে একখানাও কাগজ নাই। ম্যানেজার ততক্ষণে মানসাঙ্কে কত টাকা পাওয়া যাইবে কষিয়া দেখিয়াছে।

"কী হল রে?"

শশী হকার বলিল, "আজ্ঞে, একখানাও কেউ নিলে না।"

"বলিস কী রে!"

"কাগজগুলো কই?"

শশী হকার বসিয়া পড়িল। বেচারার দোষ নাই। সারাদিন গাড়ির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া সে একবারে ক্লান্ত। গলাও ভাঙা দেখিতেছি, খুব 'হক' করিয়াছে। ওর দোষ নাই, লুপ-লাইনের যাত্রীরাই বেরসিক।

ম্যানেজার শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কাগজ কই?"

শশী বলিল, "আজ্ঞে, সারাদিন খাওয়া হয় নি, সন্ধ্যাবেলা ওগুলো এক মুড়ি-ওলাকে দিয়ে মুড়ি খেয়েছি।"

ম্যানেজার বলিল, "মুড়ি খেলি কেন?"

শশী ভুল বুঝিয়া বলিল, "আজ্ঞে, প্রথমে মিঠাইওলাকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নিল না। মুড়িওলা ঠোঙা করবে বলে নিল।"

আমি অমূল্যকে থামাইয়া দিলাম। বাজারে আমাদের কাগজ সম্বন্ধে যে

আলোচনা হইয়াছে তাহা রুচিকর হইবে না।

শশী হুকার বুঝিল, বাবুদের মনের অবস্থা যে কারণেই হোক সদয় নয়; সে সরিয়া পড়িল। ম্যানেজারের নূতন-কেনা থলিটা ক্ষুধিত সাপের মতো টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল! বিভূতি গুপ্তের হঠাৎ প্রকৃতিপ্রীতি বাড়িয়া যাওয়াতে শাল গাছটার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। আমি কিন্তু এক নূতন শিক্ষা পাইলাম। যাঁহারা বলেন সাহিত্য মানুষের কোনো কাজে আসে না, তাঁহারা অবহিত হইতে পারেন। এই-যে ক্ষুধিত লোকটা মুড়ি খাইল, সে কি সাহিত্যের জন্য নয়? অবশ্য, মিঠাই পাইলে আরো ভালো হইত, কিন্তু জগতে মনের মতো কয়টা জিনিস হয়? সাহিত্য যে ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর করিতে একেবারে অসমর্থ নয়, সেই অমূল্য শিক্ষা আমি এই উপলক্ষে পাইলাম।

যাই হোক, বুধবার কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে আশার পাত্রে টোল পড়িল, কিন্তু একেবারে ভাঙিল না। যে ঘটনায় আশার কলস চারখানা হইয়া গেল, এবং লোকে সেই কলসীর কানা লইয়া সম্পাদকদের তাড়া করিল, তাহা কিছুকাল পরে ঘটিয়াছিল।

৭ই পৌষের উৎসবে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে পাঁচ-সাতশত লোক আশ্রমে যাইত। সকালবেলা গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনার সঙ্গে অনেকগুলি গান হয়। আমরা স্থির করিলাম, এই গানগুলি বুধবারের উৎসব-সংখ্যায় ছাপাইয়া দেওয়া যাক। দিনুবাবুর কাছ হইতে গানগুলি সংগ্রহ করিয়া বিপুলায়তন সংখ্যায় ছাপিয়া ফেলিলাম; একেবারে দুই হাজার ছাপা হইল। লোকে কিনিবে, আবার দু-এক কপি বন্ধুবান্ধবদের জন্যও কোন্ না লইয়া যাইবে! এবারে আর আশাভঙ্গের ভয় নাই, বাঁধা গ্রাহক। এ লুপ-লাইনের বেরসিক যাত্রী নয়, একেবারে কলিকাতার সমজদার ক্রেতা। সকালবেলাতেই সব কাগজ বিক্রি হইয়া গেল; ম্যানেজারের বহুকালের উপবাসী থলি ব্যাঙ-খাওয়া সাপের মতো স্ফীতোদর হইয়া টেবিলের উপর বিরাজ করিতে লাগিল।

যথাকালে মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হইল। একটার পরে একটা গান হইতেছে, কিন্তু এ যে সব নূতন গান! সকলে খস্ খস্ শব্দে পাতা ওলটায়, কিন্তু গান মেলে কই? সকলে আড়চোখে সম্পাদকের দিকে তাকাইতে লাগিল। ব্যাপার কী? দিনুবাবুর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ যে নূতন গান!" দিনুবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "রবিদা কাল সন্ধ্যাবেলা সব গান বদলে

দিয়েছেন।" সর্বনাশ! তখন গুরুদেব বক্তৃতায় যে প্রেমের কথা বলিতেছিলেন, বুঝিলাম, আমাদের রক্ষা করিবার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট নয়। তখন দুই সম্পাদক ও এক ম্যানেজার তিনজনে উপাসনামন্দির ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলাম। শ্রোতারা ক্ষণকালের জন্য আচার্যের দিক হইতে পলায়নপর আমাদের দিকে তাকাইল। তাহাদের চোখে মুখে যে ভাব ঝলকিয়া উঠিল তাহা আর যাই হোক প্রেম বা করুণা নয়। তাহারা নিশ্চিত বুঝিল, প্রতারকেরা তাহাদের জানিয়া শুনিয়া ঠকাইয়াছে। দু-চার আনা মিছে গেল বলিয়া তাহাদের দুঃখ ছিল না; কলিকাতার লোক হইয়া যে মেঠো ঠগের কাছে মাথা হেঁট করিতে হইল, ইহাতেই তাহারা বোধ করি অগৌরব অনুভব করিতেছিল। উপাসনা শেষ হইলে সেই নিগৃহীত উপাসকের দল প্রতারক তিনজনকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু, আমাদের খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। আমরা ঘর বন্ধ করিয়া লেপ মুড়িশুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। সম্পাদকদের মুখ উদ্‌বেগে কালো, কিন্তু ম্যানেজারের মুখের ভাব অন্যরূপ। তাহার গোলগাল চেহারা আর বুকের উপরে সেই মোটা কালো থলি যেন, আহা, মৃগশিশুটিকে কোলে করিয়া স্বয়ং পূর্ণিমার চাঁদ সমুদ্রের উত্থিত তরঙ্গবাহুর দিকে করুণ ধিক্‌কারে তাকাইয়া রহিয়াছে— প্রতারিত ভক্তদের অন্বেষণকোলাহল জোয়ারের গর্জনের মতোই শ্রুত হইতেছিল বটে।

ইহার পরে 'বুধবার' আর বেশিদিন চলিল না; যাইবার সময়ে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কিছু দেনা রাখিয়া গেল। অনুরূপ পরিণাম আশঙ্কা করিয়া প্রেসের ম্যানেজারকে আমরা পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিলাম। কাজেই সে দেনা আর তেমন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল না।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কয়টি নূতন গান বুধবারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কারণে রবীন্দ্ররচনান্বেষীদের এক সময়ে ইহা প্রয়োজন হইবে। তাঁহাদের গবেষণার প্রশ্রয়ের পথ রাখি নাই; এ কাগজ এখন সম্পূর্ণরূপে দুর্লভ।

আশ্রমে ছাপাখানা স্থাপিত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ 'শান্তিনিকেতন' নামে একখানা কাগজ বাহির করিলেন। ইহা প্রধানত প্রাক্তন ও অধুনাতনদের মধ্যে যোগ রাখিবার জন্যই প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহাতে গুরুদেবের মন্দিরের উপদেশ ও আশ্রমসংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। তার পরে ক্রমে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন জগদানন্দবাবু, তার

পর শাস্ত্রীমহাশয় ; ক্রমে সন্তোষ মজুমদার, বিভূতি গুপ্ত হইয়া কাগজের ভার আমার উপরে পড়িল। কিন্তু, তখন নিজের নাম ছাপা দেখিবার মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। আমার হাতে কাগজখানা তিন বছর ছিল, তাহার পরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

আমার সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ করিয়া যেটুকু স্থান থাকিত, সব সময়ে খুব যে অল্প থাকিত তা নয়, তা নিজের রচনা দিয়া ভরিয়া দিতাম। গবেষণামূলক রচনা বাহির হইতেছে না বলিয়া হাহুতাশ করিবার মতো আমার মনের ভাব ছিল না। যে সংখ্যায় গুরুদেবের লেখা পাওয়া যাইত না (এমন খুব বেশি নয়) আগাগোড়াই আমি লিখিতাম। কর্তৃপক্ষ আর কী করিবেন! দেখিতেন, তাঁহাদের চেষ্টায় ও ব্যয়ে মুদ্রিত কাগজ অপর একজনের রসোদ্‌বেগ-প্রকাশের বাহন হইয়া দাঁড়াইল।

অভিনয়প্রসঙ্গ

অভিনয়ে আমার হাতেখড়ি কবে হইল তাই ভাবিতেছি। বাল্যকালে আমি মুখচোরা ছিলাম, রঙ্গমঞ্চে আনিয়া কে আমাকে মুখর করিয়া তুলিল! অনেক সময়ে দেখা যায়, স্বভাবত যাহারা লাজুক অভিনয়ে তাহারা রস পায়, কারণ ভূমিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তাহারা মুখর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়।

আশ্রমে গোড়া হইতেই অভিনয়ের একটি আবহাওয়া ছিল। ছাত্রদের শক্তির উদ্‌বোধনের অন্যতম উপায় ছিল নাটকাভিনয়। ছুটির পূর্বে তুইবার তো আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনয় হইতই, তাহা ছাড়া উৎসব ও সভা উপলক্ষে অভিনয় অবিরল ছিল। এ-সব ছাড়াও ছেলেরা নিজেদের ঘরে সন্ধ্যাবেলায় বিছানার-চাদর-জোড়া-দেওয়া পর্দা টাঙাইয়া অভিনয় করিত! রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক হইতে যে-কোনো নাটক লইত, কিংবা নিজেরাই কিছু দাঁড় করাইয়া ফেলিত।

আমাদের ছোটোদের মধ্যে এইরকম একটি দল ছিল, দলপতির নাম শৈলেন। সে একটা গল্প খাড়া করিত যার মধ্যে একটা রাজা থাকিবেই। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি ছিল না ; কিন্তু, সে যখন প্রত্যেকবার রাজা সাজিত, আমরা আপত্তি না করিয়া পারিতাম না— "একবার আমাদের সাজিতে দাও।" কিন্তু এ বিষয়ে সে অটল। তাহাকে বড়ো দোষ দেওয়াও যায় না ; যে যুক্তির বলে

সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিংহাসন দাবি করিত সে একটি জীর্ণ জরির পাগড়ি। এটি সে বাড়ি হইতে আনিয়াছিল। আমাদের তেমন পাগড়ি কোথায়? যে লোক কবচ-কুণ্ডল-কিরীট-সহ জন্মিয়াছে তাহার অধিকার অস্বীকার করা সহজ নয়। কিন্তু, যুগ যে খারাপ, অবশেষে একদিন আমরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। সে যেমন রাজা সাজিয়া প্রবেশ করিল, আমরা অভিনেতারা সকলেই যথাসাধ্য রাজবেশ পরিয়া রাজা সাজিয়া প্রবেশ করিলাম; রঙ্গমঞ্চ রাজায় রাজায় ভরিয়া গেল, উচ্চনীচ আর রহিল না। শৈলেন ইহার জন্য প্রস্তুত না থাকিলেও হঠিবার পাত্র ছিল না; সে একাকী বাঁখারির তলোয়ার দিয়া হঠাৎ-রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তার পরে চাদর ছিঁড়িয়া, চৌকি ভাঙিয়া, বাতি গুঁড়াইয়া এই বহুরাজক অরাজকতার পরিসমাপ্তি ঘটিল। যতদূর মনে পড়ে ইহাই আমার প্রথম অভিনয়।

কিন্তু এ তো কেবল ঘরের ব্যাপার, যে অভিনয়ে আমরা আশ্রমের সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলাম ও খ্যাতিলাভ করিলাম তাহা রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নামে নাটকখানির অভিনয়-উপলক্ষে। বোধ করি সন্তোষবাবু আমাদের অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। অভিনেতা হিসাবে আমরা সকলেই নবাগত ছিলাম; কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভূমিকাগুলি প্রত্যেকের সঙ্গে নিপুণভাবে খাপ খাইয়া গেল। এই সূত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে যে দলটি আমাদের গড়িয়া উঠিল তাহা সহজে ভাঙিল না। ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করা পর্যন্ত আমরা প্রায় সকলেই একত্র ছিলাম, বহুবার আমরা বহু অভিনয় করিয়াছি, শুধু বাংলা নয়, সংস্কৃতও। যে নেপালবাবু আমার মধ্যে কোনোদিন প্রশংসার কিছু দেখিতে পান নাই সেই নেপালবাবু অবধি আমার ইশা খাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে যখনই 'মুকুট' অভিনয় হইয়াছে নেপালবাবু বলিতেন, "কিন্তু, তেমন ইশা খাঁ আর হল না!" সেই বালক-অভিনেতাদের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি—

অমরমাণিক্য : অলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রমাণিক্য : সর্বেশ মজুমদার

ইন্দ্রমাণিক্য : শরদিন্দু নন্দী

রাজধর : প্রকাশ দত্ত

ধুরন্ধর : গোপাল ভট্টাচার্য

ইশা খাঁ : লেখক

সর্বেশের ডাক-নাম ছিল সবি; সে সন্তোষবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এই রচনার প্রারম্ভে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার অল্প কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

ছুটির দু-চার দিন আগে হইতে নাট্যঘরে স্টেজ বাঁধিবার ধুম পড়িয়া যাইত। দেবদারুপাতা ভাঙিয়া আনিয়া উইংস্ সাজানো হইত; স্টেজের মধ্যে বেতসিনী নদীর তীরভূমি মাটি দিয়া উঁচু করিয়া গড়িয়া তাহার উপরে ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দেওয়া হইত; পটভূমিতে বা একটা আস্ত বটের ডাল পুঁতিয়া বটগাছ সৃষ্টি হইত; এ-সব বড়ো ছেলেরাই করিত, আমরা দূর হইতে দেখিতাম। তার পরে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালিয়া, বাজনা বাজাইয়া, মহা ধুমধাম করিয়া অভিনয় হইত এবং অভিনয় শেষ হইলেই শেষরাত্রের গাড়িতে অধিকাংশ ছেলে বাড়ি চলিয়া যাইত। ভোরবেলা দেখা যাইত আশ্চর্য পরিবর্তন— একদিন আগেও যে স্থান বহুকণ্ঠের কোলাহলে প্রাণবান ছিল আজ তাহা ক্ষুধিত পাষাণের পুরীর মতো নির্জন এবং স্মৃতির ক্ষুধায় বুভুক্ষু। রঙ্গমঞ্চ তখনো তেমনি পড়িয়া আছে; দেবদারুপাতা ঈষৎ ম্লান, পর্দাখানা একটুখানি স্রস্ত, শতরঞ্জিগুলা একটু শিথিল। মনে হইত, ইহার প্রয়োজন যেন ফুরায় নাই। চারি দিকে শূন্যতার মধ্যে এই পরিপূর্ণতার ছবি একান্ত নিরর্থক মনে হইত। তার পরে আরো দু-চার দিন গেলে দেবদারুপাতা শুকাইয়া একরকম গন্ধ উঠিত, কুকুরগুলা রঙ্গমঞ্চে শুইয়া থাকিত, গভীর বেতসিনী নদী তাহারা হাঁটিয়া পার হইয়া যাইত— সবসুদ্ধ মিলিয়া সে এক কুঞ্জভঙ্গের করুণ ছবি। আমরা এ-সব দৃশ্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু, আজ পর্যন্ত সেই ভাঙা রঙ্গমঞ্চের ছবি আমার কাছে বিদায় ও বিষাদের প্রতীক হইয়া রহিয়াছে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিনয়-প্রসঙ্গে সকলের আগে দিনেন্দ্রনাথের নাম মনে না পড়িয়া উপায় নাই। দিনুবাবু যে কেবল একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন, ইংরেজিতে যাহাকে বলে ইন্‌স্টিটিউশন্। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন তাঁহার চারি দিকে একটি অদৃশ্য রসের পরিমণ্ডল বিরাজ করিত। তাঁহার বিপুল দেহে, বিপুলতর আন্তরিকতায়, সুরে স্বরে, সংলাপের সরসতায় তাঁহাকে দশজনের সঙ্গে তাল পাকাইয়া ফেলিবার উপায় ছিল না। সামাজিকতা-গুণ শিক্ষালভ্য নয়, যে পায় নিতান্ত সহজাতরূপেই পায়; দিনুবাবুর মধ্যে এই

গুণ প্রচুরভাবে ছিল। সাদা-পোশাক-পরা এই বিরাট পুরুষকে দূরে আসিতে দেখিলে মনে হইত, সাদা-পাল-তোলা একখানা বিরাট বজরা স্রোতের অনুকূলে দ্রুত চলিয়া আসিতেছে। হাতে ছোটো একটি ডিবায় ছোটো ছোটো আকারের অনেকগুলি পান। সে পানের দাবিদার অল্প ছিল না। দেখা হইলেই দুটি মিষ্টি কথা বলিবেন; তা দিনের মধ্যে পাঁচবার দেখা হইলে পাঁচবারই বলিবেন, যেন এই প্রথম দেখা।

তিনি যখন এক সময় দেহলি বাড়িতে থাকিতেন তখন বিকেলবেলা বাগানের মধ্যে তক্তপোশ পাতিয়া চায়ের আড্ডা জমিয়া উঠিত। তেজেশবাবু থাকিতেন, নন্দলালবাবু থাকিতেন, আর থাকিতেন অসিতবাবু, অক্ষয়বাবু, সন্তোষবাবু। মাঝে মাঝে ক্ষিতিমোহনবাবুও দেখা দিতেন। শাস্ত্রীমহাশয় কখনো চা পান করিতেন না, তবু তিনি দু-দশ মিনিট দাঁড়াইয়া গল্প করিয়া 'আনন্দ করুন' বলিয়া বেড়াইতে চলিয়া যাইতেন। আমিও তখন এই তক্তপোশের একান্তে বসিতে আরম্ভ করিয়াছি। দিনুবাবু চাণক্যশ্লোকের আর কোনো উপদেশ না মানিলেও, 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' খুব মানিতেন; আর আমি অনেক আগেই ষোলো উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। দিনুবাবুর সংগীত ও অভিনয়ের খ্যাতিই লোকপ্রসিদ্ধ, অথচ তাঁহার মতো গদ্য ও পদ্য পাঠ করিতেও কম শুনিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠস্বরের জাদুতে গদ্য ও পদ্য নূতনতর সংগীতের স্তরে গিয়া পৌঁছিত। তিনি নিজে যেমন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, তার চেয়ে কম দক্ষতা ছিল না আনাড়িকে অভিনয়কলা-শিক্ষাদানে। সংগীত সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। ফল কথা, আমাদের কাছে দিনুবাবু ছিলেন উৎসবের প্রতীক, উৎসবরাজ। প্রাত্যহিক শৃঙ্খলার অচলায়তনে তিনি ছিলেন মুক্তির পঞ্চক।

তাঁহাকে শেষবার দেখি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে; তখন তিনি শান্তি-নিকেতনের বাসা তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। দেখি 'বিচিত্রা' বাড়ির প্রকাণ্ড শূন্যতার মধ্যে একাকী বসিয়া আছেন। মুখে সে আনন্দের দীপ্তি নাই। বুঝিলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া আর কতটুকু বা জানা যাইবে! কোথায় একটা আলো যেন নিবিয়া গিয়াছে। আর অল্পদিন পরেই দিনেন্দ্রনাথের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। এবারে আলো সত্যসত্যই নিবিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় আমি দেখি, তাঁহার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনীত 'রাজা' নাটকের অদৃশ্য রাজার ভূমিকায়। ইহাকে দেখার চেয়ে শোনা বলাই উচিত। কারণ, এ নাটকের রাজার কথা মাত্র শোনা যায়, তাঁহাকে দেখা যায় না। তার পরে ঐ সময়েরই কাছাকাছি কোনো সময়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু, এ-সব স্মৃতি আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

'শারদোৎসব' নাটক উপলক্ষে তাঁহার অভিনয় ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সাজিয়াছিলেন। জগদানন্দবাবু সাজিতেন লক্ষেশ্বর; এই কমিক ভূমিকায় তাঁহার শক্তি পুরাপুরি বিকাশের সুযোগ পাইত। মাঝে দু-একবার তপন চট্টোপাধ্যায় লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনিও এই ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। আমি প্রথমবার ধনপতি নামে একটি বালকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম; বয়স বাড়িলে এই নাটকে অন্য ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছি। পরে শারদোৎসবের নূতন রূপ 'ঋণশোধ' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ শেখর কবির ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু সন্ন্যাসী সাজিতেন। দিনুবাবু বরাবর ঠাকুরদা সাজিতেন। সন্তোষবাবুও কখনো কখনো সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। পূজার ছুটির পূর্বে 'শারদোৎসব' এবং গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে 'অচলায়তন' প্রায়ই অভিনীত হইত। এ দুটি নাটকের মস্ত সুবিধা এই যে, এগুলি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত; কাজেই ছেলেদের মেয়ে সাজাইবার হাঙ্গামা হইতে বাঁচা যাইত। অবশ্য, সে সময়ে প্রয়োজন হইলে ছেলেরাই মেয়ে সাজিত। স্ত্রীভূমিকায় যাঁহারা কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুধীরঞ্জন দাশ ও অজিত চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অচলায়তনে রবীন্দ্রনাথ সাজিতেন আচার্য, ক্ষিতিমোহনবাবু সাজিতেন দাদাঠাকুর, দিনুবাবু ও জগদানন্দবাবু যথাক্রমে সাজিতেন পঞ্চক ও মহাপঞ্চক। শোণপাংশুর দলের মধ্যে মিস্টার পিয়র্‌সন ছিলেন। প্রথমবার অচলায়তনে আমি সুভদ্র নামে বালকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে বেশি বয়সে ছাত্রদলের মধ্যে কোনো ভূমিকা লইতাম। এই সময়ের একবারের অভিনয়ের একটা ঘটনা মনে আছে। ছাত্রদল আচার্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে; তাহারা আচার্যকে বাঁধিতে চায়। কিন্তু, গুরুদেবকে বাঁধিতে কে অগ্রসর হইবে? আর,

কেহ রাজি নয় দেখিয়া আমি বলিলাম, "দূর ছাই, এ তো অভিনয় বৈ কিছু নয়! দাও দড়িগাছা আমাকে, আমি বাঁধিব।"

৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে একাধিকবার আমরা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করিয়াছিলাম। চরিত্রলিপি দেওয়া গেল—

বৈকুণ্ঠ : দিনুবাবু

অবিনাশ : বিভূতি গুপ্ত

কেদার : অনিল মিত্র। বারান্তরে চণ্ডী সিংহ

বিপিন : সুবোধ রায়

ঈশান : সরোজরঞ্জন চৌধুরী

তিনকড়ি : লেখক

অভিনয় খুব জমিয়াছিল— বিশেষত দিনুবাবুর অভিনয়ের তো তুলনা নাই। প্রাক্তন ছাত্রদের গৃহনির্মাণের জন্য 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করিয়া অনেক টাকা তোলা হইয়াছিল।

বাংলা নাটক ছাড়াও, আমরা কয়েকবার সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম। ভীমরাও শাস্ত্রী ছিলেন সংগীতশিক্ষক, আমরা তাঁহাকে পণ্ডিতজি বলিতাম। তিনি সংস্কৃত-অভিনয় শিক্ষা দিতেন। প্রথমবার বেণীসংহারের কতক অংশ করিলাম; আমি ছিলাম অশ্বত্থামা। তার পরে সাহস বাড়িয়া গেলে চণ্ডকৌশিক আদ্যন্ত অভিনয় করিলাম; হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা আমার। ভাষা সংস্কৃত বলিয়া অভিনয় করিতে আমাদের কখনো অসুবিধা হয় নাই; আর দর্শকদেরও যে খুব অসুবিধা হইয়াছিল তা মনে হয় না, কারণ তাহারা কোনোরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া ধীরভাবে দেখিয়াছিল।

শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' নাটক বহুবার অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। প্রথমে স্ত্রীচরিত্র-সমেত আগাগোড়া বইখানাই অভিনীত হইত। কিন্তু, শেষের দিকে স্ত্রীচরিত্র বাদ দিয়া অভিনয়যোগ্য একটি রূপ আমরা খাড়া করিয়াছিলাম। সন্তোষবাবু গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকা লইতেন। একবার আমি জয়সিংহ, দিনুবাবু রঘুপতি সাজিয়াছিলেন। সেবারে দর্শকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। অভিনয়ান্তে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "তুই যখন বুকে ছোরা মেরে পড়লি আর তার পর দিনু যখন তোর ঘাড়ে পড়ল আমি ভাবলাম তোর মরতে

কিছু বাকি থাকলে ওতেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।" 'বিসর্জন' বহুবার অভিনীত হইয়াছে; আমি একাধিকবার রঘুপতির ভূমিকা লইয়াছি, একবার নক্ষত্ররায়ও সাজিতে হইয়াছিল। সন্তোষবাবু বরাবর রাজা সাজিতেন, তাঁহাকে রাজার ভূমিকায় মানাইত ভালো। জনতার মধ্যে সরোজরঞ্জন, অমূল্য (সেই আমাদের বুধবারের ম্যানেজার) খুব নাম করিয়াছিলেন।

'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী' শান্তিনিকেতনে কখনো অভিনীত হয় নাই। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ঘন ঘন অভিনীত হইত। দিনুবাবু এক-আধবার বাল্মীকি সাজিয়াছিলেন। এ নাটকখানি অত্যন্ত অল্প আয়াসে জমিয়া যাইত। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক পড়িল 'বসন্ত', 'বর্ষামঙ্গল', 'শেষবর্ষণ' প্রভৃতি পালা-গানের উপর। এগুলি প্রথম আশ্রমে অভিনীত হইত, তার পরে কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন ধরিয়া সাড়ম্বরে অভিনীত হইত। একবার ঋণশোধ নাটকের 'প্রম্‌টার' বা শ্রুতিকাররূপে আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। নূতনের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা সাজিয়াছিলেন। তাঁহার মুখস্থ ভালো হয় নাই দেখিয়া তিনি আমাকে এক কালো ঘেরাটোপ পরাইয়া দিলেন, আমার হাতে বই; তিনি আর আমার কাছ ছাড়িয়া বড়ো নড়িতে চাহেন না।

'ফাল্গুনী' লিখিত হইলে প্রথম শান্তিনিকেতনে অভিনয় হয়। তার পরের বছর পরিবর্ধিত আকারে কলিকাতায় অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনের অভিনয় আমি দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন অন্ধ বাউল, চন্দ্রহাস ছিলেন ক্ষিতিমোহনবাবু, আর জগদানন্দবাবু ছিলেন দাদা, সর্দার প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কোটাল ও মাঝি যথাক্রমে অসিত হালদার ও শরৎকুমার রায়।

'নটীর পূজা' লিখিত হইলে আশ্রমে প্রথম অভিনীত হয়। গৌরীর নটীর পূজানৃত্য তো লোকপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। লোকেশ্বরীর ভূমিকায় মিনুর অভিনয়ের জোড়া নাই। এই ভূমিকায় যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে, মিনুর অভিনয়ে তাহা চমৎকার ফুটিয়াছিল; এখনো তাহার আর্ত কণ্ঠস্বর কানে যেন বাজিতেছে। রত্নাবলীর চরিত্রেও জটিলতা আছে, লতিকার মধ্যে তাহা বেশ ফুটিয়াছিল।

শান্তিনিকেতনের অভিনেতাদের নটশক্তির বিশ্লেষণ সহজ নয়। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাকে কখনো কমিক ভূমিকায় দেখি নাই। তবে একবার 'বিনি-পয়সার ভোজ' নামে একচরিত্র নাটক পাঠ করিতে দেখিয়াছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কমিক অভিনয়েও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তামাক টানিবার

দৃশ্যে অদৃশ্য কল্কেটি যখন দুই হস্তপুটে স্থাপন করিয়া প্রাণপণে টান মারিলেন, সমস্ত মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক খরচ করিয়া, সমস্ত দিনের ক্ষুধা পেটে করিয়া, এক কল্কে তামাক জুটিয়াছে; ঐ একটি টানে তাহা যেন নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কারণ যেস্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন সেখানে দ্বিতীয়বার এ সুযোগ না জুটিতেও পারে। যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিয়া তাঁহার এই দুর্দশা, ঐ একটি টানে তাহার প্রতি যুগপৎ অনুযোগ ও আক্রোশ প্রকাশ পাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যেমন সাহিত্যের শ্রেণীবিশেষে ফেলা যায় না, তাঁহার অভিনয়কলা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে তাহাতে যেন লিরিক রীতিরই প্রাধান্য ছিল; সমস্ত ভূমিকাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত। কিংবা, অন্ধবাউল, সন্ন্যাসী, আচার্য প্রভৃতি ভূমিকা হয়তো কবির নিজস্ব অভিনয়প্রতিভার অনুরূপ করিয়াই সৃষ্ট বলিয়া এমন মনে হইত। মোট কথা, তাঁহার যৌবনের ও বার্ধক্যের সবরকম ভূমিকায় যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে মত প্রকাশ করিতে পারেন।

দিনুবাবুর নটপ্রতিভা বহুমুখী ছিল; কমিক, গম্ভীর, সব রস তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তাঁহার মুখের মাংসপেশী অতিসূক্ষ্ম ভাবকে পর্যন্ত অনায়াসে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য এমন ছিল যাহা সচরাচর বিরল। পৃথিবীর যে-কোনো দেশে তিনি প্রথম শ্রেণীর নট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু গম্ভীর ভূমিকা ভালো করিতে পারিতেন। অচলায়তনে দাদাঠাকুর যখন যোদ্ধবেশে ভাঙা অচলায়তনে প্রবেশ করিতেন তখন সে ভূমিকায় ক্ষিতিমোহনবাবুকে চমৎকার মানাইত।

জগদানন্দবাবু কমিক অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহার হাস্যরস অনায়াসে ট্রাজেডির স্তরে পৌঁছতে পারিত; মহাপঞ্চক চরিত্রের শেষাংশের অভিনয়ে তাহা প্রমাণ হইয়াছিল।

অসিতবাবুও নিপুণ কমিক অভিনেতা, কিন্তু তাঁহার আর্ট আবার অন্যরকম। ইংরেজিতে যাহাকে বার্লেস্‌ক্ বলে অসিতবাবু সেই শ্রেণীর ভূমিকা সব চেয়ে ভালো করিতে পারিতেন।

শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চের রীতিমত ইতিহাস লিখিলে দেখা যাইবে, ইহার

পরিণতি কম বিস্ময়কর নহে। প্রথম আমলে দেখিয়াছি, নাটকে কেনা পোশাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোশাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পীগণ-কর্তৃক পরিকল্পিত পোশাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজ-পোশাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়ম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশি, এস্রাজ দেখা দিল। এক কথায় অভিনয়ের সৌন্দর্যকলার উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ ভদ্রসমাজে নৃত্য চালাইয়াছেন, কিন্তু এ কাজটিও এক দিনে হয় নাই— অনেক সামাজিক ও ব্যবহারিক বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। শান্তিনিকেতন রঙ্গমঞ্চে ছেলেমেয়েরা প্রথম আমলে নাচিত না, অমনি ঘুরিয়া ফিরিয়া গান করিত। তার পরে নাচের প্রথম ধাপগুলি আরম্ভ হইল। শেষে বহু পরে রীতিমত নাচ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলিতে হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের শিক্ষিত লোকের মত-পরিবর্তন করিয়া ছাড়িয়াছেন।

বাংলাদেশের আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখিতে গেলে, শান্তি-নিকেতনের রঙ্গমঞ্চকে বাদ দেওয়া চলিবে না। এ বিষয়ে দেশের রুচি যেটুকু ঘুরিয়াছে তাহার মূলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া শান্তি-নিকেতনের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের মধ্য দিয়াই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের দু-একটা নূতনত্বে যুগান্তর, বিপ্লব, এইরকম ধুয়া কয়েক বছর আগে কলিকাতা শহরে উঠিয়াছিল; সে সবই প্রায় শান্তিনিকেতনের রীতির ক্ষীণ অনুকরণ। সেইজন্য কলিকাতার ব্যাপারে আমরা নূতন কিছু দেখি নাই, বরঞ্চ পুরাতন রীতি লইয়া এত হৈচৈ দেখিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্রতায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

দিনুবাবু যেমন ছিলেন আমাদের উৎসবের অধিরাজ, সন্তোষবাবু ছিলেন তেমনি আমাদের খেলাধুলার অধিনায়ক। এই উপলক্ষে সন্তোষবাবুর পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তোষবাবু সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীশবাবু রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। কাজেই সন্তোষবাবুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

বহুদিন হইতে একটা স্নেহের পারিবারিক সম্বন্ধ যেন স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত, সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ, ইঁহারা দুইজনেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদিতম ছাত্র। এনট্রান্স্ পাস করিবার পরে ইঁহারা দুইজনে একসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যাত্রা করেন।

আমি যখন আশ্রমে যাই ঠিক তাহার কিছু পূর্বে তাঁহারা এ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রথীন্দ্রনাথ তখন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন না, কাজেই তাঁহার পরিচয় তখন মাঝে মাঝে পাইতাম মাত্র। কিন্তু, সন্তোষবাবু ফিরিয়াই আশ্রমের কাজে যোগ দেন; তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু, গোড়ার দিকে সন্তোষবাবুর চেয়ে তাঁহার জননীর পরিচয়ই আমরা বেশি পাইতাম। তাঁহারা তখন সপরিবারে দেহলিভবনে থাকিতেন, আমরা পাশের বাড়িতে থাকিতাম। রাত্রে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িতাম, হয়তো খাওয়া হইত না; সন্তোষবাবুর মা আসিয়া আমাদের জাগাইয়া তুলিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া দিতেন। এই মহীয়সী নারী স্বামী ও অনেকগুলি উপযুক্ত পুত্রকন্যার মৃত্যু কিরূপ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অল্পদিন আগে এই ধৈর্যের প্রতিমা নারীর মৃত্যু হইয়াছে। কেন জানি না, ইঁহাকে দেখিয়া আমার 'গোরা'র আনন্দময়ীর কথা মনে পড়িত।

সন্তোষবাবুর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল অসাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতাজ্ঞান। অনেক সময় সৌজন্য ও ভদ্রতাকে ভাবালুতা বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, যেন ইহা চরিত্রের দুর্বলতারই লক্ষণ। সেইজন্য এই ব্যস্ততার যুগে সৌজন্যের অভাব যেমন চোখে পড়ে, তেমনি কোথাও তাহার পরিচয় পাইলে তাহাও চোখে পড়ে বেশি। একপ্রকার সৌজন্য আছে যাহা দেখিলেই মনে হয়, ইহা সহজ নয়, সাময়িক প্রয়োজনে জোর করিয়া টানিয়া আনা। কিন্তু, সন্তোষবাবুর সৌজন্য নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই একান্ত সহজাত ছিল। দেখা হইবামাত্র দুটা মিষ্টি কথা, দুটা কুশলপ্রশ্ন, কিছু না হোক হাসিয়া দুটা কথা বলা তাঁহার পক্ষে একান্ত অনায়াস ছিল; সেইজন্যই তিনি ছোটো বড়ো সকলের হৃদয়কে অবিলম্বে নিজের দিকে টানিতে পারিতেন।

ইহা তাঁহার অন্তর্নিহিত সেবা-ভাবেরই বিকাশমাত্র। এই সেবার ভাবটি সব চেয়ে বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে। আমেরিকা হইতে ডিগ্রি লইয়া ফিরিয়া ইচ্ছা করিলে তিনি অনেক উচ্চপদ পাইতে

পারিতেন, কিন্তু সে-সব চেষ্টা মাত্র না করিয়া তিনি আশ্রমের কার্যে যোগ দিলেন। চাকুরি কথাটা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করে না; কারণ, নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশাইয়া দিয়া যে ব্রতগ্রহণ তাহাকে চাকুরি না বলাই উচিত। তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ বলিয়া যেন কিছু ছিল না, আশ্রমের সব কাজই তাঁহার কাজ ছিল। ক্লাস পড়াইয়া যে সময় হাতে থাকিত তাহা আশ্রমের কোনো-না-কোনো কাজে ব্যয় করিতেন; এমন সকাল হইতে সন্ধ্যা, প্রয়োজন হইলে সন্ধ্যা হইতে সকাল— এমন বছরের পর বছর, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। বোধ করি বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কাজেই তাঁহার জীবনের এই অংশ আমাদের চোখের সামনেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সন্তোষবাবুর পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া তাঁহার পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল— তাঁহার বিবাহের উৎসব হইতে শ্মশানের শেষকৃত্যের আমি অন্যতম সাক্ষী।

যখন তিনি কলিকাতায় মৃত্যুশয্যায়, রোগের গুরুত্বের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতা ও ভগ্নীদের লইয়া আমি কলিকাতায় রওনা হই। সে রাত্রিও তিনি জীবিত ছিলেন। পরদিন ভোরবেলা মুসলমানপাড়া লেনের বাড়ি হইতে তাঁহাদের লইয়া যখন ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছিলাম, হঠাৎ আমার নজরে পড়িল— দোতলার বারান্দায় তাঁহার বোন মুটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেখিয়াও দেখিল না। সমস্তই বুঝিলাম। তাঁহার মাতার চোখে একবিন্দু জল দেখি নাই। কেবল যখন এই হতভাগ্য পরিবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিল, তখন শূন্য বাড়ির সম্মুখে আসিয়া মাতার সমস্ত ধৈর্য ভাঙিয়া পড়িল— সে কী রোদন! তাঁহার প্রাণধারণের পক্ষে এই কান্নাটির প্রয়োজন ছিল।

সন্তোষবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য, বিশেষ তিনি আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন বলিয়া, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার মিলন সহজ ছিল। ছাত্ররা সহজেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। আর, একবার বিশ্বাসের স্বর্ণসূত্র গ্রথিত হইয়া গেলে কোনো বাধাই বাধা বলিয়া মনে হয় না। আশ্রমের সব কাজই তাঁহার কাজ ছিল। কিন্তু, খেলাধুলা, স্পোর্ট্‌স্-এর প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার আন্তরিক টান ছিল।

শান্তিনিকেতনের ফুটবল টীম আমাদের সময়ে প্রায় অজেয় ছিল। ভালো

খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁহার বিশেষ টান ছিল; আর খেলোয়াড়গণও তাঁহাকে বিশেষভাবে আপনার বলিয়া মনে করিত। ভালো খেলোয়াড়রা প্রায়ই ভালো পড়ুয়া হয় না; ফলে বছর-শেষে তাহারা যখন ক্লাস-প্রমোশন হইতে বঞ্চিত হইত, দিনকয়েক লজ্জানিবারণ অজ্ঞাতবাসের জন্য তখন তাহারা সন্তোষবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইত— সেখানেই তাহাদের আহার ও নিদ্রা।

খেলাধুলা

শান্তিনিকেতনের ফুটবল টীম প্রায় অজেয় ছিল বলিয়াছি। কলিকাতা হইতে অনেক কলেজের ফুটবল টীম ওখানে খেলিতে যাইত; কোনো দল যে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন মনে পড়ে না। একবার মোহনবাগানের একটা দল খেলিতে গিয়াছিল, তাহাদেরও হারিতে হইয়াছিল। আমাদের সময়ে আশ্রমের নামজাদা খেলোয়াড়দের মধ্যে গৌরগোপাল ঘোষ, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সূর্য চক্রবর্তী, বীরেন সেন প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই পরবর্তীকালে কলিকাতার নামজাদা সব খেলোয়াড় দলে ভর্তি হইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আশ্রমের ফুটবল দল সিউড়ি বর্ধমান সাঁইথিয়া রামপুরহাট নলহাটি প্রভৃতি স্থানে প্রতিযোগিতা করিতে যাইত; জিতিয়া আসাই যেন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল— কচিৎ কখনো পরাজিত হইত। এই-সব জায়গায় আমাদের দল খেলিতে গেলে সংবাদের জন্য আমরা উৎসুক হইয়া থাকিতাম। সন্ধ্যাবেলা ডাকঘরে গিয়া ভিড় করিতাম। তখন পোস্ট্‌মাস্টার ছিলেন যতীন বিশ্বাস নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ডাকের কাজ ও তারের কাজ দুইই করিতেন; সেইজন্য আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম ডাকতার। যতীনবাবুকে অনুরোধ করিতাম, একবার তারে খবর লইতে খেলার ফলাফল কী হইল। তাঁহার উৎসাহও আমাদের চেয়ে কম ছিল না। তিনি প্রাইভেট খবর লইয়া বলিয়া দিতেন, আমাদের দল জিতিয়াছে। আমরা আনন্দিত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। সিউড়ি রামপুরহাট হইতে শেষ রাত্রের গাড়িতে বিজয়ী দল ফিরিত। আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িতাম। হঠাৎ কখন এক সময়ে বিজয়ী দলের সম্মিলিত কণ্ঠের 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন' গান শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত। আমরা ছুটিয়া গিয়া বিজেতাদের

ঘিরিয়া ধরিতাম— মশালের আলোতে রুপার প্রকাণ্ড শীল্ডখানা অকালসূর্যের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিত। সেই রাত্রেই সকলে মিলিয়া গান গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ হইত; নিদ্রাহানিতে কষ্টের কারণ ছিল না, কারণ পরের দিন অবধারিত ছুটি।

একবার পর পর তিনচারখানা শীল্ড জয় করিয়া আনা হইল; শেষে এমন হইল যে, বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ আর ছুটি দিতে চাহেন না। অথচ ছুটি পাইবার এমন উপলক্ষ ছাড়া তো কিছুতেই চলে না। এরকম স্থলে আমাদের আপীলের উচ্চতম আদালত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু, শেষরাতে তো তাঁহার ঘুম ভাঙানো চলে না, অথচ খুব ভোরে ক্লাস আরম্ভ হয়, তার আগেই ছুটির কথা প্রচারিত হওয়া দরকার। কাজেই সাহসে ভর করিয়া রবীন্দ্রনাথের শয়নগৃহের দ্বারে গিয়া ভালোমানুষটির মতো চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, শয্যাত্যাগ করিয়াই আমাকে দেখিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কী। আমি সমস্ত সভয়ে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, "বল্‌ গিয়ে যে আমি ছুটি দিতে বলেছি।" অমনি আমার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে উল্লাসকর পরিবর্তন হইল; আমি এক দৌড়ে গিয়া সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়কে সমস্ত বলিলাম। আর কি, ছুটি হইয়া গেল।

খেলাধুলা আমার নিজের কোনোদিন ভালো লাগিত না, অবশ্য ছুটিটা খুবই ভালো লাগিত। ফুটবল প্রভৃতি খেলা নাকি পুরুষোচিত খেলা। কিন্তু, বাইশজন লোক একটা মৃতপশুর চর্মগোলককে উপলক্ষ করিয়া রেফারিকে মারিতে চেষ্টা করিতেছে— রেফারির কৃতিত্ব সেই মার বাঁচাইয়া যাওয়া— আর বাইশ হাজার দর্শক চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছে, ইহার মধ্যে পৌরুষ কোথায় আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। ইহার চেয়ে যে রোমান আমলে সিংহের সঙ্গে মানুষের লড়াই অনেক বেশি পুরুষোচিত। তাহাতে অন্তত পশুটা জীবন্ত ছিল।

খেলার সঙ্গে আর-একটা বালাই ছিল, ড্রিল শেখা। এ ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর ও নিরর্থক মনে হইত। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া হুকুমমাত্র ডাইনে ঘোরা, বামে ঘোরা, পিছন ফিরিয়া চলা, ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাইতাম না। আর, মূঢ়ের মতো সকলে একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলার মতো ফিলিস্টাইনোচিত জিনিস আর-কিছু আছে কিনা জানি না। লড়াই করিতে

গেলে নাকি এ-সবের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, আমাদের সম্মুখে লড়াইয়ের সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। বলা বাহুল্য, খেলা ও ড্রিল দুইই ফাঁকি দিতে ত্রুটি করিতাম না।

খেলা ও ড্রিল ছাড়া আর-একটা ব্যাপার ছিল, মাঝে মাঝে স্পোর্ট্‌স্‌ হইত। উল্লম্ফন, দীর্ঘলম্ফ, সিধা ছুট্‌ প্রভৃতি। সিউড়িতে শীতকালে একটা মেলা বসিত; তাহাতে একদিন এই-সব প্রতিযোগিতা ছিল। বীরভূমের সমস্ত স্কুল যোগ দিত। আশ্রমের দলও যাইত। প্রথম প্রথম এমন হইত যে, সমস্তগুলি প্রাইজ আশ্রমের ছেলেরাই আনিত, অন্যদের কেবল ছোটাছুটিই সার। শেষে তাঁহারাও কৌশল কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইল; সব প্রাইজ আর আমাদের ছেলেরা আনিতে পাইত না, কিন্তু বরাবরই বেশির ভাগ প্রাইজ জিতিয়া লইয়া আসিয়াছে।

আশ্রমপরিবার

আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই, ছাত্র, অধ্যাপক, অনুচর, পরিবার মিলিয়া তখন দেড়শতের বেশি অধিবাসী ছিল না। প্রতিষ্ঠানের আয়তনও ছোটো ছিল, কয়েকখানা চালাঘর, গোটা দুই পাকাবাড়ি, এই মাত্র। আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও অধিবাসীর সংখ্যাল্পতার জন্য আশ্রমে তখন একটি পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্য অনেক অভাব-সত্ত্বেও এই ভাবটি ইহার প্রধান ঐশ্বর্য ছিল। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া একটি বস্তু। কিন্তু, এই পরিবার-চৈতন্যের জন্য আশ্রমকে কখনো জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া বলিয়া মনে হয় নাই। ছাত্ররা নিজেদের পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিত বটে, কিন্তু এই নূতন-পরিবার-ভুক্ত হওয়াতে সে অভাব তেমন করিয়া অনুভব করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম অল্পবয়স্ক ছাত্ররা এখানে আসিয়া পিতামাতা ভাইবোনদের জন্য কয়েকদিন কান্নাকাটি করিত বটে, কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে, কিছুকাল এখানে থাকিবার পরে অকস্মাৎ চলিয়া যাইবার সময়েও অনেকে তেমনি কাঁদিয়া চলিয়া যাইত। পারিবারিক মমত্বের স্পর্শ না পাইলে এমনটি ঘটিতে পারিত না।

তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিখ্যাত ছিল না। বাংলাদেশের সকলেও ইহার নাম জানিত না। মাঠের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লীর সহিত চারি দিকের গ্রামের আত্মীয়তা তখনো স্থাপিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানের বিচিত্র ধরনের

জীবনযাত্রাকে চারি দিকের লোকের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হইত ; তাহারা ইহাকে যেন সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিত। পুলিসও বড়ো সুনজরে দেখিত না। চারি দিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়াতে, এখানকার অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখনকার দিনে অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছাত্রদের সঙ্গে থাকিতেন, একত্র আহার ও খেলাধুলা করিতেন। একসঙ্গে বাস, আহার, খেলাধুলা, পরস্পরের মধ্যে অভাবিত নৈকট্য প্রদান করিয়াছিল।

বৈদ্যুতিক আলোর পূর্ববর্তী যুগে এই ক্ষুদ্র পল্লী সন্ধ্যা হইবামাত্র ঘন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত। তখন এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে আমাদের গা ছম্‌ছম্‌ করিত। রান্নাঘরে যাইবার সময়ে আমরা সকলে একত্র আলো লইয়া যাইতাম ; মাঝে মাঝে কাল্পনিক ভীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠা বিরল ছিল না। এখনকার শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্ববিখ্যাত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান— বিদ্যুতের আলোতে পথ-ঘাট আলোকিত ; বহুশত অধিবাসীর কণ্ঠে রাত্রিও মুখর ; চারি দিকের পল্লীর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র স্থাপিত হইয়া ইহা দেশের অংশবিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, খাপছাড়া একটা পল্লীমাত্র আর নাই। ইহাতে পরিবারচৈতন্যের যেন কিছু শিথিলতা ঘটিয়াছে। সেজন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই ; বয়স বাড়িলে, সঞ্চরণ-ক্ষেত্রের পরিধি বাড়িলে, এমনতরো ঘটিয়াই থাকে। কিন্তু, আমাদের সময়কার ক্ষুদ্র পল্লীও যে হীনতর ছিল এমন বলি না। তখনকার শান্তিনিকেতনের এক রস ছিল, এখনকার শান্তিনিকেতনের অন্য রস। তবু প্রাচীনকালের অধিবাসীদের যেন সেই রসটাই বেশি ভালো লাগিত।

এই আত্মীয়তার জালে অনুচরপরিচর, এমন-কি, গাছপালাগুলি পর্যন্ত যেন ধরা পড়িয়াছিল। ইহাদের বাদ দিয়া তখনকার প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না। ইহাদের অনেকেই আশ্রমের বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমে পাকশালার কথা ধরা যাক। এখানকার পাচকেরা সকলেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্থানী বা ওড়িয়া নহে। ইহাদের আবার অধিকাংশের বাস বীরভূম বা বাঁকুড়াতে। পাকশালার প্রধান পাচক ছিল সতীশ গাঙ্গুলি। প্রৌঢ় একহারা লম্বা চেহারা, বড়ো ভারিক্কি চাল, চিবাইয়া কথা বলিত। বড়ো ছেলেরা, এমন-কি,

অধ্যাপকেরা পর্যন্ত তাহাকে 'আপনি' বলিত, 'গাঙ্গুলিমশাই' বলিত। আমাদের তো তাহার সঙ্গে কথা বলিতেই ভয় করিত।

আর-একজন পাচক ছিল— চণ্ডীঠাকুর, বোধ করি চণ্ডীদাস কিছু হইবে। বেঁটে, ফরসা, চুল ঈষৎ কোঁকড়া, বয়স গাঙ্গুলির চেয়ে কিছু কম; উদরে প্রচুর মেদ সঞ্চিত হওয়াতে তাহার নাম হইয়াছিল চণ্ডীভুঁড়ি। তাহার সামনে অবশ্য বিশেষণটা ব্যবহার করিতাম না, কিন্তু সে জানিত। তাহার সঙ্গে কিছু আবদার চলিত। বরাদ্দের অতিরিক্ত কিছু চাহিলে সে গৌরব বোধ করিয়া খুশি হইত। বলিত, "কেনে বাবা, গাঙ্গুলির কাছে যাও না কেনে? এখন বুঝি চণ্ডীভুঁড়িকে মনে পড়ে?" সে বোধ হয় মনে মনে গাঙ্গুলির মর্যাদাকে ঈর্ষা করিত। আমার মুশকিল হইয়াছিল এই যে, চণ্ডীদাস ঠাকুরে ও কবি চণ্ডীদাসে অভেদবুদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছিল। অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত কবি চণ্ডীদাসের কথা মনে হইবামাত্র চণ্ডীঠাকুরের চেহারা মনে পড়িত। শান্তিনিকেতন হইতে সুরুল যাইবার পথে একটা আমগাছের গুঁড়ি স্ফীত হইয়া ভুঁড়ির মতো হইয়াছিল— চণ্ডীঠাকুরের ভুঁড়ির সাদৃশ্যে সেই গাছটার নাম আমরা দিয়াছিলাম, চণ্ডীভুঁড়ি। গাছটা এখনো আছে, চণ্ডীঠাকুরের বোধ করি অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে।

এবারে রান্নাঘরের খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রাঢ়ের কতকগুলি প্রিয় খাদ্য আছে, যেমন কলাইয়ের ডাল, পুঁইশাক, পোস্তর তরকারি, রুইমাছের টক। মাছ আমাদের নিষিদ্ধ বলিয়া শেষেরটার সাক্ষাৎ আমরা পাইতাম না; কিন্তু, অপর তিনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিত। আমরা অধিকাংশই বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের লোক; আমাদের পক্ষে ওগুলি দুঃসহ ছিল, বিশেষ কলাইয়ের ডালটা অসহ্য ছিল। আপত্তি করিয়া বিশেষ ফল হইত না; কারণ, পাচকেরা সকলেই রাঢ়ের লোক। পুঁইশাক ও পোস্ত অনেক চেষ্টায় অভ্যস্ত হইয়া গেল, কিন্তু কলাইয়ের ডালের সঙ্গে আমাদের রসনার আপস হইল না। তখন সকলে মিলিয়া একদিন ভাণ্ডারগৃহে চড়াও করিয়া উক্ত ডালের বস্তাটা সশরীরে সরাইয়া ফেলিলাম। বোস্টন বন্দরেও নাকি এমনি করিয়া অবাধ্য জনতা চায়ের বাক্সের উপরে রাহাজানি করিয়াছিল! এ ঘটনা অবশ্য অনেক দিন পরের কথা, তখন আমেরিকান বিদ্রোহের গল্প পড়িয়াছি।

আশ্রমের বেতনভোগী নাপিত ছিল গুরুদাস। কিন্তু গুরুদাস নামটা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল, সকলেই তাহাকে আব্বাস বলিয়া ডাকিত। এই অদ্ভুত

নামের মূল কী জানি না। মাঝে মাঝে অনুরুদ্ধ হইয়া সে ইংরেজি বলিত, তখন ঐ আব্বাস শব্দটা ঘনঘন বলিত। বোধ করি তাহাতেই তাহার নাম আব্বাস হইয়াছিল।

আব্বাস সুরুল গ্রামে থাকিত। সকালবেলা আসিত, সারাদিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিত। লোকটা কৃশ, বেঁটে, দন্তলেশহীন, চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি, আপাদমস্তক শুষ্ক, সবসুদ্ধ মিলিয়া ছোট্ট একটা ব্যাপার। কোটরগত ছোট্ট চোখ-ছুটি আলপিনের ডগার মতো উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ— লোকটা চোখ দিয়া হাসিত, মুখে নয়। তাহাকে স্নান করিতে কেহ কখনো দেখে নাই। গ্রীষ্মকালে জামা খুলিত বটে, কিন্তু স্নান অসম্ভব। শীতকালের হাওয়ার বিরুদ্ধে শরৎকালেই সে সতর্কতা অবলম্বন করিত। বিজয়া-দশমীর দিনে কোট পরিয়া বুকের দিকে আগাগোড়া সেলাই করিয়া দিত, বোতামের উপরে তাহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না— আবার বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সেলাই উন্মোচন করিত। লোকটা হাঁপানির রুগী ছিল, আর সে আফিং খাইত। প্রত্যেক দিন বাড়ি যাইবার সময়ে একখানি বাঁশ কি কাঠ হাতে করিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "পথে শেয়াল তাড়াব।" আসলে ব্যাপারটা তাহার ইন্ধনসমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ত্রিশ বছরের চাকুরি-জীবনে সে বোধ করি একটা আস্ত বনের কাঠ বাড়িতে লইয়া গিয়াছিল।

সে সকালবেলা আশ্রমে আসিয়া এক চক্র ঘুরিয়া নিজের হাজিরা বিজ্ঞাপিত করিয়া তার পরে কোথায় যে লুকাইত কেহ খুঁজিয়া পাইত না। কেবল আশ্রমের দণ্ডধারী অধ্যাপকদের নিয়মিত কামাইয়া দিত, আর কাহাকেও সে বড়ো গ্রাহ্য করিত না। অনেক দিন সাধনার পরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলে অগত্যা দাড়ি কামাইতে বসিত। ক্ষুরে কখনো সে শান দিত না। ক্ষুরের প্রথম টানেই গালে রক্ত বাহির হইত। আহত ব্যক্তি আপত্তি করিলে বলিত, "বাবু, এই-যে লড়াই হচ্ছে তাতে কত লোকের হাত পা কাটা পড়ছে, কই, তারা তো আপত্তি করে না— আর এইটুকুতে আপনি কাতর হচ্ছেন?"

"তা হোক বাপু, তুমি অন্য ক্ষুর বের করো।"

আব্বাস তখন দ্বিতীয় ক্ষুর বাহির করিত; সেখানা বোধ করি আরো ভোঁতা।

"আহা আব্বাস, প্রাণ যে গেল, তোমার আর কি ক্ষুর নেই?"

আব্বাস তখন তাহার শেষ অস্ত্র বাহির করিত। সেখানা ভোঁতাতম।

আহত ব্যক্তি আর কী করিবে? অর্ধেক কামাইয়া তো ওঠা যায় না; সে ক্রমাগত পাশে সরিতে সরিতে এক সময়ে গিয়া দেয়ালে বাধা পাইত। আর যখন সরিবার উপায় নাই, তখন দেয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়া আব্বাস সবলে ক্ষৌরকার্য সমাধা করিত। তার পরে আর সে ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত তাহার শরণাপন্ন হইত না। আব্বাসের প্রথম ক্ষুরের নাম রক্তকিঙ্কিণী, দ্বিতীয়খানা হাড়ভেদী, তৃতীয়-খানার নাম দেয়ালঠেসী।

আমাদের আর-একজন চাকর ছিল, তার নাম ওস্তাদ। তাহার পৈতৃক নামটা কখনো আশ্রম-ইতিহাসের দলিলভুক্ত হয় নাই। তাহাকে অনুরোধ করিলেই তানলয়সংযোগে গান করিত— সে গানের শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো— বোধ করি সেইজন্য লোকটার নাম ওস্তাদ হইয়াছিল। চুনকাম-উঠিয়া-যাওয়া বাড়ির যেমন একটা রুক্ষ ভাব থাকে, লোকটার চেহারায় তেমনি একটা রুক্ষতা ছিল। কৃশ, লম্বা, মুখে নির্বোধের হাসি। আব্বাসের দুষ্টবুদ্ধি যথেষ্ট ছিল, ওস্তাদের কোনো বুদ্ধিই ছিল না; লোকটা নিতান্ত নির্বোধ ছিল, সরল-প্রকৃতিও বলা যাইতে পারে। রুগ্‌ণ বলিয়া তাহাকে কঠিন কাজ দেওয়া হইত না, নোটিস দেখাইয়া বেড়ানো তাহার প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু এক জায়গায় আব্বাস ও ওস্তাদে মিল ছিল, দুজনেই আফিং খাইত। আফিংখোরের কিছু দুধ চাই, রান্নাঘর হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দুজনেই কিছু দুধ জোগাড় করিত। এই দুধের ভাগ লইয়া দুজনে প্রায়ই কলহ হইত এবং কলহ শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়া দাঁড়াইত। দৈহিক বলের বিচারে ওস্তাদেরই জিতিবার কথা, কিন্তু ধূর্ত নাপিত প্রায়ই জিতিত। ওস্তাদের ক্ষোভের একটা প্রধান কারণ ছিল— বিধাতা তাহাকে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান করিয়াছেন, কিন্তু সে যে কেন পরাজিত হয় তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না।

আশ্রমে বেতনভোগী ধোপা ছিল, বোলপুর শহরে তাহাদের বাড়ি। বুধবারে ছুটির দিনের বিকালে তাহারা গাধার পিঠে বোঝাই দিয়া কাপড় লইয়া আসিত। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল খোঁড়া; তাহাকে আমরা লেংড়ু বলিতাম। লোকটা বড়ো ভালোমানুষ ছিল। লোকটার বয়স হইয়াছিল। চুল, দাড়ি, গায়ের রঙ, কাপড়চোপড় হইতে আরম্ভ করিয়া দাঁতগুলি, যায় চোখের তারা পর্যন্ত, সাদা ছিল; সবসুদ্ধ সে যেন একটা মূর্তিমান সজীব চুনকাম।

বোলপুর শহরে হরিডাক্তার বলিয়া একজন চিকিৎসক ছিলেন। আশ্রমের

হাসপাতালের ভার তাঁহার উপরে ছিল। লোকটির রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাহাতেও যেন সন্তুষ্ট না হইয়া, সাদা স্যুট পরিয়া তুলনায় কৃষ্ণবর্ণকে কৃষ্ণতর করিয়া, বোতামে একটা গোলাপ ফুল গুঁজিয়া, গাড়ি করিয়া প্রত্যেক দিন ন'টায় তিনি হাজির হইতেন। হাসপাতালের কাজকর্ম সারিয়া আশ্রমের রোগী পরিদর্শন করিয়া বারোটা-একটায় ফিরিয়া যাইতেন। এমন চ্যাপ্‌টা চেহারার লোক সচরাচর দেখা যায় না; একটা আস্ত লোককে বুকে পিঠে তক্তা দিয়া চাপিয়া দিলে যেমন হয় তাঁহার গঠন তেমনি। হরিডাক্তার সুচিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের ধারণা ছিল, তাঁহার মতো অস্ত্রচিকিৎসক দুর্লভ। প্রয়োজনের ক্ষীণতম আভাস দেখিলেই গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে করিতে এবং আগে-পিছে দুলিতে দুলিতে বলিতেন, "একটা 'ইন্‌সিশন' দিতে হবে দেখছি।" একবার আমাকে এমনি একটা ইন্‌সিশন দিয়াছিলেন। পায়ের গোড়ালিতে কী যেন একটা হইয়াছিল, হরিডাক্তার ইন্‌সিশন দিতে বসিলেন। সে এক বিষম ব্যাপার —ছুরিই ভাঙে কি গোড়ালিই ভাঙে, কি ডাক্তারই ভাঙিয়া পড়েন! শেষ পর্যন্ত আমার গোড়ালিটা শক্ত ছিল বলিয়া ইন্‌সিশন তো হইয়া গেল, কিন্তু পাকা দেড়টি মাস আমাকে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইল।

কিন্তু কে জানিত, এঁচোড় হরিডাক্তারের এত প্রিয় খাদ্য! হাসপাতালের কাছে একটা কাঁঠাল গাছে এঁচোড় ফলিয়াছিল, একদিন তার তলা দিয়া যাইতে যাইতে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তার পরে কোট-প্যাণ্টলুন-পরিহিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান গাছে উঠিয়া গেলেন। আমরা দেখিতেছিলাম। একবার মনে হইল, আজ সকাল-বেলাতেই নাকি! মানুষের রুচি না জানিলে কত সন্দেহই না তাহার সম্বন্ধে হয়। দুটি এঁচোড় পাড়িয়া নামিয়া আসিলেন। দুই হাতে দুটি ফল লইয়া মুখে সে কী জয়োল্লাসের হাসি! বোধ করি তখন উপযুক্ত রোগী পাইলেও ইন্‌সিশন দিবার কথা তাঁহার মনে হইত না। আমি বলিলাম, "বেশ হল, আপনার কাল তরকারি হবে।" তিনি ধিক্কারের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কাল!" ভাবটা যেন, 'তুমি অর্বাচীন, এঁচোড়ের মহিমা তুমি কী বুঝিবে!' তার পরে আমাকে হতবুদ্ধি দেখিয়া বলিলেন, "আজ গিয়ে তরকারি হবে তবে খেতে বসব।" তখন বেলা প্রায় একটা।

রুগী হিসাবে আমি হরিডাক্তারের খুব পরিচিত ছিলাম। একবার আমার রচিত একটা যাত্রাপালার অভিনয় দেখিয়া তাঁহার বড়ো বিস্ময় লাগিল। পরদিন

অক্ষয়বাবুকে বলিলেন, "দেখলে অক্ষয়, ব্যাপারখানা? কথার সঙ্গে কথা জুড়ে মানুষে কী করতে পারে!" ইহাতে আর কিছুই প্রমাণ হয় না, হরিডাক্তারের সাহিত্যজ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি কতখানি তাহা মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তার পরে একটু থামিয়া বলিলেন, "অক্ষয়, ওকে একটু ভালো করে ওষুধপত্র দিয়ো।" ভাবটা, এমন একটা গুণী লোককে কিছুতেই অকালে মরিতে দেওয়া উচিত হইবে না।

অক্ষয়বাবু হাসপাতালের শুশ্রূষাকারী; পালোয়ানি চেহারার উপরে পালোয়ানী গোঁফ। সাধারণত তাঁহার কাজকর্ম লঘু ছিল, কিন্তু, আশ্রমে হাম বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ দেখা দিলে রুগীদের ঘরে তিনি অকুতোভয়ে ঢুকিয়া যাইতেন। সার্কাসের বাঘের খাঁচায় খেলোয়াড় ঢুকিলে দর্শকেরা যে ভাব লইয়া দেখে, আমরা সেইভাবে তাঁহার এই প্রবেশকে দেখিতাম।

ইহারা তো সব আপনার লোক। কিন্তু এ-সব ছাড়াও মাঝে মাঝে মানুষ ও মনুষ্যেতর পোষ্য জুটিয়া যাইত। 'জাপি' নামে একটা বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধি সাঁওতাল এমনি একজন পোষ্য ছিল। সে ভালো করিয়া চলিতে পারিত না, কিন্তু যেখানেই থাকুক দুইবেলা আহারের সময় রান্নাঘরের কাছে হাজির থাকিত। ছেলেরা তাহাকে দুইবেলা খাইতে দিত।

আর একটা মনুষ্যেতর পোষ্য ছিল 'ঘুরিয়া' নামে একটা কুকুর। কুকুরটা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, 'ঘুরিয়া' বলিবামাত্র সে সমস্ত ঘরটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার যথাস্থানে দাঁড়াইত। আমরা যেখানেই যাইতাম, কী ভ্রমণে, কী বনভোজনে, 'ঘুরিয়া' পিছনে আছেই। সে অচ্ছেদ্যভাবে আশ্রম-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। শেষে 'ঘুরিয়া' বুড়া হইয়া মারা গেল, আমরা তাহাকে সমাধি দিয়া তাহার উপরে একটা ইঁটের স্তূপ গড়িয়া দিলাম।

নোবেল প্রাইজ

সেবারে পূজার ছুটির পরে সন্ধ্যাবেলার ট্রেনে আশ্রমে পৌছিয়াছি। বাড়ির জন্য মনটা খারাপ ছিল— পরদিন ক্লাস আরম্ভ হইবে, সে আশঙ্কাও মনকে বিকল করিয়া রাখিয়াছিল। ছুটিতে করণীয় হোম-টাস্কের কিছুই হয় নাই, কাজেই ক্লাসে গেলে কিরকম অভ্যর্থনা হইবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে হইল, এক রাত্রির মধ্যে একটা কিছু ঘটিয়া পরের দিন যুগান্তর ঘটিতে পারে

না! ভূমিকম্প, বন্যা, ঝঞ্ঝা, প্রলয়— যা হোক একটা কিছু হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু ঘোর কলিকালে সেরকম শুভ সম্ভাবনা কোথায়? অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন লইয়া রান্নাঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। শীতের প্রারম্ভে নূতন-ওঠা বেগুন-ভাজা পরিবেশিত হইতেছে, কিন্তু আগামী কল্যের অকৃত হোম-টাস্কের আশঙ্কা সমস্ত রস ম্লান করিয়া দিল। বিধাতার নিষ্ক্রিয়তায় নিজেকে বড়োই অসহায় মনে হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিলেন।

সহসা অজিতকুমার চক্রবর্তী রান্নাঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।" লক্ষ্য করিলাম, অজিতবাবুর চলাফেরা প্রায় নৃত্যের তালে পরিণত হইয়াছে। অজিতবাবু অল্পেই খুশি হন, কাজেই তাঁহার সনৃত্য ঘোষণা অস্বাভাবিক মনে হইল না। বিশেষ তখন পর্যন্ত নোবেল প্রাইজের নাম শুনি নাই।

তার পর ক্ষিতিমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। স্বভাবত তিনি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, চলাফেরায় সংযত, কিন্তু তাঁহাকেও চঞ্চল দেখিলাম। ব্যাপার কী? তার পরে যখন জগদানন্দবাবু পৌঁছিয়া ঘোষণা করিলেন তিন-চার দিনের ছুটি তখন বুঝিলাম ব্যাপার কিছু গুরুতর। একবেলা ছুটির জন্য কত ঘোরাঘুরি, কত দরখাস্ত, তবু সব সময়ে পাওয়া যায় না— আর না চাহিতেই চার দিন ছুটি! ব্যাপার কী! তাহা হইলে আগামী কল্য কেহ হোম-টাস্ক দাবি করিবে না? যদিচ সে আশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হইল না, তবু ফাঁসির আসামী তো চার দিনের জীবনের মেয়াদ পাইল!

তখন আলোচনা আরম্ভ হইল নোবেল প্রাইজ কী বস্তু। ডান পাশে যে ছেলেটি বসিয়াছিল সে বলিল, "ওটা Noble প্রাইজ, গুরুদেব মহৎ লোক বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।" বাম পার্শ্বের ছেলেটি বলিল, "ওটা Novel প্রাইজ, গুরুদেব একখানা নভেল লিখিয়া পাইয়াছেন।" কিন্তু নোবল্ বা নভেল যেরকম প্রাইজই হোক-না কেন, আগামী চার দিনের মধ্যে কেহ আর হোম-টাস্ক দাবি করিবে না— সে চার দিনের মধ্যে কত কী ঘটিয়া যাইতে পারে!

নোবেল প্রাইজ-লাভের সংবাদ বহন করিয়া বোলপুরে যখন টেলিগ্রাম আসে তখন রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবু প্রভৃতি আরো দু-একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কাছেই কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিলেন— সেখানে টেলিগ্রামখানা পাঠাইয়া

দেওয়া হয়। তিনি নীরবে টেলিগ্রামখানা পড়িয়া নেপালবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "নিন নেপালবাবু, আপনার ড্রেন তৈরি করবার টাকা।" তখন আশ্রমের টাকার টানাটানি চলিতেছিল, একটা পাকা নর্দমা অর্ধখনিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

পরদিন সকালে শুনিলাম, নোবেল প্রাইজের টাকার পরিমাণ এক লক্ষ বিশ হাজার। গুরুদেবের কী কবিতার বইয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে। টাকার পরিমাণ শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম, গুরুদেব যে মহাকবি তাহাতে সন্দেহ নাই।

একদিনে আশ্রমের চেহারা বদলাইয়া গেল— কোথায় গেল ক্লাসের নিয়মিত ঘণ্টা, কোথায় গেল অধ্যাপকদের গম্ভীর চালচলন, স্নানাহারের সময়ও গোলমাল হইয়া গেল। তার পরে কোথা হইতে অতিথি-অভ্যাগতে আশ্রম ভরিয়া উঠিল।

তার পরে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটিল। তারিখটা আজও মনে আছে। কলিকাতা হইতে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঁচ-সাত শত লোক স্পেশাল ট্রেনে করিয়া বোলপুরে আসিলেন, রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করিবার উপলক্ষে।

আশ্রমের আমবাগান সুন্দরভাবে সাজাইয়া সেখানে সভার স্থান করা হইল। মাঝখানে কবির জন্য পদ্মাসন প্রস্তুত হইল, সম্মুখে সভাপতির স্থান। অতিথি-সজ্জনে আমবাগান ভরিয়া উঠিলে রবীন্দ্রনাথকে সভাস্থলে আনিয়া বসানো হইল। জগদীশচন্দ্র ছিলেন সভাপতি। মানপত্র পঠিত হইলে সভাপতি কবিকে উদ্দেশ করিয়া দেশের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সতীশ বিদ্যাভূষণ ও অক্সফোর্ড মিশনের হোম্স্ সাহেবের নাম মনে আছে। হোম্স্ সাহেব বলিলেন, "যদিচ কিপলিং বলিয়াছেন পূর্ব-পশ্চিমের মিলন কখনো সম্ভব নয়, তবু আজ এখানে কবির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম সম্মিলিত হইয়াছে।" কবি সত্যেন দত্ত 'আভ্যুদয়িক' নামে তাঁহার বিখ্যাত কবিতাটি পাঠ করিলেন।

এবারে কবির প্রতিভাষণের পালা। তিনি সবিনয়ে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা দেশের লোকের রুচিকর হয় নাই। তাঁহার ভাষার অনুলেখন সম্ভব নয়, সব কথা মনেও নাই, মাঝে মাঝে দু-এক টুকরা যাহা মনে আছে লিখিতেছি। তিনি যেন এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন: "আমি পূর্ব-সমুদ্রের তীরে বসে যাঁর উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়েছিলাম তিনি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে তা কেন গ্রহণ করলেন জানি না। কিন্তু আপনাদের সম্মানের এই মদিরা ওষ্ঠে স্পর্শ করলুম, অন্তরে গ্রহণ করতে পারলুম না।"

তার পরে বোধ করি বলিয়াছিলেন যে, দেশ হইতে এ পর্যন্ত যে অসম্মান ও অবজ্ঞা পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার যথার্থ প্রাপ্য, আজ বৈদেশিক সম্মানের বন্যায় যাঁহারা নৌকা ভাসাইয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে আসিয়াছেন— তাহা অবাস্তব। এ বন্যা একদিন চলিয়া যাইবে, তখন কেবল শুষ্ক ডাঙায় খড়কুটা, ভাঙাচোরার আবর্জনা অবশিষ্ট থাকিবে ; সে গ্লানির চেয়ে তিনি পূর্বতন অবজ্ঞা ও অসম্মানকেই সত্যতর মনে করেন।

কবির এই অভিভাষণের বিরুদ্ধে দেশময় দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। সকলে বলিল, দেশে তাঁহার যেমন নিন্দুক আছে তেমনি ভক্তও তো আছে। তিনি নিন্দুকদের স্মৃতিটাই কেন বড়ো করিয়া দেখিলেন !

কিন্তু, আমি তো কবির কোনো দোষ দেখি না। যখন বিজ্ঞজনেরাও গম্ভীর-ভাবে আলোচনা করিত, রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে ছোটো না বড়ো— যখন সাহিত্যসমালোচকেরা মনে করিত, তাঁহার চুটকি কবিতা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, বৈতরণীর স্রোতে অবিচল থাকিবে মহাকাব্যের জগদ্দল শিলা-খণ্ডগুলি— যখন রবীন্দ্রভক্তেরা বাংলাসাহিত্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া উপহাসের পাত্র ছিল— তখন কবির এ অভিভাষণকে সাময়িক অভিমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অযোগ্যের হাতের অপমানে ও অবজ্ঞায় যে আঘাত পান, সাংসারিক সুখদুঃখ-লাভক্ষতির দ্বারা তাহার বিচার করা চলে না। সাধারণ লোকেরা এই বেদনার প্রকৃতি জানে না বলিয়াই ইহাকে লঘু এবং দুঃখবিলাস বলিয়া মনে করে। প্রতিভাবানের এই দুঃখ কেবল ব্যক্তিগত সম্মান-অসম্মানের ব্যাপার নয়— ইহা দ্বারা তাঁহার কবিধর্ম, সাহিত্যিক সত্তা, প্রতিভার প্রকৃতি পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে থাকে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিবাদ করিলে তাহা কেবল আত্মপক্ষসমর্থন নয়, তাহা কবিধর্মকে রক্ষা। এই কবিধর্মকে রক্ষা করা যে উচিত মাত্র এমন নয়, না রক্ষা করা কবির পক্ষে অধর্ম।

মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ ও মিস্টার পিয়র্সন

নোবেল প্রাইজ লাভের আগে রবীন্দ্রনাথ যেবার বিলাত হইতে ফিরিলেন সেই সময় আসিলেন মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ ও মিস্টার পিয়র্সন। তখন তাঁহাদের তরুণ বয়স। দুইজনেই উচ্চশিক্ষিত, এ দেশে দুইজনেই উচ্চ বেতনে কাজ করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্বে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া শান্তিনিকেতনে যোগ দিবার জন্য পূর্বতন কর্ম পরিত্যাগ করেন।

হোমারের কাব্যানুবাদের উপরে কীট্‌স্‌-এর যে সনেটটি আছে সেটি পড়াইতে গিয়া মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে অপরিচিত নূতন জ্যোতিষ্ক ধরা দিলে সে যেমন অবাক্ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে, কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না, তেমনি বিস্ময় তাঁহার হইয়াছিল গীতাঞ্জলির অনুবাদ-পাঠ-শ্রবণে।

ইঁহারা দুইজনেই অনায়াস সম্ভ্রমের সঙ্গে আশ্রমের অনভ্যস্ত জীবনকে গ্রহণ করিলেন; কষ্ট যে হইত না এমন বলা চলে না, কিন্তু সেজন্য কখনো তাঁহাদের অপ্রসন্ন দেখি নাই। মহৎ কাজের সঙ্গে যদি বৃহৎ প্রশংসা থাকে, তবে কষ্ট বহন করা সুসহ হয়, কিন্তু কর্ম যেখানে মহৎ অথচ আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো আড়ম্বর নাই, আদর্শের প্রেরণা ছাড়া আর কোনো বেতন নাই, সেখানে কষ্ট সহ্য করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। এখানকার অধ্যাপনার মধ্যে কোনো বাহ্যিক বাহবা ছিল না, ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলির উপরে বাহিরের জগতের প্রশংসার জৌলুস ছিল না, তৎসত্ত্বেও ইঁহারা সবিনয়ে সগৌরবে এবং অকৃত্রিম আনন্দের সঙ্গে সমস্ত অনায়াসে বহন করিয়া আশ্রমের অঙ্গীভূত হইয়া গেলেন—ইহাকে সর্বাঙ্গীণ আত্মবিসর্জন বলা যাইতে পারে। বারম্বার উচ্চ বেতনের লোভনীয় কর্মে তাঁহাদের কাছে আমন্ত্রণ আসিয়াছে; তাঁহারা দ্বিধামাত্র না করিয়া সে-সব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আদর্শের দিকে ইঁহারা একপ্রাণ হইলেও, দুজনেরই চরিত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন সচল সক্রিয় প্রকৃতির লোক, আর পিয়র্সন ছিলেন শান্ত সমাহিত প্রকৃতির। দৌড়ধাপ, ছুটাছুটি, এদেশে বিদেশে গমন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, কর্মের জটিল গ্রন্থি-উন্মোচন, নানা বিষয়েই মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। মিস্টার পিয়র্সন সংকীর্ণতর পরিধির মধ্যে অভ্যস্ত ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলি পালনে এবং গৃহকোণে ছাত্র ও বান্ধবদের লইয়া শান্তির পরিমণ্ডলে বাস করিতে আনন্দ পাইতেন। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের পরবর্তী মানবপ্রেমোদ্‌বোধিত জীবন বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে! আজ ফিজিতে, কাল দক্ষিণ-আফ্রিকায়, পরশু দিল্লিতে, তার পরদিন অমৃতসরে, এমনি করিয়া আর্তত্রাণে তিনি ছুটিয়া বেড়াইতেন। মহাত্মাজীর প্রদত্ত দীনবন্ধু আখ্যা তাঁহাকে যেমন

সাজিত এমন আর কাহাকেও নয়। আর্তত্রাণের মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি ভাইস্‌রয় বা বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করিতেন। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কূট-নৈতিক জটিল জাল মোচন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার যেরূপ দক্ষতা ছিল, মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক-রূপে প্রচুর খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন। মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনিই ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করাইয়া দেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিলেন। কিন্তু কখনো এই দুইজনকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। যাঁহারা অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই ত্রয়ীমূর্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের চরিত্রের ভক্তি-প্রণোদিত আত্মবিলোপের মহিমা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন।

মিস্টার পিয়র্সনের চরিত্রেও আর্তত্রাণের সম্বেদন ছিল, কিন্তু তাহার গণ্ডি সংকীর্ণ। শান্তিনিকেতনের আশেপাশে যে-সব সাঁওতাল-পল্লী আছে সেখানে শিক্ষাপ্রসারে বা নৈশবিদ্যালয়-স্থাপনে তাঁহার অসীম উৎসাহ ছিল; নিজে গিয়া শিক্ষা দিতেন। আশ্রমের মধ্যেও যাহারা নগণ্য, অপরের দৃষ্টিতে যাহারা নাই, তাহাদের আদর ছিল মিস্টার পিয়র্সনের ঘরে।

একজন শান্ত সমাহিত গৃহাশ্রয়ী, আর-একজন বেগবান পরিভ্রমণশীল সক্রিয় প্রকৃতির। ইংরেজ জাতির চরিত্রে এই দুইটি রূপই বর্তমান। ইংরেজ তাহার গৃহকোণটি ভালোবাসে। বেড়া-দেওয়া বাগানের ধারে, পল্লীকুটিরের প্রান্তে, প্রাচীন ইংলণ্ডের কোণটি তাহার প্রিয়; ইহাই তাহার 'সুইট হোম'। আবার আর-এক দিকে সে দেশে বিদেশে সপ্তসমুদ্রে সক্রিয়ভাবে দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইঁহাদের চরিত্রে ইংরেজ জাতির এ-দুটি বৈশিষ্ট্য বেশ অনুভব করা যাইত। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজকে আমরা ভক্তি করিতাম, আর মিস্টার পিয়র্সনকে ভালোবাসিতাম।

মিস্টার পিয়র্সন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন বলিয়া তিনি বাংলা বেশ শিখিয়াছিলেন; গোরা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ তাঁহার কৃত। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ স্থায়ীভাবে বসিতে পারেন নাই বলিয়া বাংলা শেখা তাঁহার হয় নাই। শান্তিনিকেতনে থাকা কালে দুইজনেই ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরিতেন।

মিস্টার পিয়র্সন প্রথমে নূতন বাড়ির বড়ো ঘরটাতে থাকিতেন, আমরা পাশের ঘরগুলিতে থাকিতাম। তাঁহার ঘরের বারান্দায় চায়ের পেয়ালা-পিরিচ

সাজানো থাকিত। একদিন নেকড়ার বল খেলিতে গিয়া তাহার কতকগুলি ভাঙিয়া ফেলিলাম। কী করা যায়? গেলাম আমরা পিয়র্সনের কাছে। তখন সহজভাবে বলিবার মতো ইংরেজি শিখি নাই, তিনিও মাত্র দু-চারটা বাংলা কথা শিখিয়াছেন। ভাঙা ইংরেজিতে ও ভাঙা বাংলায় দোষজ্ঞাপন ও ক্ষমাপ্রাপ্তি সমাধা হইলে তিনি বলিলেন, চা খাইয়া যাইবে। লাভের মধ্যে সেদিন চা খাওয়া হইল; বলা বাহুল্য, ভাঙা পেয়ালায় চা খাইতে হয় নাই।

তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মাজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়র্সন রওনা হইয়া গেলেন। সেই প্রথম মহাত্মাজীর নাম শুনিলাম; তখন তো লোকে মহাত্মাজী বলিত না, বলিত মিস্টার গান্ধী।

মিস্টার পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা রওনা হইলেন, সে বোধ করি ১৯১৬ সালের কথা। এই সময় ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট তাঁহাকে আটক করিয়া রাখে এবং ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেয়। তিনি 'ফর্ ইণ্ডিয়া' নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের দাবি সমর্থন করিয়া একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

কয়েক বছর ইংলণ্ডে থাকিবার পরে পিয়র্সন আবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া যোগ দেন। এবারে তাঁহার এখানে স্থায়ী হইয়া বসিবার ইচ্ছা ছিল। কিছুকাল এখানে থাকিবার পরে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন; সেখানকার সাংসারিক ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিবেন, আশা ছিল। কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। ইটালিতে চলন্ত ট্রেন হইতে পড়িয়া গিয়া হাসপাতালে নবীন বয়সে এই স্বার্থত্যাগী পুরুষের জীবনান্ত ঘটে।

মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের আর্তত্রাণকর্মের পরিধি ইতিমধ্যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি স্থায়ীভাবে কোথাও থাকিতে পারিতেন না; শান্তিনিকেতন সবরমতী দিল্লি ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতেন। আবার ভারতবর্ষের বাহিরে গেলে অনেক দিন কাটিয়া যাইত। কিন্তু এই-সব কাজের ফাঁকে যখনই সময় পাইতেন শান্তিনিকেতনে আসিতেন। প্রায়ই শূন্য হাতে আসিতেন না, বন্ধুবান্ধবদের কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া টাকাকড়ি যাহা পাইতেন লইয়া আসিতেন।

একবার দেখিলাম, মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ আশ্রমের সাধারণ পাকশালায় খাইতে বসিয়াছেন। ব্যাপার কী? তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে অন্যত্র ছিলেন, কাজেই

তাঁহার পক্ষে ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আহারান্তে যে কয়খানা রুটি অবশিষ্ট ছিল, পকেটে করিয়া লইয়া গেলেন, বোধ করি বিকালে জলযোগ হইবে।

আর-একবার তাঁহার এক পায়ে ঘা হইয়াছিল; সে পায়ে জুতা পরিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্য পায়ের জুতা ছাড়িলেন না, এক পায়ে জুতা পরিয়া সারা আশ্রম ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে যখন আর হাঁটিতে পারিতেন না, আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন হইলে রিক্‌শ চড়িয়া আসিতেন। অনেক সময় মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ সেই রিক্‌শ টানিয়া লইয়া আসিতেন।

দিল্লির সেণ্ট্‌ স্টিফেন্‌স্‌ কলেজের প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র সাধুপুরুষ ছিলেন। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহার যোগস্থাপন করিয়া দেন। ইনি অনেক সময়ে এখানে আসিয়া কাটাইতেন।

পাঞ্জাবে ডায়ারি অত্যাচারের পরে যখন সেখানকার নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, পাঞ্জাবের মুখ বন্ধ, সে সময় মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ সর্বাগ্রে ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। তার পরে অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হইলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাহার সমর্থন আরম্ভ করেন। বহু শতাব্দীর লুণ্ঠনজাত পাপের ফলে ইংরেজজাতি যে এখনো টিকিয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ, সে দেশে এখনো মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের মতো সাধু ব্যক্তি আছেন বলিয়াই।

কলিকাতার হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস সর্বজনজ্ঞাত। একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, যেখানে একজন দেশপ্রেমিক ইংরেজ মরিতেছে সেখানেই নূতনতর ইংলণ্ডের সৃষ্টি হইতেছে। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের মতো ধর্মপ্রাণ মানবপ্রেমিকের দেহ যেখানেই মাটিতে মিশিতেছে সেখানেই সত্যতর জেরুজিলামের প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

মহাত্মাজী

মহাত্মাজী দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসা উঠাইয়া দিবার সময়ে চিন্তায় পড়িলেন, ভারতবর্ষে গিয়া কোথায় থাকিবেন! তাঁহার নিজের পরিবারটি তো শুধু নয়, সঙ্গে ফিনিক্স-আশ্রমের একদল ছাত্র আছে। মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে তাঁহার

আগেই পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় গান্ধী-আশ্রমের ছেলেদের শান্তিনিকেতনে আসা স্থির হইল।

মগনলাল গান্ধীর নেতৃত্বে ফিনিক্স্-আশ্রমের ছেলের দল শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিল। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, আমাদের জীবনযাত্রা খুব সরল, কিন্তু ইহাদের জীবনযাত্রার ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

'নূতন বাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িটা তাহাদের বাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহাদের সেবার জন্য চাকর-বাকর কেহ ছিল না, নিজেরাই সব কাজ করিত। রান্নার জন্য আলাদা লোকও ছিল না। বলা বাহুল্য, তাহারা মাছমাংস খাইত না, খাদ্যে কোনো মসলা এমন-কি, লবণও ব্যবহার করিত না।

অনেকেই আশ্রমের ক্লাসে যোগদান করিল; কাজেই আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক সুযোগ ছিল।

এই দলের সঙ্গে মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ আসেন নাই। তাঁহারা দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে যান, সেখানে কিছুকাল থাকিয়া ভারতবর্ষে রওনা হন।

একদিন খবর আসিল, মহাত্মাজী সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতা হইতে বোলপুরে পৌঁছিবেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আশ্রমের প্রবেশপথে একটি তোরণ নির্মিত হইল; আমরা সকলে বোলপুর স্টেশনে গেলাম।

মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ ট্রেন হইতে নামিলেন। মহাত্মাজী তখন কাথিওয়াড়ী জামা ধুতি ও পাগড়ি পরিতেন। তাঁহার চেহারার মধ্যে সব চেয়ে বেশি নজরে পড়িল, কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর। যিনি একটিও বৃথা কথা বলেন না, জীবনে যিনি একটিও মিথ্যা কথা বলেন নাই, ঐ কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর যেন সেই সংযত জীবনের প্রতীক।

এই প্রথম বারে অল্প কয়েক দিন মাত্র তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেদিন সকালবেলায় একটি কাঁঠাল গাছের তলায় মিস্টার পিয়র্সনের কাছে আমাদের ইংরেজি ক্লাস চলিতেছিল, এমন সময় মহাত্মাজী একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া পিয়র্সনকে বলিলেন, মিস্টার গোখলে পরলোকগমন করিয়াছেন। তখন আমরা মিস্টার গোখলের নাম শুনি নাই। সেইদিন বিকালেই মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ বর্ধমানের পথে বোম্বাই রওনা হইয়া গেলেন। তাঁহার ছাত্রদল আশ্রমেই রহিল।

যে অল্প কয়দিন মাত্র তিনি আশ্রমে ছিলেন আশ্রমজীবনে বিপ্লব ঘটাইয়া দিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

তিনি বলিলেন, আশ্রমের জীবনযাত্রা আরো সরল করা দরকার, ছেলেদের আরো বেশি স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। ছেলেদের সেবার জন্য চাকর ও পাচক থাকিবে, ইহা তাঁহার পছন্দ হইল না; চাকর ও পাচকের কাজও কেন ছেলেরা না করিবে? আমবাগানে একদিন সভা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়া বলিলেন। অনেকে রাজি হইলেন, অনেকে তর্ক করিলেন। কিন্তু যুক্তির জোরের চেয়ে ব্যক্তিত্বের বেগ অনেক বেশি প্রবল, ফলে স্থির হইল এখন হইতে সব কাজই ছেলেরা নিজেরা করিবে— রান্না, বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, জল তোলা প্রভৃতি কোনো কাজের জন্য সেবকের উপরে নির্ভর করিতে হইবে না। মহাত্মাজী নিজের ছাত্রদের জন্য পায়খানা-পরিষ্কারের কাজটি চাহিয়া লইলেন।

এই ব্যবস্থার ফলে আশ্রমে ছাত্রজীবনের সত্যযুগ আরম্ভ হইয়া গেল। সব কাজই ছেলেরা আরম্ভ করিল এবং এই-সব অত্যাবশ্যক কাজের চাপে পড়াশুনার অবান্তর উপলক্ষটা যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল তাহা আর নজরে পড়িল না। ক্লাসের ঘণ্টা নিয়মিত বাজে, কিন্তু ক্লাসে ছাত্র জোটে না। শিক্ষক যদি জিজ্ঞাসা করেন, বলিলেই হইল, বাসন মাজিতেছে বা মসলা বাটিতেছে। খুব বেশি তাড়া দিলে তাড়াতাড়ি এক গেলাস তেঁতুলের শরবত সম্মুখে ধরিলেই হইল, তাঁহার উগ্র মেজাজ অচিরাৎ স্নিগ্ধ হইয়া আসিত।

দিনে রাতে দুবার জলযোগ ও দুবার রান্নার ব্যাপারে সত্যই সময় করিয়া ওঠা কঠিন ছিল, তার উপরে আবার রান্নাঘর ধোওয়া, বাসন মাজা আছে। বাঙালির রান্না আবার উপকরণবহুল, কাজেই সময় আরো কিছু বেশি লাগিত। কিন্তু, মোটের উপর ক্লাসের পড়ার চেয়ে রান্নাঘরের কাজ আমাদের কাছে অনেক সুখকর ছিল। একজন ছেলে তাহার মাকে এই সুসংবাদ জানাইয়া লিখিল, "এখন আমরা রান্না শিখিতেছি।" তাহার মা উত্তরে লিখিলেন, "রান্না শেখাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার মাস্টারদের চেয়ে আমি ভালো রান্না শিখাইতে পারিব, অতএব চলিয়া আসিবে।" অনেক মাতার এবং পিতার ইহাই মত ছিল, কাজেই ছাত্রসংখ্যা কমিতে আরম্ভ করিল। ফাল্গুন মাস হইতে গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত এই নূতন 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌' আশ্রমে চলিল; ছুটির পরে আবার ভৃত্য পাচক নিযুক্ত হইল।

যেদিনে এই নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হয় সেই দিনটিকে এখনো শান্তিনিকেতনের ছেলেরা গান্ধীতিথি নামে পালন করে। সেদিনকার রান্না ও যাবতীয় কাজ তাহারা এখনো নিজের হাতে করিয়া থাকে।

যতদূর মনে পড়িতেছে, ছুটির সময়ে গান্ধী-আশ্রমের ছেলেরা আমেদাবাদে চলিয়া গেল। শান্তিনিকেতনে এই নূতন পরীক্ষার কথা মহাত্মাজীর আত্মজীবনীতে আছে।

ইহার পরেও অনেকবার মহাত্মাজী আশ্রমে আসিয়াছেন; কিন্তু তখন তিনি মহাত্মা নামে ভারতবর্ষের কাছে পরিচিত হইয়াছেন, সে-সব কথা এখন সকলেরই পরিজ্ঞাত। প্রথমবারের আশ্রমবাসে শান্তিনিকেতনে যে বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছিলেন এখন তাহার ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী হইয়া সারা ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের কাছে পরিচিত হইবার আগে, আমরা তাঁহার সেই পরীক্ষা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-পল্লীর দক্ষিণ দিকের একটি বাড়িতে বাস করিতেন, এই বাড়িটির নাম নিচুবাংলা। প্রাচীন আমলকী মহুয়া শাল আম-বাগানের মধ্যে এই বাংলা-বাড়ি অবস্থিত। মুচুকুন্দ চাঁপা নাগকেশর এবং আরো অনেক দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ বিভিন্ন ঋতুতে এখানকার বাতাস সুরভিত করিয়া রাখিত। এই নির্জন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ আশ্রমে বর্ষীয়ান দার্শনিক লেখাপড়া লইয়া কাল কাটাইতেন। মানুষ এখানে অল্পই যাতায়াত করিত। কিন্তু, দার্শনিকের সঙ্গীর অভাব ছিল না। গাছ হইতে কাঠবিড়ালিরা নামিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে সমবেত হইত, খাদ্যকণা খুঁটিয়া খাইত, পাখির দল তাঁহার চারি দিকে জটলা করিত, শালিখ আসিয়া তাঁহার চেয়ারের হাতলের উপর বসিত— ইহাদের জন্য নিয়মিত খাদ্যের বরাদ্দ ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ তাঁহাদের অনেকে তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেন; আর তাঁহার সঙ্গী ছিল প্রিয় ভৃত্য মুনীশ্বর। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের তপোবন দেখি নাই, তবে সে তপোবন যে অনেকটা এইরূপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতে এখানে বাস করিতেন, এখানেই ১৯২৬ সালে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

তাঁহার আশ্রমটিকে তপোবনের অনুরূপ বলিলে তাঁহাকে প্রাচীন ঋষিদের মূর্তি বলা যাইতে পারে। তাঁহার চরিত্রে শৈশবের সরলতা ও পরিণত বয়সের শান্তি যেন মিলিত হইয়াছিল। এখানে সারাদিন তিনি লেখাপড়া অঙ্ক-কষা ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা লইয়া থাকিতেন— আর, তাঁহার এক বাতিক ছিল কাগজের বাক্স তৈরি করা। মাঝে মাঝে তিনি আশ্রমে বেড়াইতে আসিতেন। যখন হাঁটিতে পারিতেন না তখন রিকৃশ চড়িয়া আসিতেন, এইজন্য তাঁহার একখানি রিকৃশ ছিল। শেষের দিকে আর রিকৃশ চড়িয়াও আসিতে পারিতেন না। শরীর তাঁহার অপারগ হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মন শেষ পর্যন্ত সক্রিয় সতেজ ছিল।

বিধাতা জন্মকাল হইতেই তাঁহাকে দার্শনিকের ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িয়াছিলেন। দার্শনিকের জ্ঞানানুরাগ ও সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা দুইই তাঁহাতে সমমাত্রায় ছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণ দিকের অংশে যেখানে তিনি থাকিতেন সেখানেও আশ্রমের একটি আবহাওয়া বিরাজ করিত।

তিনি দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন, বলা বাহুল্য সব সময়ে মনোপযোগী শ্রোতা পাওয়া যাইত না। কোনো একটি দীর্ঘ দুরূহ রচনা শেষ হইলে আশে-পাশের লোক সরিয়া পড়িত। এ অসুবিধা যে কেবল একা তাঁহার ছিল তাহা নহে, ঋষিরা যেদিন নূতন রচনা শেষ করিতেন সেদিনও তপোবনের অধিবাসীরা নিশ্চয় স্থানান্তরে গমন করিত। একবার তিনি একটা প্রবন্ধ শেষ করিয়া শ্রোতা না পাইয়া নিজের চাকরটাকে ধরিয়া আগাগোড়া শুনাইয়া দিলেন, তার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হইয়াছে।" চাকরটি বলিল, "আজ্ঞে, কর্তা, বড়ো খাসা হইয়াছে।" সেই হইতে তাঁহার ধারণা জন্মিয়া গেল, আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেদেরও দুরূহ তত্ত্ব বুঝিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

আর-একবার এক ভদ্রলোক তাঁহার হঠাৎ-শ্রোতা হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার রচনা শুনিয়া যাইতেন। বহুদূর হইতে তাঁহাকে হাঁটিয়া আসিতে হয় শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজের জুড়িগাড়িখানি দিলেন। তার পর হইতে সেই ভদ্রলোক বা উক্ত জুড়িগাড়ি আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। এ-সব তাঁহার জোড়াসাঁকোতে বাসকালের কথা। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ চরিত্রের মূল হয়তো বা দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্র।

নিচুবাংলায় থাকা-কালে একদিন হঠাৎ তাঁহার কানে গেল মুনীশ্বর কেন

কাহাকে লুচি-ভাজা ঘিয়ের কথা বলিতেছে। শুনিয়া তিনি বিষম রাগিয়া গেলেন। চাকরকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আজকাল বিলাসিতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে! ঘি দিয়ে লুচি ভাজা অত্যন্ত অন্যায়।"

তার পরে বলিলেন, "আমরা ছেলেবেলায় বরাবর দেখেছি, জল দিয়ে লুচি ভাজা হয়।"

মুনীশ্বর তাহার প্রভুকে জানিত; সে বলিল, "কর্তা, লুচি বরাবর ঘি দিয়েই ভাজা হয়। ঘি গলিয়া গেলে জলের মতোই দেখিতে হয় বটে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাটা মনে লাগিল; তিনি বলিলেন, "তাই বল্‌, ঘি গ'লে গেলে তো জলের মতোই হয় বটে। আজ আমার একটা নতুন শিক্ষা হল।" তার পরে সে কী অট্টহাসি! তাঁহার আকাশ উচ্চকিত করিয়া হাসিবার অভ্যাস ছিল। মানুষ আর-সব মনোভাবের নকল করিতে পারে, কিন্তু হাসিতে তাহার আসল রূপটি ধরা পড়িয়া যায়।

শান্তিনিকেতনের মাঠে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বেশি। প্রায়ই কালবৈশাখী ঝড় হইয়া টিনের ঘর বা চালাবাড়ির ছাউনি উড়াইয়া ফেলিয়া ক্ষতি করিত। একবার এইরকম ক্ষতিকর কালবৈশাখী ঝড়ের পরেই তিনি দিনেন্দ্রনাথের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন, জগদানন্দবাবু ছিলেন, আরো দু-চারজনের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জগদানন্দ, কালবৈশাখীর ক্ষতি থেকে বাঁচবার একটা বুদ্ধি এসেছে, আর কোনো ভয় নেই।"

জগদানন্দবাবু বলিলেন, "বলুন কী করতে হবে।"

তিনি বলিলেন, "পশ্চিম-উত্তর কোণ থেকে ঝড় আসে, এক কাজ করো— ঐ দিকে প্রকাণ্ড এক উঁচু প্রাচীর তুলে দাও। না না, এ অসম্ভব মনে কোরো না। চীনের প্রাচীরের কথা পড়েছ তো? পনেরো-শো মাইল লম্বা। আর, এইটুকু তোমরা পারবে না? এতে আর-এক সুবিধা আছে, প্রাচীরে যেমন ঝড় আটকাবে, তেমনি প্রাচীরের মাটি তুলে যে দিঘি হবে, তাতে তোমাদের জলকষ্টও দূর হবে— এক ঢিলে দেখো দুই পাখি মরল।" এই বলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

তার পরে বলিলেন, "আর দেরি নয়, কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করো।"

জগদানন্দবাবু বলিলেন, "এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। তবে কিনা গুরুদেব

এখন এখানে নেই। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।”

দ্বিজেন্দ্রনাথ এমন শুভ প্রস্তাবের বিলম্ব-আশঙ্কায় অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না, রবিকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার কী? তিনি এ প্রস্তাবে কেন আপত্তি করতে যাবেন? আর দেরি নয়, কাল সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করো।”

জগদানন্দবাবুকে স্বীকার করিতে হইল, কাল সকাল হইতেই কাজ আরম্ভ হইবে।

ঝড় বন্ধ ও জলকষ্ট দূর হইবে, ইহা নিশ্চয় জানায় সান্ত্বনা লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ফিরিয়া গেলেন।

মহাত্মা গান্ধী প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যান। ইতিপূর্বে তিনি অ্যাণ্ড্রুজের কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিষয় শুনিয়াছিলেন। তাঁহার সরল জীবনযাত্রা দেখিয়া মহাত্মাজী বিস্মিত হন; তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতীয় জ্ঞানীপুরুষের যে আদর্শ তাঁহার মনে ছিল, এতদিনে দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার জীবন্তরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথও গান্ধীজীকে দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি বলিয়াছিলেন, এইরকম মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন, এতদিনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন, এখন আর দেশের কোনো চিন্তা নাই।

মহাত্মাজী ও মিস্টার অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথকে ‘বড়দাদা’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে দ্বিজেন্দ্রনাথের আনন্দের অবধি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিককে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিল; স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ এমনি একজন সাহিত্যিক। তাঁহার সাহিত্য-জীবন স্মরণ করিলে কোল্‌রিজের কথা মনে পড়িয়া যায়। কোল্‌রিজের মতোই তিনি যৌবনে কাব্যরচনা ও পরিণত বয়সে দর্শন-আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ স্বপ্নপ্রয়াণে কোল্‌রিজের কাব্যের গুণ যেন অনেক পরিমাণে আছে, কারণ কোল্‌রিজের সব কাব্যই এক হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণ।

মেঘনাদবধকাব্য ছাড়িয়া দিলে স্বপ্নপ্রয়াণকে দীর্ঘ বাংলাকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে যখন মহাকাব্য রচনার ধুম পড়িয়াছিল, যখন যে আর কিছু পারিত না সে অন্তত একখানা মহাকাব্য রচনা করিত, স্বপ্নপ্রয়াণ সেই সময়েই রচিত। অথচ সেই-সব মহা-অকাব্য হইতে স্বপ্নপ্রয়াণের কত প্রভেদ! এই মহাকাব্য মানবজীবনের রূপক। ইহার ছন্দ ও টেক্‌নিক হইতে বক্তব্য পর্যন্ত সমস্তই নূতনত্বের আভায় উজ্জ্বল। ইহা যে এখন পর্যন্ত অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে তাহা বাঙালি পাঠকের রসবোধেরই অভাব সূচনা করে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। এক দিকে তাহাতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নাই তেমনি আর-এক দিকে তাহা প্রতিভাবত্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাব হইতেও মুক্ত। এ গদ্যরীতি একেবারে তাঁহার নিজস্ব। যে মন লজিক ও কল্পনার সমাবেশে গঠিত, এ গদ্যরীতি তাহারই সৃষ্টি। নবদ্বীপের প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ কোনো মনীষী গদ্য রচনা করিলে এই-জাতীয় গদ্য লিখিতে পারিতেন। বাংলা গদ্যের যে-কয়টি বিশিষ্ট রীতি আছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য তাহাদের অন্যতম। তাঁহার গীতাপাঠ গ্রন্থ গদ্যরীতি ও তত্ত্বের হিসাবে বাংলাসাহিত্যের উচ্চতম শ্রেণীর গ্রন্থ।

ছিয়াশি বৎসর বয়সে সামান্য রোগভোগের পরে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যখন আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া শ্মশানে নীত হইতেছিল তখন সেই প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃত্যুর কোনো চিহ্ন ছিল না। কে বলিবে ইহা মৃত্যু! সারা-জীবন যে শিশু তিনি ছিলেন ঐ মুখমণ্ডলে যেন সেই শৈশবেরই চরম সরলতা। মহা-পুরুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদ যে এত সূক্ষ্ম তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। সব চেয়ে আমার বেশি করিয়া মনে আছে তাঁহার মুখের সেই শেষমুহূর্তের পরমা শান্তি।

দ্বিপেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দোতালা বাড়ির নীচের তলায় বাস করিতেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহার যোগ গোড়া হইতে। মহর্ষি যখন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিচালনার জন্য ট্রাস্ট্‌ সৃষ্টি করেন দ্বিপেন্দ্রনাথ অন্যতম ট্রাস্‌টী ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম দিকে তাঁহার হাতে পরিচালনার নানা ভার ছিল।

আমরা যখন তাঁহাকে প্রথম দেখি তখন তিনি বাতে পঙ্গুপ্রায়; বেশি চলাফেরা করিতে পারিতেন না, সারাদিন একরকম বসিয়াই কাটাইতেন। এই দোতালা বাড়ির উত্তর দিকের বারান্দায় আসর জমাইয়া বসিয়া থাকিতেন। তিনি খুব মজলিসী লোক ছিলেন, গল্পগুজব করিতে ভালোবাসিতেন। প্রায়ই দেখিতাম, নেপালবাবু ক্ষিতিমোহনবাবু জগদানন্দবাবুকে ডাকিয়া লইয়া তিনি আসর জমাইয়া গল্পগুজব করিতেছেন।

আমরা ছোটোরা কিন্তু তাঁহাকে বড়ো ভয় করিতাম। তাঁহার বিরাট চেহারা, বড়ো বড়ো চোখ, কুণ্ডলীকৃত-আলবোলার নল, অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ, কিছুতেই বড়ো ভরসা দিত না; বিশেষ যখন গম্ভীর উচ্চস্বরে 'বয়' বলিয়া ডাক দিতেন তখন থরহরি হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

যৌবনে তাঁহার বিলাত গিয়া বারিস্টর হইয়া আসিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রে জাহাজ ডোবে এই তথ্য-শ্রবণে তাঁহার আর বিলাত যাওয়া হয় নাই।

তিনি বিকালবেলা জুড়িগাড়ি চড়িয়া বোলপুর শহরে বেড়াইতে যাইতেন। ঘোড়ার মাথার উপরে বাল্‌বে বিদ্যুতের আলো জ্বলিত। একদিন খবরের কাগজে দেখিলেন কোথায় যেন ঘোড়ার গাড়ি উল্টাইয়া গিয়াছে, সেইদিনই ঘোড়ার গাড়ি পরিত্যাগ করিয়া মোটর ধরিলেন। কিছুদিন পরে কাহার কাছে যেন মোটর-দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া মোটর ছাড়িয়া গোরুর গাড়ি ধরিলেন। কয়েকদিন পরে গোরুর গাড়িতে কোথায় বিপদ হইয়াছে শুনিয়া গোরুর গাড়িও ছাড়িলেন। ফলে কিছুকাল তাঁহার বৈকালিক ভ্রমণ বন্ধ রহিল। শেষে আবার ঘোড়ার গাড়ি ধরিলেন।

পাছে ঘোড়া জোর-কদমে চলিয়া বিপদ ঘটায় সেই ভয়ে ঘোড়া দুটিকে 'হাফ-রেশনে' রাখা হইত। আর তাঁহার শরৎ কোচ্‌ম্যান ঘোড়া দুটিকে নিরাপদ ভদ্রভাবে চলাফেরা শেখাইবার উদ্দেশ্যে সারাদিন সঙ্গে করিয়া হাঁটিত। দ্বিপেন্দ্রনাথ বারান্দায় বসিয়া অশ্বযুগলের এই সৌজন্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ করিতেন— হয়তো ইহারা আসলে ঘোড়া নয়, হয়তো ইহারা অশ্বিনীকুমারযুগল, ইন্দ্রকে রথ হইতে ফেলিয়া দিবার শাপে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শান্তিনিকেতনের বাগানে আম, লিচু, কলসা, পেয়ারা, তাল ও নারিকেলের গাছ দ্বিপেন্দ্রনাথের জিম্মায় ছিল। সে-সব গাছ হইতে ফল পাড়িবার উপায় ছিল

না। বাগানে কোনো ছেলেকে দেখিলে কিংবা শব্দ মাত্র শুনিলে তাঁহার 'বয়' ভৃত্য তাড়া করিয়া আসিত।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা কয়েকজন ওখানেই ছিলাম। তখন আমাদের কিছু বয়স হইয়াছে। আমি দুজন সঙ্গীকে প্রস্তাব করিলাম, "চলো, বাগান হইতে কচি তাল পাড়িয়া তালশাঁস খাওয়া যাক।" তাহাদের মুখ হইতে সমস্বরে বাহির হইল, "দ্বিপুবাবুর বাগান!" আর-কিছু তাহারা বলিতে পারিল না। আমি বুঝাইলাম, "তাহাতে ভয়টা কিসের? দ্বিপুবাবু তো নিজে ধরিতে আসিবেন না, আসিবে তাঁহার বয়, সে কিছু আমাদের গায়ে হাত তুলিবে না। যদি সত্যই বিপদ হয়, আমি প্রতিকার করিব। কিন্তু, লোকজন ছুটিয়া আসিলে যেন পালাইয়ো না, তাহা হইলে সব মাটি হইবে।"

আমরা তিনজনে গিয়া তো তাল গাছের তলে সমবেত হইলাম। একটি তাল পড়িয়াছে কি অমনি দ্বিপুবাবুর উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "বয়! বয়!" সঙ্গীরা তো পালাইবার মুখে। আমি বলিলাম, "না, পালানো চলিবে না।"

বয় আসিয়া বলিল, "বাবু আপনাদের ডাকছেন।"

আমি বলিলাম, "চলো।"

বয়ের ইচ্ছা যে আমরা পালাই, কিন্তু আমাদের সে ইচ্ছা নয়। দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছে নীত হইলে তিনি বলিলেন, "তোমরা কেন আমার বাগানে ফল পাড়তে এসেছিলে?"

আমি ভালোমানুষের মতো বলিলাম, "আজ্ঞে, কাছাকাছি আর কারো বাগান নেই এইজন্যে।"

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি যদি তোমার বাগানে ফল পাড়তে যেতাম, তা হলে কী করতে শুনি।"

আমি সবিনয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম, "এমন সৌভাগ্য যে আমার কখনো হবে তা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু, সত্যিই যদি যেতেন তা হলে কষ্ট করে আপনাকে নিজে পাড়তে দিতাম না। আপনাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে, নিজে পেড়ে এনে দিতাম।"

এমন উত্তর তিনি কখনো পান নাই। হাসিবেন কি রাগিবেন বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পরে বলিলেন, "ঠিক তাই করতে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, একবার দয়া করে গিয়ে দেখুন।"

তিনি কী ভাবিলেন জানি না। হয়তো ভাবিলেন, এমন অভদ্রতার যেখানে সম্ভাবনা আছে, কেবল কষ্ট করিয়া আড়াই-শো মাইল দূরের এক সুদূর গ্রামে গেলে আপনিই তালশাঁস হাতে চলিয়া আসিবে এমন আশ্বাস যেখানে নিশ্চিত, সেখানকার লোকের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করিবেন তিনি কোন্ প্রাণে?

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা বোসো।" আর, বয়কে বলিলেন লিচু ও তালশাঁস পাড়িয়া আনিতে।

সেদিন বিনা পরিশ্রমে প্রচুর ফলাহার হইল।

আমরা যাইবার কালে বলিলেন, "যেদিন তোমাদের ফল খেতে ইচ্ছা করবে, গাছের তলায় না গিয়ে একেবারে আমার কাছে এসো।" আর আমাকে বলিলেন, "দেখো বাপু, তুমি একটি কাজ কোরো, তোমার এই উত্তরটি আর কোনো ছেলেকে শিখিয়ে দিয়ো না।"

দ্বিপেন্দ্রনাথের মধ্যে ভীতিজনকত্ব যাহা কিছু তাহা কেবল তাঁহার চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে; মনটি কোমল ছিল।

দ্বিপুবাবুর আশ্রয়ে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব পোষ্য জুটিয়া যাইত। কোথা হইতে আসিত ঠিক নাই, কিছুকাল থাকিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইত। এমনি একটি অদ্ভুত পোষ্য ছিল মণিকবি। লোকটা অনেক দিন আশ্রমে ছিল, সকলের সঙ্গে তাহার বেশ মিল হইয়া গিয়াছিল, শেষে একদিন আবার কোথায় চলিয়া গেল। একটু বিস্তৃতভাবে তাহার কথা বলা যাইতে পারে।

একদিন দূর হইতে দেখিলাম, আমবাগানে ছেলেদের একটা ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার কী দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। একটু আগাইয়া জনতার ফাঁক দিয়া কোট-প্যাণ্টলুন-পরা একজন আগন্তুকের চেহারা দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, হয়তো ইন্‌কাম-ট্যাক্সের লোক হইবে। কিন্তু, লোকটা গান করে কেন? হয়তো ইন্‌কাম-ট্যাক্স্ আদায়ের এ এক নূতন ব্যবস্থা! কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে যেমন শিক্ষাকে সরস ও সরল করা হইয়াছে তেমনি হয়তো কিছু হইবে; হয়তো ইহা ইন্‌কাম-ট্যাক্সের কিণ্ডারগার্টেন? আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, লোকটার পায়ে জুতার ঠিক উপরে ঘুঙুর বাঁধা। ইন্‌কাম-ট্যাক্স্ থিয়োরিতে সন্দেহ জন্মিল। নাচিয়া গাহিয়া ইন্‌কাম-ট্যাক্স্ আদায় করা! গভর্মেণ্ট কি এমন সদাশয় হইবেন?

ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলাম, নৃত্য ও সংগীত থামিয়াছে; আর শুনিলাম,

লোকটা বলিতেছে, "আমি কবি, আমি একজন কবি!" আর, সঙ্গে সঙ্গে সে কী সলজ্জ সগর্ব সানন্দ হাসি! চৈত্রের মাঠ রৌদ্রে শুকাইয়া যেমন ফাটিয়া যায়, পাকা ফুটি যেমন চৌচির হইয়া পড়ে, তেমনি হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই গালে দুই কর্ণমূল পর্যন্ত অজস্র রেখাপাত হয় আর হাসির অজস্র ধারা সেই-সব সুগভীর খাত বাহিয়া তাহার মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়া শেষে দর্শকদের গায়েও যেন আসিয়া পড়ে; আমি কবি! আমি একজন কবি! তাহার কথায় যদি বা পুরা বিশ্বাস না হয়, সেই হাসি দেখিলে অবিশ্বাসের আর তিলমাত্র স্থান থাকে না।

তাহার বুকের উপরে একসার পদক আর বগলে একটি পুঁটুলি।

তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে সিউড়ির মেলায় গিয়াছিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত তাহার কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পদক ও সার্টিফিকেট দিয়াছেন; আর বলিয়া দিয়াছেন, তাহার মতো কবির একমাত্র স্থান স্বয়ং কবিগুরুর আশ্রম। তাই সে কবিকাম্য এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; নদী সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে, সুদ আসলের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

আমাদের স্তব্ধ বিস্ময় দেখিয়া সে বুঝিল, এতদিনে তাহার সমজদার শ্রোতা জুটিয়াছে। সে বগলের পুঁটুলিটা দেখাইয়া বলিল, "সব কবিতা! কত চান?" আর, তার পরেই সেই মাঠ-ফাটা ফুটি-ফাটা হাসি! যেন সূত্রের সঙ্গে ভাষ্য, যেন ঊর্ধ্বগামী ঘুড়ির সঙ্গে মাঞ্জা-ঘষা সুদীর্ঘ ভূলুণ্ঠিত সুতাটি। আমাদের বিস্ময়কে সে আজ থামিতে দিবে না পণ করিয়াছিল, তাই সে ময়লা প্যাণ্টলুনের মধ্যে ছেঁড়াজুতা-পরা ভাঙা-ঘুঙুর-জড়ানো শীর্ণ পা নাচাইয়া তালে তালে গাহিতে শুরু করিল:

রবীন্দ্র কবীন্দ্রের খ্যাতি বিশ্বময়।
দ্বিজেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র দিনেন্দ্রের জয়।

ঠাকুর-পরিবারের কাহাকেও বাদ দেয় নাই দেখিতেছি! সুরে, স্বরে, কাব্যে, নৃত্যে একেবারে চতুরঙ্গবাহিনী সাজাইয়া অগ্রসর হইতেছে; বাধা দেয় কাহার সাধ্য! সঙ্গে বাদ্য ছিল না বটে, কিন্তু বুকের উপরে পদকগুলা পরস্পরের মধ্যে আঘাত করিয়া খঞ্জনীসহযোগে অপূর্ব সংগত চালাইতেছিল। সমের কাছে আসিয়া এক পায়ের জুতার উপরে ভর দিয়া বোঁ করিয়া ঘুরিয়া লইল—সেই প্রয়াসে ধুতির পাড় দিয়া বাঁধা জুতার ফিতাটি যে ছিঁড়িয়া গেল তাহা কি

তাহার লক্ষ্য আছে! লোকটা থামিল বটে ; কিন্তু তখনো বুকের উপরে পদক-গুলি দুলিতেছিল, যেমন ঝড় থামিয়া গেলেও সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলন থামে না।

হাঁ, কবি বটে! এমন লোককে তো আমরা ছাড়িতে পারি না। গুরুসদয় দত্ত রসিক ব্যক্তি, তাই তিনি যোগ্যজনকে যথাযোগ্যস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। কবির অভ্যুদয় হইয়াছে শুনিয়া দ্বিপুবাবু লোকটাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সে দ্বিপুবাবুর পোষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল।

মণিকবি থাকে, খায়-দায়, কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই। আশ্রমের ছোটো বড়ো সকলকে সে কবিতা শুনাইয়াছে, প্রত্যেকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আদায় করিয়াছে, কেবল রবীন্দ্রনাথকে ধরিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে সে আসিয়া শুনাইয়া যায় "আজ কবীন্দ্রকে দূর হইতে দেখিলাম", "আজ তাঁহার গান শুনিলাম"। কিন্তু, হায়, প্রত্যক্ষভাবে সে তাঁহাকে আজও ধরিতে পারিল না। এ দিকে রবীন্দ্রনাথও সতর্ক হইয়া গিয়াছেন। কবিকে কবি ভয় না করিলে আর কে করিবে!

এইরূপে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে করিতে একদিন মণিকবির সুবর্ণ সুযোগ আসিল। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে বোলপুর স্টেশনে নামিবেন, এই সংবাদ কেমন করিয়া পাইয়া সে বোলপুর স্টেশনে গিয়া লুকাইয়া থাকিল। রবীন্দ্রনাথ যেমনি ট্রেন হইতে নামিবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন অমনি এক ছুটে মণিকবি তাঁহার সম্মুখে গিয়া গান ধরিল :

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের খ্যাতি বিশ্বময়।
দ্বিজেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র দিনেন্দ্রের জয়।

সেদিন আবার তাহার মাথায় এক ভাঙা সোলা-হ্যাট ছিল ; তাহা ছাড়া পায়ের ঘুঙুর, বুকের পদক, সব পূর্ববৎ!

রবীন্দ্রনাথ যতই বলেন "থাক্ থাক্, হয়েছে"—কে কার কথা শোনে! সে কী পদক-দোলিত ঘুঙুর-ধ্বনিত নৃত্য! স্টেশনের কুলি হইতে স্টেশন-মাস্টার অবধি শ্রোতা জুটিয়া গেল।

প্রশংসা করিলে লোকটা থামিতে পারে মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে!" আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। অমনি তাহার নৃত্য ও সংগীত উদ্দামতর হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আর কী করেন! আজ আর রক্ষা

নাই, দাঁড়াইয়া সব শুনিতেই হইল। মণিকবির সে কী কান-এঁঠো-করা হাসি! ভাবটা, এতদিনে তাহার সমজদার শ্রোতা জুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিস্পন্দ ও নির্বাক; মণিকবি উদ্দাম ও লক্ষবাক্! সাব্লাইম ও রিডিকুলাস্ এতদিন পরে সংযুক্ত হইল! রবীন্দ্রনাথ কোনোরকমে ছাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া মোটরে উঠিলেন। মণিকবি স্টেশনের আসর মাতাইয়া গান গাহিতে লাগিল।

বোলপুর স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার ছিলেন এক ভদ্রলোক, দেখিতে অনেকটা 'বোভ্রিল্'এর বিজ্ঞাপনস্থ ঠাকুরদাদাটির মতো। তিনি দু-চারদিন পরে আমাকে ধরিয়া বলিলেন, "আপনাদের কবি কিন্তু বেশ লেখে।"

আমি নির্বোধ; শুধাইলাম, "কোন্ কবি?"

"ঐ-যে সেদিন নেচে নেচে গান করে গেল। ঠাকুরমশায়ের কবিতা অবশ্যই ভালো, কিন্তু কী জানেন, আমরা বুঝতে পারি না। আর ঐ লোকটার কবিতা আগাগোড়া বুঝতে পারা যায়! চমৎকার লিখেছিল।"

মণিকবিরও সত্যকার সমজদার আছে!—'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!'

হঠাৎ একদিন মণিকবি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া গেল। ব্যাপার কী?

পরে শুনিলাম, কে একজন নাকি তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিল যে, তাহার কবিত্বের খ্যাতি বড়োলাট পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে। তিনি তাহার কবিত্বে এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাহার মাথার খুলির মধ্যে কোন্ কোন্ বস্তুর রাসায়নিক সংযোগে এমন অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তাহার মুণ্ডটি কাটিয়া পরীক্ষা করিবার হুকুম করিয়াছেন। মণিকবি ভীত বিস্ময়ে বলিল, "তা হলে যে আমি মারা যাব!"

সে বলিল, "সে আপনার ইচ্ছা। মুণ্ডু কাটার পরেও যদি আপনি বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করেন তো থাকতে পারেন, তাহাতে আর বড়োলাটের আপত্তি কী!"

মণিকবি অনেক ভাবিয়া দেখিল, মুণ্ডু কাটার পরে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা বোধ করি সম্ভব হইবে না। তখন সে নিজের মুণ্ডটিকে বাঁচাইবার জন্য স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত মনে করিল। অমরতা মানুষ অবশ্যই প্রার্থনা করে, কিন্তু সেজন্য কেহই মরিতে রাজি নয়।

কয়েকজন অধ্যাপক

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই প্রাদেশিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, দু-একজনকে নিখিলভারতীয় খ্যাতির অধিকারী বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই লক্ষ্য করিবার মতো একটি বিষয় আছে যে, এখানে না আসিলে তাঁহাদের শক্তির স্ফূর্তি যেন কিছুতেই হইত না, জীবনের গতিই যেন অন্যরকম হইত। শক্তি তাঁহাদের নিজের, সেই শক্তির উদ্‌বোধন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে, সেই শক্তির বিকাশ আশ্রমের অনুকূল আবহাওয়ায়।

লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, শান্তিনিকেতনের চল্লিশ বৎসরের জীবনে সেখানকার কোন্‌ ছাত্র বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, তখন ইঁহাদের নাম করা যাইতে পারে। যদিচ প্রত্যক্ষত ইঁহারা শান্তিনিকেতনের ছাত্র নন, তবু এখানকার জল হাওয়া মাটি ও রৌদ্রের গুণেই ইঁহাদের শক্তির বিকাশ; কাজেই তাহার খানিকটা গৌরব শান্তিনিকেতনও দাবি করিতে পারে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি প্রীতি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতনে টানিয়া আনে; রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাহার সঙ্গে যুক্ত হয় রবীন্দ্রভক্তি। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তির টানা-পোড়েনে অজিতকুমারের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক প্রাক্‌-নোবেল-পুরস্কার যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া দেশের লোকের কাছে অকুণ্ঠিতভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন অজিতকুমার তাঁহাদের অন্যতম। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক হিসাবে তাঁহার স্থান বাঙালি লেখকদের মধ্যে সর্বোচ্চ। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা ছাড়াও বৈদেশিক অনেক লেখকের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের তিনি প্রথম পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রামাণিক একখানি জীবনচরিতও তিনি রচনা করেন।

বি. এ. পাস করিয়া উচ্চতর পরীক্ষা-পাসের আশা ছাড়িয়া দিয়া অজিতবাবু অতি সামান্য বেতনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া যোগ দেন। শান্তিনিকেতন তখন অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজে সুগায়ক ও সু-অভিনেতা ছিলেন। আশ্রম-

জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল।

নীচের ক্লাসে তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াইতেন। তখন পড়াশুনায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না কাজেই আমি বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারি নাই। বিশেষ, ব্যাকরণ চিরকালই আমার কাছে ভয়ের কারণ; তিনি ইংরেজি ব্যাকরণ পড়াইবার সময় যখন শব্দবিশেষ কোন্ পার্ট অব্ স্পীচ্ জিজ্ঞাসা করিতেন তখন আমার নিরুত্তর হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তিরস্কার বা পুরস্কার কোনোরূপ উত্তেজনাই আমাকে উৎসাহিত করিতে পারিত না। ফলে অনেক জিনিসের মতোই ব্যাকরণেও আমি কাঁচা রহিয়া গিয়াছি; পার্ট্স্ অব্ স্পীচ্-এর প্রশ্নে আজও আমার সেদিনের মতো নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় দেখি না।

অজিতবাবু শুধু যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রবাণীর দোভাষীর কাজ করিতেন এমন নয়, আশ্রমের অধিবাসীদের কাছেও তিনি রবীন্দ্রবাণীর যেন দোভাষী ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায়, তাহার মর্মোদ্‌ঘাটনে, তাঁহার সাহায্য অপরিহার্য ছিল— অনেক সময়ে আমার তো মনে হইত ছাত্রদের চেয়ে বয়স্ক অধিবাসীদের উপরেই তাঁহার প্রভাব বেশি কার্যকর হইয়াছিল।

শেষের দিকে তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যান। ১৩২৫ সালের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎকুমার রায়

শরৎকুমার রায় ছিলেন বরিশাল জেলার লোক, অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের হাতে-গড়া মানুষ। কালো, বেঁটে, মোটা, ঝাঁকড়া গোঁফ; পরনে থান ধুতি আর পাঞ্জাবি; গলার স্বর যেমন স্পষ্ট তেমনি স্পষ্টবাদী প্রকৃতি; মনে মুখে কাজে একেবারে ষোলো আনা খাঁটি।

শরৎবাবু অঙ্ক ইতিহাস বাংলা পড়াইতেন। তাঁহার অঙ্কের ক্লাস আমাদের পক্ষে ভীতিজনক ছিল; কারণ বিয়োগ অঙ্ক কষিতে গিয়া প্রায়ই ফল দুই রাশির যোগফলের চেয়েও অধিক হইয়া যাইত, এমন ছিল আমার বিদ্যা; এবং তাহার ফল আমার পক্ষে স্বাদু নিশ্চয় হইত না।

ক্লাসের কাজ ছাড়া তাঁহার আর-এক কাজ ছিল পাকশালার অধ্যক্ষতা। পাকশালার এক পাশে তাঁহার চায়ের আসর জমিত; অধ্যাপকগণ অনেকেই যোগ দিতেন, ছাত্রদের মধ্যে বাড়িতে যাহাদের চা-পানের অভ্যাস ছিল তাহারাও

আশেপাশে ঘোরাফেরা করিত, কখনো কখনো এক-আধ পেয়ালা পাইত। সাধারণ নিয়মে ছাত্রদের চা-পানের ব্যবস্থা ছিল না।

শরৎবাবু শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন; তখনো তাঁহার পটলডাঙার বাসায় বৈকালিক চায়ের মজলিসে অনেক প্রাক্তন ছাত্র আসিয়া জুটিত। ছাত্রদের স্নেহের দ্বারা কাছে টানিবার স্বাভাবিক শক্তি তাঁহার ছিল।

শরৎবাবু ভালো বাংলা লিখিতেন। অনেকগুলি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিকে তাঁহার তত নজর ছিল না; বক্তব্যটুকু একাগ্রভাবে, স্পষ্টভাবে, নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও প্রধান গুণ ছিল। কিছুকাল তিনি সঞ্জীবনী পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। বছর-দশেক আগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কালীমোহন ঘোষ

কালীমোহন ঘোষ ছিলেন চাঁদপুরের লোক, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের ফলে সরকারের বিষ-নজরে পড়িয়া অবশেষে শান্তিনিকেতনে আসিয়া যোগ দেন। তখনকার দিনে সরকার-কর্তৃক নিগৃহীত বহু ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে ছিলেন— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে এইরকম একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা এখনকার অনেকেই জানেন না।

প্রথমে কালীমোহনবাবু শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার পরে শ্রীনিকেতন পল্লী-উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে সেখানকার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বস্তুত, এ দুই কাজের স্বরূপ ভিন্ন নয়। শিশুরা যেমন অসহায় আমাদের দেশের গ্রামের লোকও তেমনি অসহায়। শিশুদের মতোই তাহারা নিজেদের ভালোমন্দ বোঝে না; তাহাদের দেখিবার কেহ নাই, তাহারা একান্ত নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়। শিক্ষিতসমাজ তাহাদের ত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভগবানও যেন তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন। সত্যকার দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একই ভাবের ভিন্ন বিকাশ মাত্র; একটি শিশুচর্যা-প্রতিষ্ঠান, আর একটি বয়স্ক-শিশুচর্যার স্থান।

যৌবনকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসীদের উন্নয়ন সম্বন্ধে সজাগ। প্রথমে তাঁহার চিন্তা কেবল রচনাতেই আবদ্ধ ছিল, পরে পাবনা-রাজশাহীর নিজ জমিদারির মধ্যে চিন্তাকে কর্মে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে সেই

চিন্তা ও চেষ্টার অভিজ্ঞতা -প্রসূত প্রতিষ্ঠান স্থরুলের শ্রীনিকেতন-পল্লী-উন্নয়ন-সমাজ। শ্রীনিকেতন তাঁহার অভিজ্ঞতার তৃতীয় এবং শেষ ধাপ; পূর্ববর্তী দুইটি ধাপ এই বিষয়ের সূচনা এবং নিজের জমিদারিতে ইহার প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠানকে অনেকে গৌণ মনে করেন, কিন্তু বস্তুত সেরূপ মনে করিবার কারণ নাই; শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন পরস্পর পরিপূরক; শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া দেশের মধ্যে শিকড় সঞ্চালন করিয়া দিয়া যাহা ব্যক্তিগত তাহাকে দেশগত করিয়া তুলিবে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের প্রসারিত বাহুদ্বয়ের আলিঙ্গনে সমগ্র দেশ ধরা দিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কালীমোহনবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পুরুষ। তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, নিরক্ষর নিঃসহায় গ্রামের লোকেদের অনায়াসে তিনি কাছে টানিতে পারিতেন। এ এক রকমের প্রতিভা। কালীমোহনবাবুর মতো কর্মী না পাইলে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পল্লী-উন্নয়ন-ব্যবস্থা এত অল্প সময়ে এমন সার্থকতা লাভ করিত কি না সন্দেহ।

কালীমোহনবাবুর আর-একটি গুণ ছিল বাগ্মিতাশক্তি। বলিতে কহিতে অনেকেই পারেন, কিন্তু বাগ্মিতা বিরল গুণ। স্বরবিন্যাসের মধ্যে ঠিক কোথায় মূর্ছনাটি দিলে শ্রোতার মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিবে এবং অকস্মাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে, অনেক সময়েই তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সহানুভূতি বক্তার করতলগত হইয়া পড়িবে, ইহা জানা সহজ শক্তি নয়। কালীমোহনবাবুর এই বাগ্মিতাশক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল, আর এই শক্তিটার জন্য পল্লী-উন্নয়নের দুরূহ কাজ তাঁহার পক্ষে সহজ হইতে পারিয়াছিল। এই শিশুর মতো সরলপ্রাণ ব্যক্তিরও কয়েক বছর হইল মৃত্যু হইয়াছে।

জগদানন্দ রায়

জগদানন্দবাবু প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে কাজ করিতেন, তার পরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে যে কয়জন শিক্ষক কাজে যোগ দেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা জগদানন্দবাবুর চেহারা বা স্নেহময় ব্যবহার কখনো ভুলিতে পারিবে না। আজও আমার বেশ মনে পড়ে, ধুতির কোঁচাখানি কাঁধের

উপরে ফেলিয়া, এক-জোড়া চটি পায়ে, অর্ধদগ্ধ একটা চুরুট মুখে জগদানন্দবাবু রান্নাঘরের পাশের তরকারির বাগান তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন। তরকারি-বাগানের তরমুজের প্রতি যে-সব ছাত্রদের লোভ ছিল তাহারা দূর হইতে ঐ চুরুটের গন্ধে সাবধান হইয়া যাইত; বুঝিতে পারিত, এখন ও দিকে যাওয়া চলিবে না।

আবার মনে পড়ে গণিতের ক্লাসে অনেকক্ষণ আমাদের নীরব দেখিয়া ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছেন; এক-একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু পাছে চোখোচোখি হইয়া যায় আমরা ঘাড় হেঁট করিয়া আঁক কষিতেছি, অর্থাৎ খাতায় আঁকজোঁক টানিতেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ক্লাসে না গেলেও আর চঞ্চল হইতেন না; বলিতেন, শালগ্রামের ওঠা বসা দুইই সমান।

জগদানন্দবাবু জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করিতেন, অন্ধকার রাত্রে মাঠের মধ্যে তারা চিনিয়া বেড়াইতেন— চুরুটের দীপ্তিতে ও গন্ধে আমরা তাঁহার গতিবিধি বুঝিতে পারিতাম।

আবার, যখন তিনি শারদোৎসব নাটকের অভ্যাসের সময়ে লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় ঠাকুরদাদার বালখিল্যদলকে তাড়াইতে তাড়াইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন তখন কাহারো পক্ষে হাস্য সংবরণ করা সম্ভব হইত না; সন্ন্যাসীবেশী রবীন্দ্রনাথ যে কী করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতেন বলিতে পারি না।

আর-এক দৃশ্য মনে পড়ে— ছুটির সময়ে আশ্রম যখন নির্জন, জগদানন্দবাবু ডাকঘর হইতে একতাড়া চিঠি হাতে ফিরিয়া, বটগাছতলার বেদীতে বসিয়া পড়িতেন; আর একমনে ডাকে-আগত নূতন বইয়ের প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিতেন। শেষবয়সে ডাক্তারের পরামর্শে চুরুট ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাসে মুখ একটা কিছু চায়, সেইজন্য কাছে কিছু লজেঞ্চুষ রাখিতেন, মাঝে মাঝে মুখের মধ্যে একটা আধটা লজেঞ্চুষ ফেলিয়া দিতেন— আর দ্রুত প্রুফের পাতা উল্টাইয়া চলিতেন।

তিনি বহুকাল বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, সর্ববিধ কার্যপরিচালনায় তাঁহার কৃতিত্ব ও নিষ্ঠার অবধি ছিল না; বিদ্যালয়ের অনেক দুর্দিনের সঙ্গে তাঁহার চিন্তা ও কর্ম জড়িত।

কিন্তু, বিদ্যালয়ের বাহিরে বাংলাদেশে তাঁহার খ্যাতি বৈজ্ঞানিক লেখক

বলিয়া। বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানী সাহিত্যিক-ধারার প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত, এই ধারার মধ্যমণি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে অলংকৃত করিয়াছেন। জগদানন্দবাবু এই ধারার অত্যুজ্জ্বল রত্ন। যাঁহারা তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন কেমন সহজে, কেমন অনায়াসে, দুরূহ বক্তব্য বুঝাইবার শক্তি জগদানন্দবাবুর ছিল। বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও তাঁহার অল্প ছিল না; মাছ ব্যাঙ কাঁকড়া পোকামাকড় ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করা তাঁহার বাতিক ছিল। এইভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁহার গ্রন্থের ভিত্তি। শান্তিনিকেতনেই অকস্মাৎ একদিন সন্ন্যাসরোগে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রমের সংস্কৃতের শিক্ষক, বাংলাও পড়াইতেন। ইনিও জগদানন্দবাবুর মতো প্রথম-জীবনে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে কাজ করিতেন, সেখান হইতে বিদ্যালয়ে আসেন।

ইঁহার প্রধান কীর্তি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামে বিরাট বাংলা অভিধান। ইনি চল্লিশ বছরের বেশি একাকী পরিশ্রম করিয়া বাংলাভাষার এই বৃহত্তম অভিধান সম্পূর্ণ করিয়াছেন। একক পরিশ্রমে বাংলাভাষাতে এত বড়ো গ্রন্থ আর অধিক সংকলিত হয় নাই। যে কাজ একাকী করা যায় বাঙালী তাহা করিতে পারে। পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলেই বাঙালী দলাদলি ও মাথা-ফাটাফাটি করিয়া বসে। সাহিত্য এককের সাধনা, বাঙালী তাহাতে ভারতীয় জাতির মধ্যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা পাঁচজনের কাজ— বাঙালীর তাহাতে দুর্বলতার অন্ত নাই।

অন্য যে-কোনো দেশে এত বড়ো এবং এত অত্যাবশ্যক গ্রন্থ-সংকলয়িতার সম্মান ও অর্থের অন্ত থাকিত না। কিন্তু বাংলাদেশের এই নীরব ও নিঃসহায় জ্ঞানী পুরুষের নাম অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের কাছেও অজ্ঞাত। এ দেশের গভর্মেণ্টের কথা আর কী বলিব! তাহারা মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়া সংক্ষেপে কাজ সারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহারও অভাব।

হরিবাবু এ কাজে একেবারে নিঃসহায় ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যই তাঁহার প্রধান সহায়। তাঁহাদের উৎসাহ

ছাড়া এ কাজে কখনো তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন কি না সন্দেহ এবং এই সহায়তা না পাইলে আরব্ধ কাজও নিশ্চয় সমাপ্ত হইত না।

প্রতিভাবান পুরুষের একটি লক্ষণ এই, তিনি বুঝিতে পারেন কোন্ লোককে দিয়া কোন্ কাজ হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথে এই গুণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। হরিবাবুর মধ্যে অভিধান-সংকলনের সম্ভাবনা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর হরিবাবুর চিরস্থায়ী একনিষ্ঠা এই দুরূহ কাজ শেষ করিতে সাহায্য করিয়াছে।

আমরা বালক বয়সে আশ্রমে গিয়া দেখিয়াছি, লাইব্রেরির এক কোণে হরিবাবু ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, সাদা রুল-টানা কাগজ তাঁহার কলমের বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হস্তাক্ষরে পূর্ণ হইয়া লিখিত কাগজের স্তূপকে বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছে। আর, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে দেখিতেছি চৌকোশ বৃহদায়তন অভিধান ক্রমশ মুদ্রিত আকারে ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। জ্ঞানীর মধ্যে এমন একনিষ্ঠা অতিশয় বিরল। প্রাচীন শান্তিনিকেতনের যে স্বল্পসংখ্যক অধ্যাপক এখনো জীবিত আছেন, হরিবাবু তাঁহাদের অন্যতম।[১]

নন্দলাল বসু

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে আসিবার আগে একবার এখানে আসিয়াছিলেন। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়; রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

তার পরে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহার প্রভাবে এখানকার কলাভবন ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া ওঠে। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে-সব ভারতীয় শিল্পচর্চার স্থান আছে সে-সব স্থানের শিল্পীদের অধিকাংশই হয় অবনীন্দ্রনাথের নয় নন্দলাল বসুর ছাত্র। নন্দলালবাবু নিজেও অত্যুচ্চ বেতনে যে-কোনো আর্ট স্কুলে যাইবার সুযোগ বহুবার পাইয়াছেন; অন্য লোকের পক্ষে সে সুযোগ ত্যাগ করা কঠিন হইত। কিন্তু উচ্চ বেতন ও সম্মানের লোভেও যে তাঁহার সংকল্প বিচলিত হয় নাই, তাহার কারণ নন্দলাল-বাবু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির লোক।

১ জন্ম ১৮৬৭ মৃত্যু ১৯৫৯

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শিল্পীকে ধ্যানী যোগী বা সাধক বলা হইত। ধ্যান শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য ছিল। সত্য প্রথমে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধ হইয়া পরে তুলির দ্বারা বস্তুগত আকারে ধরা দিত। কাজেই শিল্প ছিল তখন ধর্মের অঙ্গীভূত। রেনেসাঁস-উত্তর শিল্পের ট্রাজেডি এই যে, এখন ধ্যানের স্থান বুদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র বুদ্ধি দ্বারা যে সত্য গ্রাহ্য তাহাই এখন শিল্পের উপজীব্য; ফলে শিল্প এখন আর ধর্মের সগোত্র নয়, এখন তাহা নিতান্ত পার্থিব।

ভারতীয় চিত্রকলার উজ্জীবনের চেষ্টার মূল এইখানে— শিল্পকে ধ্যানলভ্য করিয়া তাহাকে ধর্মের ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা। যে পরিমাণে ইহা সার্থক হইয়াছে সেই পরিমাণে ভারতীয় চিত্রকলার নবজন্ম সার্থক। নন্দলাল বসু ধ্যানী শিল্পী।

'মাটির মানুষ' কথাটা বাংলায় এখন অসার্থক হইয়া পড়িয়াছে। মাটির মানুষের প্রকৃত অর্থ এই যে, যাঁহার জীবন দেশের মাটির সঙ্গে সংযুক্ত। নন্দলালবাবু ধ্যানের দ্বারা দেশের চিত্রক্ষেত্রের সঙ্গে শিল্পীমনের সংযোগ সাধন করিয়াছেন, কাজেই তিনি সত্যকার মাটির মানুষ। ভারতবর্ষের চিত্রীরা যতদিন পর্যন্ত না এই অর্থে মাটির মানুষ হইতে পারিতেছেন ততদিন ভারতীয় চিত্রকলা-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই নন্দলালবাবুর চিত্রকলার বিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর তাহার স্থানও ইহা নয়। কিন্তু হিমালয়ের উচ্চতা পরিমাপ করিতে যে অসমর্থ দূর হইতে হিমালয়ের তুষারতুঙ্গতা দেখিয়া তাহারও বিস্মিত হইবার বাধা নাই। যাঁহারা চিত্রকলার মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছেন নন্দলাল বসুর সবটা তাঁহারা দেখেন নাই। এই স্বল্পবাক্, স্নেহপ্রবণ, স্মিতমুখ, আত্মস্থ অথচ একান্তভাবে সামাজিক ও ছাত্রবৎসল ধ্যানী পুরুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় যাঁহারা পাইলেন না তাঁহারা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা উদার উর্বরকারিণী শিল্পজাহ্নবী মাত্র দেখিলেন, কিন্তু অটল কৈলাসের যে মানস-সরোবর হইতে তাঁহার নিঃসরণ তাঁহার দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

ক্ষিতিমোহন সেন

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় চাম্বারাজ্যে কোনো উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, ১৯০৮ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন।

প্রথম হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সরলতা দ্বারা তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আশ্রমের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি ঠাকুর্দা নামে পরিচিত হইলেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির রাজপথের বহু পথিক আছে, কিন্তু এই অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের গলিঘুঁজির খবর ক্ষিতিমোহনবাবু যেমন রাখেন এমন দ্বিতীয় আর কেহ রাখেন কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সাধক ও কবিদের বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানকে প্রামাণিক বলা যাইতে পারে। কবীর, নানক, মীরাবাঈ, দাদূ, রজ্জব, সুরদাস ও বাংলার বাউল প্রভৃতি ভক্তসম্প্রদায়ের বাণী সংগ্রহের জন্য উত্তর-ভারতের ও বাংলার বহু স্থানে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন; কারণ, ইঁহাদের গীত ও তথ্য যাহাদের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় আজও আছে শহরে ও জনপদে তাহাদের কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায়। ফলে পল্লীভারতের তথ্য সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ।

কবীর ও দাদূ সম্বন্ধে তাঁহার প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল প্রকাশিত গ্রন্থ দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে খাটো করা হইবে। কারণ, তাঁহার বিশিষ্ট গুণ রচনাতে বা বক্তৃতাতে নহে, তাঁহার অনন্যসাধারণ সরস কথোপকথনে। সরস সরল অথচ নূতন তথ্যপূর্ণ বাচনের দ্বারা আসর জমাইতে তাঁহার দোসর নাই। কথকতার যে শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় সেই শিল্পশক্তি পূর্ণমাত্রায় তাঁহার মধ্যে বিরাজমান। এখন মুদ্রিত পুস্তকের যুগ; এই যুগেও ক্ষিতিমোহনবাবু বিখ্যাত লোক। কিন্তু তিনি যদি তিন-চার শত বৎসর আগে জন্মিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তিনি ইহার চেয়েও বিখ্যাত হইতেন। গ্রামের বটতলায় এবং নগরপ্রান্তের আখড়ায় এই প্রতিভাবান পুরুষ আসর জমাইয়া উৎসুক নরনারীকে নূতন বাণী শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা তাঁহার কথোপকথন শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন পাণ্ডিত্য ও সরসতার এমন বিস্ময়কর সমাবেশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। অবশ্য, বিস্ময়ের কিছুই নাই, কারণ পাণ্ডিত্যে সরসতায় সত্যকার বিরোধ মোটেই নাই। অর্ধপণ্ডিতই সর্বদা ধরা পড়িবার ভয়ে সরসতাকে বর্জন করিয়া চলে।

ক্ষিতিমোহনবাবুকে আমরা ছাত্রেরা বড়ো ভয় করিতাম; কারণ, তিনি বাহ্যত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনায় উপকৃত হয় নাই শান্তিনিকেতনে এমন ছাত্র বিরল। দুরূহ ও নীরস বিষয়ের গোলকধাঁধার মধ্যে তিনি ছাত্রদের টানিয়া লইয়া ঢুকিয়া পড়িতেন, রসিকতার চকমকি-পাথর ঠুকিয়া পথ আলো করিতে করিতে চলিতেন, যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিত পথ তাহাদের কাছে আর অন্ধকার থাকিত না।

বাংলাদেশের বাহিরে রাজপুতানা গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজেও এই মনীষী বাঙালী শ্রদ্ধার পাত্র; তিনি আগন্তুকের মতো নন, ঘরের লোকের মতো তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারেন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার সামাজিকতাগুণ। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষ তাঁহার বিচরণক্ষেত্র, কেবল বাংলাদেশ মাত্র নয়। তৃতীয় কারণ, ঐ-সব অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

এই-সব কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চায়ের আসরের ও সান্ধ্য-বৈঠকের তিনি একজন প্রধান পাত্র ছিলেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী

শাস্ত্রীমহাশয় একটি সজীব অ্যানাক্রনিজ্‌ম্‌। তাঁহার মনটা বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে বিচরণ করিতেছে, কোন্‌ দৈব দুর্বিপাকে তাঁহার জীবনটা এই রেল-কল-ট্রাম-টেলিগ্রাফের যুগে যেন আসিয়া পড়িয়াছে; এ-সকলের মধ্যে তাঁহাকে অত্যন্ত বেখাপ দেখায়; আমার বিশ্বাস, এজন্য তাঁহার মনে যেন একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি রহিয়া গিয়াছে।

চটি-চাদর-শিখা-সমন্বিত, গোঁফ-দাড়ি কামানো, তীক্ষ্ণ নাসা, প্রাণখোলা হাসি, ঋজু ও কৃশ দেহ, এই পণ্ডিত— কাশীতে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা; ইংরেজি নিজের চেষ্টায় বেশি বয়সে শিখিয়া লইয়াছেন। শুধু ইংরেজি নয়, ইউরোপীয় একাধিক ভাষা, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা, তাহা ছাড়া চীনা ও তিব্বতীও তিনি জানেন। বহুভাষাজ্ঞতা তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটি দুর্লভ গুণ।

কাশী হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে পালি ও প্রাকৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। তার পর আসিল বৌদ্ধ দর্শন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হইতে হইতে সমগ্র ভারততত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

যাঁহাদের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করেন শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুত ক্ষিতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রীমহাশয়কে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুই হাত বলিলেও চলে।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে উচ্চতর জ্ঞানচর্চা-বিভাগের শাস্ত্রীমহাশয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন ; এতদিনে তিনি যেন নিজের স্বপ্নকল্পিত স্থানটি পাইলেন।

শাস্ত্রীমহাশয় আনুষ্ঠানিক হিন্দু, আচার-ব্যবহারে যেন গোঁড়া, স্বপাকে আহার করেন— এই-সব কারণে একাধিকবার ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার সুযোগ সত্ত্বেও তাঁহার যাওয়া হয় নাই। আচার-ব্যবহারে গোঁড়া হইলেই, আমরা ভাবিয়া লই, পরধর্মের প্রতি যেন বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা আছে। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের বেলা এ অনুমান খাটিবে না। শান্তিনিকেতনে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ জৈন পারসিক প্রভৃতি নানা ধর্মের লোক আছে— সকলের সঙ্গে তাঁহার সমান ঘনিষ্ঠতা, সকলের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা, সকলের সঙ্গে তাঁহার সমান প্রাণ-খোলা ব্যবহার। তাঁহারাও শাস্ত্রীমহাশয়কে সমান আদর ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সকলের ছোঁওয়া জল ঢক্‌ঢক্ করিয়া পান না করিলেই যে অশ্রদ্ধা দেখানো হয়, এ হয়তো এক নূতন ধরনের কুসংস্কার। ইহা উদারতাও হইতে পারে, আবার হৃদয়ের অসাড়তাও হইতে পারে। সজীব হৃদয় আপনার সত্তা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। অসাড় উদারতার চেয়ে সংকীর্ণ সজীবতা যে শ্রেয় নয় তাহা কে জোর করিয়া বলিবে !

নেপালচন্দ্র রায়

নেপালচন্দ্র রায় এলাহাবাদে কোনো বিদ্যালয়ের হেড্‌মাস্টার ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গভর্মেন্টের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ওকালতি আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া তখন ওকালতি পাস করেন। কিন্তু আইন-ব্যাবসা করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। সে বোধ করি ১৯০৯ সালের কথা।

তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা প্রাইভেট ছাত্র-রূপে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। অনেক দিন হেড্‌মাস্টারি করিয়া ছাত্র পাস করানো সম্বন্ধে নেপালবাবুর বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, কাজেই এই দিক দিয়া তিনি আশ্রমের সহায় হইয়া উঠিলেন।

সুরুল কুঠিতে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনের আদিম দোতালা বাড়ি

কিন্তু ইহা নেপালবাবুব নিতান্ত গৌণ পরিচয়। আশ্রমজীবনের সকল কাজেই তাঁহার এমন উৎসাহ ছিল যে, অনেক সময়ে অপরের পক্ষে সেই উৎসাহের ধাক্কা সামলানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইত! খেলাধুলা, মাটি কাটা, রাস্তা-তৈরি, দেশভ্রমণ, সব কাজেই তাঁহার সমান উৎসাহ। কোনো কাজের প্রস্তাব উঠিবামাত্র তিনি এমন উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন যে, অনেক সময়ে স্বয়ং প্রস্তাবককে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইত। পথের মধ্যে দেখা হইবামাত্র বলিলেন, "একটা কথা আছে।" এবং তার পরে সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল সেখানে খাড়া দাঁড়াইয়া সেই 'একটিমাত্র' কথা বলিয়া চলিলেন। শ্রোতার হাঁটু ভাঙিয়া আসিতেছে কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সেই একটি কথার উৎসাহ তাঁহাকে হয়তো এমনি পাইয়া বসিল যে, পরবর্তী অনেক কাজ তিনি ভুলিয়া গেলেন। চিরকুমার-সভায় চন্দ্রমাধববাবুর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা নেপালবাবুকে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। সেই উৎসাহ উদ্দীপনা, সেই বাগ্মিতা আদর্শবাদ, সেই শিশুসুলভ সরলতা এবং সেই শিশুসুলভ অনভিজ্ঞতা। তাঁহার উৎসাহ কোনোরূপ বাধা মানিতে চাহিত না, না শারীরিক অসুস্থতা, না অন্য কোনো বাস্তব অন্তরায়।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি মাতিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার শরীর বিশেষ অসুস্থ, কিন্তু সে দিকে তাঁর কি দৃষ্টি আছে! সুরুলে জনসেবার একটি কেন্দ্র খুলিয়া এই সময়ে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন।

নেপালবাবুর মধ্যে কয়েকটি ছোটোখাটো ত্রুটি ছিল যাহাতে তাঁহার চরিত্র আরো হৃদয়গ্রাহী ও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সময়-জ্ঞানের একেবারে অভাব ছিল। জীবনে নির্দিষ্ট ট্রেন বোধ করি তিনি কোনোদিন ধরিতে পারেন নাই। প্রথম খানদুই ট্রেন মিস্ করিবেনই। কিন্তু তাহাতে কি দুঃখ আছে! ট্রেন ধরিলেও যেমন হাসি, মিস্ করিলেও তেমনি হাসি। আবার জিনিসপত্র হারানো তাঁহার আর-একটি অভ্যাস ছিল। কত ছাতা ছড়ি জুতা যে তিনি হারাইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহাতে কি দুঃখ আছে! হারানো ছাতা খুঁজিতে গিয়া ছড়িটা হারাইলেন, আবার ছড়িটা খুঁজিতে গিয়া জুতাজোড়া ফেলিয়া আসিলেন।

নেপালবাবু ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াইতেন। ক্লাসের ঘণ্টায় নিয়মিত আসা সম্ভব হইত না বলিয়া তাঁহার আদেশ ছিল, তাঁহাকে যেন খবর দিয়া ডাকিয়া

আনি। কিন্তু এমন কোন্ ছাত্র আছে যে অনুপস্থিত শিক্ষককে তাগিদ করিয়া ডাকিয়া আনিবে। অথচ তাঁহাকে খবর দিবার চেষ্টা করাও দরকার। কাজেই সে সময়ে যেখানে তিনি আছেন সেখানে ছাড়া আর সব জায়গাই একবার খুঁজিয়া আসিতাম। নেপালবাবুকে কিছুতেই পাওয়া যাইত না।

বিদেশ হইতে একবার সংবাদ আসিল, রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই ফিরিবেন। তাঁহাকে নূতন পথ দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করানো হইবে স্থির হইল। কিন্তু সময় অল্প। নেপালবাবু পথ তৈরি করিতে ছেলেদের লাগাইয়া দিলেন। এবং সারা রাত নিজে জাগিয়া থাকিয়া আলো জ্বালিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন। সে পথ এখনো নেপাল রোড নামে আশ্রমে পরিচিত।

নেপালবাবুর গল্প করিয়া আসর জমাইবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কাজেই দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ দ্বিপেন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ সকলের আসরেই তাঁহার সমান আদর ছিল। এক সময়ে নেপালবাবু ক্ষিতিমোহনবাবু শাস্ত্রীমহাশয় জগদানন্দ-বাবু ও অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব আশ্রমের পঞ্চ দিক্‌পাল ছিলেন।

পরিণত বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজ ছাড়িয়া দেন, কিন্তু শান্তি-নিকেতনকে ছাড়েন নাই। সেখানে নিয়মিত তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল।

কিন্তু, উৎসাহ-উদ্দীপনা যাঁহার স্বাভাবিক তাঁহার পক্ষে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নয়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেশের রাজনীতিতে যোগ দিয়া-ছিলেন, দেশহিতকর কাজে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। আশির কাছাকাছি বয়স, শরীর রুগ্‌ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত, তবু ছাতা হাতে করিয়া নেপালবাবু কত কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কখনো তাঁহাকে লালদিঘিতে দেখা যাইতেছে, কখনো টালিগঞ্জের মোড়ে; গ্রীষ্মের বেলা হয়তো তখন দুইটা, শীতের রাত্রি হয়তো তখন দশটা। কিছুদিন হইল তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু লোকান্তরে গিয়াই যে তাঁহার উৎসাহের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে, এমন বিশ্বাস করিতে মন সরে না। দেহবিমুক্ত বিশুদ্ধ উৎসাহরূপী তিনি স্বর্গরাজ্যে হয়তো ইতিমধ্যেই একটা তুমুল বিপ্লব আনিয়া ফেলিয়াছেন। এবং এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ছাতা ছড়ি জুতা হারাইয়াছিলেন তাহা এক কোণে পুঞ্জীভূত দেখিয়া চমকিয়া শিশুসুলভ উচ্চহাস্যে সকলকে উচ্চকিত করিয়া দিতেছেন। হাসিতে হাসিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, আর তিনি চশমা খুলিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা বারংবার মুছিয়া লইতেছেন।

বিশ্বভারতীতে প্রবেশ

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া আমি বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করিলাম। তখনো বিশ্বভারতী অর্থাৎ উচ্চতর বিভাগ রীতিমত গড়িয়া ওঠে নাই; দু-একজন ছাত্র, দু-একজন অধ্যাপক মাত্র সমবেত হইতেছে। আমি ও আমার সঙ্গী অন্ধ্রদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়কে বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র বলিলেও বলা যায়।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন-পল্লীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বতন খড়ের চালাঘর অন্তর্হিত হইয়া নূতন নূতন ইমারত উঠিতেছে, পল্লীটি উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে বাড়িয়া চলিয়াছে; সুরুলগ্রামের সিংহদের অট্টালিকা ক্রীত হইয়া শ্রীনিকেতনের সূত্রপাত আরব্ধ; রাত্রিতে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা; একটা ইঁদারার উপরে একটি উইণ্ড্‌মিল আবর্তিত হইয়া কিছুদিনের জন্য পানীয় জলেরও প্রাচুর্য ঘটাইল; আশ্রমের নিজের ছাপাখানা কারখানা সমবায়ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সংখ্যা ধরিলে পল্লীর জনসংখ্যা এখন পাঁচ শতের কাছাকাছি।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে; আর্থিক অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত; দূরদেশ হইতে ছাত্রছাত্রী আসিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একবার দুটি ছাত্র আসিল; মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশ হইতে ছাত্র আসিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র অবিরল হইয়া উঠিল। গুজরাটি ছাত্রদের সংখ্যা এক সময়ে বাড়িতে বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশের কাছে গিয়া ঠেকিল। মুসলমান ছাত্র আগেও ছিল, এখন আবার বাড়িল; তাহাদের পোশাকে ও আচরণে হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে প্রভেদ বোঝা যাইত না; সকলেরই একসঙ্গে বাস ও আহার। বাংলাদেশের বাহির হইতে অধ্যাপক আসিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতন অত্যল্পকালের মধ্যে বাঙালী প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

আমাদের দুজনের অধ্যাপনা ও পরিচালনার ভার শাস্ত্রীমহাশয়ের উপরে পড়িল। ঠিক কিভাবে আমাদের চালনা করিতে হইবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা কাহারো ছিল না; কারণ, পথটা শুধু যে নূতন তাহা নয়, এ দিকে কোনো পথই ছিল না। কাজেই নানা পরীক্ষা, প্রতিপরীক্ষা, সরণ, প্রতিসরণ, নানা পথ-পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমরা চালিত হইতে লাগিলাম। ফলত এইটুকুমাত্র স্থির ছিল যে, সংস্কৃত প্রাকৃত পালি আমাদের খুব করিয়া শিখিতে

হইবে, কারণ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ইণ্ডোলজি বা ভারততত্ত্ব। শাস্ত্রী-মহাশয় এতদিন পরে দুটি ছাত্র পাইয়া আনন্দে হাসিলেন, আর আমার অদৃষ্টও বোধ করি তাঁহার হাসি দেখিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইয়াছিল। টেনিস খেলায় দেখিয়াছি প্রথম বলটা বেকায়দায় মারিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াটাই যেন ফ্যাশান। শাস্ত্রীমহাশয়ের হাতে আমি তাঁহার প্রথম ছাত্র তেমনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পর্দাখানা ডিঙাইয়া একেবারে সাহিত্যের আগাছার জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহার দুঃখ করিবার হেতু নাই, কারণ পরবর্তীকালে তাঁহার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহুছাত্র গবাক্ষ বিদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কিন্তু হায়, প্রথম ছাত্রের আশা কি এত সহজে ছাড়া যায়? ছাত্র গেলেও যে আশা যায় না। শাস্ত্রীমহাশয় প্রায়ই আমাকে বলিতেন, আর কিছুদিন থাকলেই তোকে পণ্ডিত করে তুলতাম। এই নিষ্ফলতার কৃতিত্বের জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিই; শাস্ত্রীমহাশয়কে তো আর সে কথা বলা যায় না, তাই তাঁহার মুখে ও কথা শুনিলেই প্রণাম করি। তিনি বোধ করি মনে মনে বলেন, আহা ছেলেটার শেখবার ইচ্ছা ছিল, কেবল সঙ্গদোষেই সব মাটি হয়ে গেল।

পাণিনির আবির্ভাব

এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের আদেশ হইল, আমাদের পাণিনির ব্যাকরণ পড়িতে হইবে। শুধু আমরা দুটি নই, আশ্রমের সমস্ত অধ্যাপকদেরই পাণিনি-অধ্যয়ন 'বাধ্যতামূলক' বলিয়া প্রচার করিলেন। পারিলে বোধ হয় সমস্ত বাঙালী জাতি-টাকেই তিনি পাণিনির টোলে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন, বাঙালী জাতি বড়ো ভাবালু; এই ভাবালুতার প্রতিষেধক পাণিনির বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।

'ব্যাকরণকৌমুদী'ই আমার কাছে বিষাক্ত ছিল, এই পুস্তকের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে 'কৌমুদী' শব্দটাও চিরকালের জন্য বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। কোনো রকমে যদি বা ব্যাকরণকৌমুদীর গণ্ডি উত্তীর্ণ হইলাম তো একেবারে পাণিনির জ্বলন্ত চুল্লিতে পড়িতে হইবে তাহা আমার জন্মকালে বা পাণিনির মৃত্যুকালে কে ভাবিতে পারিয়াছিল! কিন্তু তখন আর পশ্চাদপসরণের পন্থা ছিল না। আর, শাস্ত্রীমহাশয়ের উৎসাহে অত্যল্পকালের মধ্যে পাণিনির পণ্ডিত ও ব্যাকরণের বই আসিয়া উপস্থিত হইল।

পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র দ্বারভাঙ্গা জেলার অধিবাসী; উক্ত জেলার

দ্বারবানদের পিতল-বাঁধা লাঠির মতো সরল, সতেজ, সবল তাঁহার চেহারা। পাণিনির বই আবার নির্ণয়সাগর প্রেসে ছাপা; অক্ষরগুলি উত্তরভারতীয় দেবনাগরীর মতো সুশ্রী নয়; সব বাঁকা বাঁকা চেহারা; প্রত্যেকটি যেন অষ্টাবক্রের পৌত্র। তার উপরে আবার বইয়ের মলাটখানার রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভিতরেই এত মারাত্মক বিস্ফোরক ছিল যে, মলাটখানার ভয়াবহ কালিমা নিতান্তই বাহুল্য। আমাদের পাণিনীয় অভিযানকে বিঘ্নসংকুল করিবার কোনো উপায় শাস্ত্রীমহাশয় বাদ রাখেন নাই।

মিশ্রজীর ক্লাসে আমরা সকলে গিয়া বসিলাম। আমরা দুটি আছি, আর আছেন আশ্রমের অধিকাংশ অধ্যাপক; ছাত্রদের বয়স ষাট হইতে ষোলো পর্যন্ত কাশীর গঙ্গার ঘাটের মতো ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। মিশ্রজী বাংলা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু ক্রিয়াপদগুলি সাধু ভাষায় ব্যবহার করেন। ফলে, এই নিদারুণ ট্রাজেডির মধ্যে কমিকের যে অভাব হইবে আশা করিতেছিলাম, তাহাও দূরীভূত হইল।

মিশ্রজীর এই মিশ্রবয়সের ক্লাসে পাণিনি অধ্যয়ন যে কিরকম চলিতেছিল তাহা গোপন রাখাই উচিত। কিন্তু সংসারে উচিত ঘটনা কয়টা ঘটে? বর্ষাকালে একদিন ঘরের মধ্যে যখন ক্লাস চলিতেছিল এমন সময়ে একবার মেঘ ডাকিল। মেঘগর্জনে উল্লসিত শিখীর মতো ছাত্রদল বলিয়া উঠিল, "মিশ্রজী, মেঘ ডাকিলে ব্যাকরণ পাঠ বন্ধ।" মিশ্রজী ক্ষীণস্বরে কী যেন আপত্তি করিলেন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গিয়া সমবেত ছাত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে:

অধীর যমুনা তরঙ্গ-আকুলা
তিমিরদুকূলা রে।

স্বয়ং দিনুবাবু সংগীত-পরিচালক। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রজীও ক্লাসের এই ক্লাসিক্যাল সংগীতে যোগদান করিলেন। এমন সময়ে জানালার ফাঁকে ও কাহার তীক্ষ্ণ নাসাগ্রভাগ? সূর্যোদয়ে মেঘাড়ম্বর কাটিয়া যায়, কিন্তু ভেকের হল্‌হলা জাগিয়া ওঠে, তেমনি শাস্ত্রীমহাশয়ের মুখাংশমাত্র-দর্শনে বর্ষার সংগীত মুহূর্তে থামিয়া গেল এবং ব্যাকরণের সূত্রাবৃত্তি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শাস্ত্রীমহাশয় কোথায় যেন যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সংগীত শুনিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়াছেন। পাণিনির এই অপমান দেখিয়া তিনি তার পরদিন হইতে বয়স্ক ছাত্রদের ব্যাকরণ অধ্যয়ন হইতে মুক্তি দিলেন, কিন্তু আমরা দুটিতে ছুটি পাইলাম না। যে ঘটনায়

আমার পাণিনির শাপমোচন ঘটিল তাহা এখন বলিব।

দুপুরবেলা রবীন্দ্রনাথ চলমায় ও আমাকে ইংরেজি পড়াইতেন। কয়েক দিন পরে একদিন পাঠের সময়ে তিনি ডাইং শব্দের অনুবাদে 'মুমূর্ষু' বলিলেন, আমি আপত্তি করিলাম। তিনি বলিলেন, "তা হলে কী হবে?"

আমি বলিলাম, "ম্রিয়মাণ।"

তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বললে রে?"

আমি বলিলাম, "স্বয়ং ভগবান পাণিনি।"

যখন দেখিলাম বিস্ময়ে তিনি নির্বাক্ আমি ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিলাম, "ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় হয়; লোকটার তো মরবার ইচ্ছা ছিল না, তাই 'মুমূর্ষু' না হয়ে হবে 'ম্রিয়মাণ'।"

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সর্বনাশ! এ যে দেখছি বাংলাও ভুললি, আর সংস্কৃতও শিখলি না।"

আমি সগর্বে বলিলাম, "যেমন ব্যবস্থা করেছেন। আগে অ্যালোপ্যাথি বিষ মরলে তবে তো হোমিওপ্যাথির গুণ ফলতে আরম্ভ করবে। সবে বাংলা ভুলতে আরম্ভ করেছি, এর পরে সংস্কৃত জ্ঞানের বনিয়াদ পাকা হতে থাকবে।"

তাঁহার মুখে অনেকক্ষণ বাক্স্ফূর্তি ঘটিল না; বোধ করি বাঙালী জাতির উপরে পাণিনির প্রভাব সম্বন্ধে তিনি তখন চিন্তা করিতেছিলেন। তার পরে বলিলেন, "শাস্ত্রীমশায়কে গিয়ে বল্ যে, তোর আর পাণিনি পড়তে হবে না।"

এ কী দৈববাণী শুনিলাম! প্রথম শ্লোক শুনিয়া বাল্মীকি যেমন বিস্মিত উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন "এ কী শুনিনু রে"— আমার অবস্থাও তদনুরূপ।

শাস্ত্রীমহাশয়কে সব ব্যাপার গম্ভীরভাবে নিবেদন করিলাম। যেন আমার কতই বিপদ, যেন পাণিনিপাঠে বঞ্চিত হইয়া জীবন আমার চ্যুতলক্ষ্য হইয়া গেল। তিনি আমাকে শুধাইলেন, "তোর কী ইচ্ছা?" আমি বলিলাম, "আমার নিজের ইচ্ছা আর কী? গুরুদেবের ইচ্ছাই ইচ্ছা।" তিনি যে আমার গুরু-ভক্তিতে আনন্দিত হইলেন এমন মনে হইল না। তার পর চলমায়কে শুধাইলেন, "তোকেও কি নিষেধ করেছেন?"

চলমায়ের একটা মুদ্রাদোষ এই যে, সে চট্ করিয়া সত্যকথা বলিয়া ফেলে। চলমায় বলিল, "না।" শাস্ত্রীমহাশয় সোল্লাসে বলিলেন, "তবে তুই পড়বি?"

যেন মজ্জমান ব্যক্তি ডুবিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে একখানা ভেলা পাইল। পণ্ডিত লোকে নাকি বিপদে পড়িলে অর্ধ ত্যাগ করে। শাস্ত্রীমহাশয় তো পণ্ডিত, কাজেই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলমায়ের উপর ভর করিলেন।

পরদিন দূর হইতে দেখিলাম, মিশ্রজী একক চলমায়কে পাঠ দিতেছেন। তাঁহার ক্লাস দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে আসিয়া ঠেকিয়াছে; অচিরেই যে তাহা শূন্যবাদে পর্যবসিত হইবে, এমন আশঙ্কা আর কাহারো না হোক মিশ্রজীর নিশ্চয় হইতেছিল।

এইখানেই আমার পাণিনি-অধ্যয়ন শেষ; কিন্তু তার পরেও ছোটো একটি অধ্যায় আছে! আমার সংগীতজ্ঞ বন্ধু অনাদি দস্তিদারকে ধরিয়া পাণিনির প্রথম দশটি সূত্রে করুণ বেহাগ সুর বসাইয়া সভাস্থলে শাস্ত্রীমহাশয়ের উপস্থিতিতে শুনাইয়া দিলাম। আহা, পাণিনির সূত্রে আর বেহাগের সুরে মিলিয়া নিত্য-ধ্বনিত হরগৌরীর গৃহ-কোন্দল যেন বাজিয়া উঠিল।

শাস্ত্রীমহাশয় শুনিয়াই বুঝিলেন, এ আমার কাজ। তিনি বলিলেন, "এ কী রে?"

আমি বলিলাম, "কিছুই না, পাণিনির বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।" তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম, "মহাদেবের ডম্বরুর ধ্বনিতেই তো প্রথম এই-সব সূত্র বাজিয়া উঠিয়াছিল, কাজেই ইহাতে সুরসংযোগ এমন কী অন্যায়? অবশ্য, মহাদেবের মৌলিক সুর জানিতে পারিলে বিধিমতো হইত। কিন্তু, তদভাবে এই বেহাগ।" শাস্ত্রীমহাশয় হাসিবেন কি রাগিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বার দুই হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বিদ্যাচর্চা

অতঃপর নানা বিদ্যার পরীক্ষা আমার উপরে চলিতে লাগিল। আনাড়ি স্নানার্থীর উপরে সমুদ্রের ঢেউগুলা একটার পরে একটা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে যেমন একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে আমার দশা অনেকটা সেইরূপ হইল।

পাণিনির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শাস্ত্রীমহাশয় একেবারে হতাশ হইলেন না, তিনি প্রাকৃত ও পালি শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সেইসঙ্গে সংস্কৃত কাব্য বেশি করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। প্রায় একই সময়ে কাদম্বরী শকুন্তলা মেঘদূত ও রত্নাবলী আরম্ভ হইল। কাদম্বরী মেঘদূত ও শকুন্তলা ভালো লাগিল, কিন্তু

মনে হইল রত্নাবলী কেমন যেন অলংকারের বই খুলিয়া লেখা নাটক।

ইংরেজি পাঠ্যতালিকাও কম দীর্ঘ ছিল না। Silas Marner, Marius the Epicurean, Representative Men, Merchant of Venice, Areopagitica চলিতে লাগিল; তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তখন ওখানে অবকাশ যাপন করিতেছিলেন, তিনি Sartor Resartus আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফলে একটি ছাত্রের উপরে অনেকগুলি শিক্ষক এমন একাগ্র উৎসাহে আসিয়া পড়িলেন যে ছাত্রের দম বন্ধ হইবার উপক্রম।

এ-সব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আমাকে ও চলমায়কে পাঠ দিতেন। দুপুরবেলাতে ইংরেজি; তখন কেবল আমরা দুটিই থাকিতাম। সন্ধ্যাবেলাতে একটা বড়ো বৈঠক বসিত; ছোটো বড়ো কাহারো নিষেধ ছিল না। যে-সব বিদেশী বই রবীন্দ্রনাথের নিজের ভালো লাগিত পাঠ করিতেন ও ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

পাণিনির তিরোভাবের পরে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর ভাবালুতা দূর করিবার আর-একটা উপায় আবিষ্কার করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, আমাকে কিছু বিজ্ঞান পড়িতে হইবে; এবং নিজেই আমাকে পড়াইবেন সংকল্প করিলেন। দুপুরবেলা সেকালের উত্তরায়ণের বারান্দায় বসিয়া 'সায়ান্স্ ফ্রম অ্যান ঈজি চেয়ার' পর্যায়ের একখানি গ্রন্থ হইতে রসায়ন সম্বন্ধে স্থূল কথাগুলি বলিতেন। কিছুদিন এইরূপ চলিলে একটি ঘটনা ঘটিল। একদিন দুপুরবেলা একজন সাঁওতাল ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল; রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ছাখ তো।" ভাবটা এই যে, আমি তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া দিই, সে ভিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। আমি বলিলাম, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি।" এই বলিয়া ভিক্ষাদানের ভার নিজের হাতেই লইলাম। তাঁহার শয়নগৃহে ঢুকিয়া দেখিলাম বিছানায় পাতা প্রকাণ্ড একখানা চাদর। সেখানা তুলিয়া লইয়া নিতান্ত উদারভাবে ভিক্ষুকের হাতে দিলাম। রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষে দেখিলেন, তাঁহার বিছানার চাদরখানা গেল। তখন কী ভাবিলেন জানি না; হয়তো বা ভাবিলেন, আর কিছুদিন আমাকে পড়াইতে থাকিলে তাঁহার বাড়িঘর জমিদারি সুদ্ধ দান করিয়া বসিব।

রসায়নশাস্ত্রের পরে কিছুদিন তিনি মিটিরিয়লজি বা আবহবিদ্যা পড়াইয়াছিলেন।

এই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিলেন, যে, কলেজে বা শিক্ষকের কাছে পড়িয়া যথার্থ শিক্ষা হয় না ; নিজের প্রকৃত শিক্ষক নিজে এবং শিক্ষার স্থান লাইব্রেরি ; লাইব্রেরিতে যথেচ্ছ ঘুরিয়া যথেচ্ছ পড়িয়া তিনি প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ হইয়া উঠিবার এমন সরল পন্থা আছে জানিবামাত্র আমি আর কালব্যয় না করিয়া এক দৌড়ে লাইব্রেরিতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। তাঁহার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরির আনাচে-কানাচে ঘুরিলাম ; আলমারির কোনো গলিঘুঁজি বাদ রাখিলাম না ; কোন্ আলমারির কোন্ শেল্ফে কী বই আছে সব দেখিলাম— এবং অবশেষে একদিন থিয়ক্রিটস্-এর কাব্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম।

থিয়ক্রিটসের কাব্য বিশেষ কেহ পড়ে না, সেইজন্য তাহার উপরে আমার ঝোঁক পড়িল। আমার এমনি একগুঁয়ে স্বভাব যে, যদি কেহ হিতোপদেশচ্ছলে বলে যে 'অমুক বইখানি পড়িয়ো' তবে ইহা একরকম নিশ্চিত যে, সে বইখানা আমার কখনো পড়া হইবে না।

আজকালকার দিনে সাধারণ পাঠকের ঝোঁক বৈদেশিক আধুনিক সাহিত্যের উপর, এবং তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৈদেশিক ক্লাসিক্‌স্-এর উপর আমার অনুরাগ। যদি কখনো আবার সাধারণ পাঠকের রুচির মোড় ঘুরিয়া যায়, তাহারা ক্লাসিক্‌স্-এর অনুরাগী হইয়া ওঠে তখন আমি নিশ্চয় উৎকট উৎসাহে আধুনিক সাহিত্য পড়িতে বসিয়া যাইব। আমার পড়াশুনা নিয়মিতভাবে হয় নাই বলিয়া তাহার মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক রহিয়াছে। অবশ্যপাঠ্য অতি প্রসিদ্ধ অনেক বই আমি পড়ি নাই, আবার অপ্রসিদ্ধ উপেক্ষিত বহু বই অল্প বয়সে পড়িয়া ফেলিয়াছি। এ পর্যন্ত যেটুকু শিখিয়াছি তাহার মূলে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরি।

শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান : পাঠরসিকের যথেচ্ছ বিহারের এমন প্রশস্ত স্থান আর নাই। এই লাইব্রেরির একটি অপরিহার্য অঙ্গ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অবাঙালী অধ্যাপক আসিলেন, এখানে তাঁহাদের কয়েকজনের কথা বলা যাইতে পারে।

এইচ. পি. মরিস

মরিস সাহেব বোম্বাইয়ের অধিবাসী, জাতিতে পার্শী, লম্বা, রোগা, ফর্সা মানুষটি। তাঁহার মাথায় বোধ হয় একটু ছিট ছিল, কিন্তু সরল মানুষ ছিলেন। বাংলা শিখিবার তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। বাংলার নূতন কোনো ব্যবহার শুনিলেই টুকিয়া রাখিতেন এবং প্রথম সুযোগেই তাহা ব্যবহার করিয়া বসিতেন; বলা বাহুল্য, অনেক সময়েই সে ব্যবহার অপব্যবহার হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উৎসাহ বাধা পাইত না।

একদিন আমাকে দেখা মাত্র 'বেটা ভূত' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার প্রকৃতি জানিতাম, বুঝিলাম নূতন শিক্ষালব্ধ শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। আমি বলিলাম, আমাকে 'বেটা ভূত' বলাতে আমার কোনো আপত্তি নাই, কারণ অনেকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূতত্ব পর্যন্ত উঠিতেও নারাজ। কিন্তু অন্য লোকে রাগ করিতে পারে। তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "কেন, গুরুদেবের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় এই সম্বোধন আছে, ইহা তো আদরের ডাক।"

একা থাকিলে তিনি সর্বদা গুন গুন করিয়া গান করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "গুরুদেব 'চিনি'র উপরে একটি গান লিখিয়াছেন।" আমার বিস্ময় দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কি জানো না? তবে শোনো।" এই বলিয়া গুন গুন করিয়া বলিলেন, "চিনি গো চিনি, তুমি বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধুপারে।" তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "যখন বিলাতি চিনি সমুদ্রপার হইতে আসিত এ গান তখন লেখা।" তার পরে নিজের মনেই যেন বলিলেন, "গানটি বড়ো মিষ্টি।" আমি বলিলাম, "চিনির গান তো অবশ্যই মিষ্টি হইবে, কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোথায় পাইলেন?" তিনি বলিলেন, "কেন, গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন।" আমি আর তাঁহার ভুল ভাঙিলাম না।

মিঃ মরিস ইংরেজি ও ফরাসি পড়াইতেন। বহুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন; শেষে শোচনীয় অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গুরুদয়াল মল্লিক

গুরুদয়াল মল্লিক কোয়েটার অধিবাসী; রোগা, ছোট্ট, কৃশ মানুষটি; আমরা তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া পাঠান বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার কাছে আমি কিছুকাল

ইংরেজি পড়িয়াছি। তিনি কিছুকাল এখানে ছিলেন, তার পরে আবার দেশে ফিরিয়া যান। আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; যখনই সুযোগ হয় কিছুকালের জন্য আসিয়া শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। সম্প্রতি তিনি একমুখ দাড়ি গজাইয়াছেন।

গুরুদয়াল মল্লিক ভাবে-ভোলা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি; আশ্রমের ছোটো বড়ো ছাত্র অধ্যাপক সকলের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব। এমন আত্মভোলা আদর্শপর লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি; রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁহার অগাধ ভক্তি।

মল্লিকজী নিরামিষাশী স্বল্পাহারী লোক; আশ্রমের পাকশালায় তাঁহার আহারের অসুবিধা হইতেছে জানিয়া দিনুবাবু নিজের বাড়িতে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করেন। এই আত্মবিস্মৃত সাধকের উপকার করিতে পারিলে সকলেই আনন্দিত হইতেন।

শীতকালেও খুব ভোরবেলা তাঁহার স্নানের অভ্যাস ছিল; স্নানান্তে যখন তিনি গান করিতে করিতে ফিরিতেন সেই গান শুনিয়া আমাদের ঘুম ভাঙিত। তাঁহার ঘরটি আমাদের লোভনীয় আড্ডার স্থান ছিল।

জাহাঙ্গীর ভকিল

জাহাঙ্গীর ভকিল ইঁহাদের পরে আসেন। ইনি অক্সফোর্ডের উচ্চডিগ্রিধারী। পাস করিবার পরে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে প্রবেশের সুযোগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু দেশের কাজ করিবার ইচ্ছা থাকাতে এই লোভনীয় চাকুরিতে তিনি প্রবেশ করেন নাই, পত্নী ও ছোট্ট একটি মেয়েকে লইয়া আশ্রমে আসিলেন। তিনি ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন।

ইংরেজিতে তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতেন। শেষে বাংলা শিখিয়া বাংলাতেও কবিতা লিখিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

বিদ্যা বুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের সমতা তাঁহার চরিত্রে ছিল। বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিলে 'সিনিক' বলিয়া মনে হইত, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। মল্লিকজীর মতো সকলের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশিতে পারিতেন না, কেবল নিজের ভাবে ভাবিত স্বল্পসংখ্যক লোকের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইত।

এমন দিন যাইত না যেদিন চার বেলার মধ্যে এক বেলা তাঁহার বাড়িতে আমার আহার না জুটিত!

আশ্রম-পরিত্যাগের পরে বোম্বাই শহরে ছোটো একটি বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়া চালনা করেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্যাচর্চার চেয়ে ধর্মসাধনার দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছেন।

ভীমরাও শাস্ত্রী

পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী জাতিতে মারাঠি, বেঁটে মোটা মেদচিক্কণ দেহ। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার অনেক আগে তিনি আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের শিক্ষক ছিলেন, সংস্কৃতও পড়াইতেন।

সংস্কৃত অভিনয়ে তিনিই আমাদের হাতে-খড়ি দেন ; এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহারই শিক্ষায় ও উৎসাহে আমরা অনেকবার কৃতিত্বের সঙ্গে একাধিক সংস্কৃত নাটক আশ্রমে অভিনয় করিয়াছি। এখন তিনি কোল্‌হাপুরে সংস্কৃত ও সংগীতের প্রধান শিক্ষক।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে ইউরোপ হইতে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে আসেন ; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিরাই তাঁহাদের কাছে আসিত। একবার কেবল দল-বৃদ্ধির জন্য সিলভ্যাঁ লেভির সাধারণ ক্লাসে গিয়া আমি বসিয়াছিলাম। সেদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, প্রাচীনকালে পারসিকেরা ময়ূরের মাংস খাইত, ভারতীয়েরাও ময়ূরের মাংসের স্বাদের কথা অবগত ছিল, সে মাংস অতি সুস্বাদু।

ফলে, তার পরদিনে আশ্রমের পোষা ময়ূরটিকে আর দেখা গেল না। সবাই বলিল, শেয়ালে খাইয়াছে। হইতেও বা পারে। কিন্তু নবলব্ধ মাংসতত্ত্ব যে এই অন্তর্ধানের মূলে নাই তাহাই বা কেমন করিয়া নিশ্চিত বলিব ?

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

বিধাতার বেরসিক বলিয়া অপবাদ আছে যে, তিনি অনেক সময়েই মাটির ভাণ্ডে অমৃত রাখেন, লোকে সন্দেহই করিতে পারে না যে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর পাত্রে স্বর্গীয় সুধা রহিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে নাই। শচীর মণিমাণিক্যজড়িত পানপাত্রে স্বর্গের অমৃত স্থান পাইয়াছে।

বিধাতা যে শিলাখণ্ড দিয়া রামায়ণ-মহাভারতের যুগের বীর ও মনীষীদের

গড়িয়াছিলেন, তাহারই খানিক যেন তাঁহার শিল্পশালার একান্তে পড়িয়া ছিল; বহু যুগ পরে বিধাতাপুরুষ তাহা দিয়া রবীন্দ্রনাথকে গড়িয়াছেন। তাঁহার কেশাগ্র হইতে নখান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ আর তাঁহার জন্মমুহূর্তে প্রত্যেক দেবতা আপনার ডালি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন এই নবজাত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ভাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারই সুপুরুষের পরিবার; তাঁহার ভাইদের মধ্যে তিনিই রূপে নাকি ছিলেন কিঞ্চিৎ নিরেস, আর তাঁহার রঙই নাকি ছিল সকলের চেয়ে কালো। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের সহোদরদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমি দেখিয়াছি; তাঁহাদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের যখন দেখিয়াছি তখন তাঁহাদের বয়স বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও তো বেশি বয়সেই দেখিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কী, বেশি বয়সেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য যেন পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৃহৎ একটা অংশ ছিল প্রতিভার জ্যোতি। মানুষের মুখে প্রতিভার এমন দীপ্তি যে থাকিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে হয়তো বিশ্বাস করিতাম না। প্রাচীন চিত্রে মহাপুরুষদের মুখের চারি দিকে একটা জ্যোতির্ময় গোলক অঙ্কিত দেখা যায়; সেই গোলক প্রতিভার দীপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মহাকবি যখন প্রতিভাভাস্বর মূর্তি লইয়া, প্রাচীনহস্তিদন্তাভ অঙ্গচ্ছটায়, শিথিলপিনদ্ধ পোশাকের বদান্যতার রাজকীয় মহিমায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি ও বিস্ময় উদ্রিক্ত হইত; মনে হইত দেবরাজ যেন কৌতুক ও কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মর্তে অবতরণ করিয়াছেন। দেবরাজই বটে! বিদ্যুৎ বজ্র ও বর্ষণের সমস্ত রহস্যই তাঁহার করায়ত্ত! বিস্মিত দর্শকের ভাব দেখিয়া যুগপৎ তাঁহার ওষ্ঠাধরে কৌতুকস্মিত ও অপরাজিতার মতো চোখে স্নেহের ভাব জাগিয়া উঠিত। 'মানুষে এমন গুণ কভু না দেখিএ।'

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোধ করি একমাত্র গ্যয়্টের তুলনা চলে। জার্মান কবি-রসিক হায়্নের গ্যয়্টে-সন্দর্শনে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ হয়তো অনেকেরই প্রথম রবীন্দ্র-দর্শনে ঠিক সেই অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছে।

হায়্নে লিখিতেছেন যে, তিনি বাল্যকালে প্রথম গ্যয়্টে-সন্দর্শনে যাত্রা

করেন। মহাকবির কাছে কিরকম বক্তৃতা করিবেন সেই বাক্যের সৌধ গাঁথিতে গাঁথিতে তিনি গ্যয়্টের কাছে গিয়া পৌছিলেন। গ্যয়্টের অলৌকিক বিভূতি ও রাজকীয় নিস্তব্ধতায় স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া হায়্নে ভাবিলেন, এ কোথায় আসিলাম— এ যে স্বয়ং জুপিটার! তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন তাঁহার পায়ের কাছে তাঁহার বাহন ঈগলটা কোথায়? গ্যয়্টে তাঁহার অভিভূতি লক্ষ্য করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কিগো, কী ভাবছ?" ততক্ষণে হায়্নের বক্তৃতার সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, পথে কয়েকটা মিষ্টি কুল খেয়েছিলাম, সেই কথাই ভাবছি।"

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পোশাকে বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ লোকের ব্যক্তিত্ব যেমন বৈশিষ্ট্যবর্জিত তাহাদের পোশাকও তেমনি; তাহাতে প্রয়োজনের ছাপ মাত্র আছে, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের সাজসজ্জায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইত, কিংবা তাঁহার সজ্জা তাঁহার ব্যক্তিত্বেরই প্রক্ষেপ।

সাধারণত তিনি পায়জামা ও ঢিলে জামা পরিতেন; উৎসবাদি উপলক্ষে গরদের ধুতি চাদর পাঞ্জাবি; আর, বিদেশভ্রমণে তাঁহার মাথার উঁচু টুপি এখন বিশ্ববিখ্যাত। ইহা তো কেবল স্থূলভাবে বলা হইল; যেরকম পোশাকই তিনি পরুন-না কেন তাহাতেই তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। প্রসাধনের রহস্য এই যে, বেশভূষা যেন মানুষকে ছাপাইয়া না যায়। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটে, পোশাকটাই লক্ষ্য হইয়া উঠে, মানুষটাকে আর চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যত সুন্দর পোশাকই পরুন-না কেন, তিনিই সর্বদা লক্ষ্যগোচর থাকিতেন। এক স্থানে তিনি পোশাককে 'দেহগানের তান' বলিয়াছেন। তাঁহার গানে কথাকে ছাপাইয়া তান যেমন উৎকট হইয়া উঠিতে পায় না তেমনি এই 'দেহগানের তান' তাঁহার মূর্তির চেয়ে কখনো প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথকে ত্রিশ বছরের বেশি আমি দেখিয়াছি— নানা ভাবে, নানা স্থানে, নানা উপলক্ষে— কিন্তু, কখনো মনে হইল না যে লোকটি পুরাতন হইয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের বহুমুখিতাও কম নহে। তাঁহার মুখের প্রসন্ন স্নেহস্মিত ভাব যেমন কখনো ভুলিবার নয় তেমনি তাঁহার বিরক্তির জগদ্দল

পাষাণের চাপও কখনো ভুলিতে পারিব না। ভ্রূযুগ আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সংযুক্ত হইত, মাঝখানে দুটি ঊর্ধ্বগামী রেখাপাত করিত, মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিত, হাত দুখানি কোলের উপরে পড়িয়া থাকিত, আর চোখের দৃষ্টি মাঠের অপর প্রান্তে দিগন্তের দিকে বিন্যস্ত হইয়া সবসুদ্ধ কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব ধারণ করিত। কোনো রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; করিলে বোধ করি এমন ভয়াবহ হইত না, বাক্যের অভাবেই তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ পাইত— একটা-দুটা অর্ধোক্ত বাক্যাংশ মাত্র। নিতান্ত কিছু বলিতে হইলে শূন্যের দিকে চাহিয়া বলিয়া যাইতেন; মানুষের মুখের দিকে তাকাইতেন না। স্মরণ করিলে এখনো হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

একবারকার ঘটনা আমার মনে আছে। আমার রচিত কোনো-একটা যাত্রার পালা শান্তিনিকেতনে অভিনয়-কালে তিনি দর্শকদের মধ্যে ছিলেন। রচনাটি কোনো কারণে তাঁহার পক্ষে বিরক্তিকর হয়। পরদিন সকালে আমার ডাক পড়িল। উপরে তাঁহার বিরক্তির যে-সব লক্ষণ এইমাত্র বর্ণনা করিলাম, দেখি তাহার সবগুলিই বর্তমান। সর্বনাশ! নীরবে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি নৈর্ব্যক্তিকভাবে মাঠের অপর প্রান্তে বিচরণশীল গোরুগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া চলিলেন, "যার লিখবার শক্তি নেই সে যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করে তখন দুঃখ হয় না, কিন্তু যার ক্ষমতা আছে তার শক্তির অপব্যবহার দেখলে দুঃখ না হয়ে যায় না।" মুখ তুলিয়া যখন আমার দিকে চাহিলেন তখন আমার মুখে হাসি। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হল, হাসছিস যে?" সে সময়ে আমার দুঃসাহসের অন্ত ছিল না। আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, এটুকু অন্তত জানলাম যে আমার লিখবার শক্তি আছে।" দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, নিতান্ত কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই আমাকে তিরস্কারে উদ্যত হইয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় নয়।

আর-একবারের কথা মনে আছে, সেবারেও আমি আসামী, কিন্তু ভুল আসামী। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক তিরস্কার শুনিলাম। শেষ হইলে বলিলাম, "আপনার সব কথাই ঠিক, কেবল আমি অপরাধী নই।" আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন; বলিলেন, "ভালো হল, আমার বলাও হল, আবার লোকটাকে কষ্ট দেওয়াও হল না। এবার তুই তাকে গিয়ে বল্।" তার পরে একটু থামিয়া বলিলেন, "আসল কথা কী জানিস, মাঝে মাঝে আমি খুব

বিরক্ত হই, কিন্তু অপরাধী যখন সশরীরে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তখন তিরস্কার করতে কষ্ট হয়। নিতান্তই যখন না বললে নয় তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো রকমে বলে ফেলি। আর খুব রাগ হলে কথাই বলি না, পাছে অপরাধের চেয়ে বেশি ওজনের কিছু বলে ফেলি!"

রবীন্দ্রনাথের চেহারার কয়েকটি ছাপ আমার মন হইতে মুছিবার নয়। উত্তরায়ণে তখন মাত্র দুটি খড়ের বাংলো; তিনি তাহারই একটার ছোটো একটা কুঠরিতে বসিয়া লিখিতেন; বলিতেন, "ছোটো ঘরে আমি লিখে আরাম পাই, ওতে মনটা ছড়িয়ে না থেকে বেশ সংহত হয়ে জমাট বেঁধে থাকে।" দুপুরবেলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়াছি। গরাদে-হীন খোলা জানলার অবকাশে দেখা গেল, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিনি লিখিতেছেন; অল্পক্ষণ হইল স্নান শেষ হইয়াছে, চুলের প্রান্ত যেন ভিজা; কাঁধের উপরে মোটা নীল জোব্বার প্রান্ত; জোব্বা ও চুলের মাঝখানে আনত শুভ্র স্কন্ধের উপরে চশমা ঝুলাইবার কালো ফিতাটা। চুপিচুপি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পড়ে ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, খবর কী? বোস্।" খবর কী জিজ্ঞাসা করিয়াই বসিতে বলিবেন; কোনোদিন বসিতে বলিলেন না, এমন হয় নাই। বুঝিলাম অনেকক্ষণ আগে দেখিতে পাইয়াছেন, কেবল অর্ধসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করিতেছিলেন মাত্র। আমি হয়তো সামান্য কারণে বা বিনা কারণে গিয়াছি, কিন্তু কখনো বিরক্ত হইতে দেখি নাই। আর্ট্ যাহার কাছে মানুষের চেয়ে বড়ো সে বিরক্ত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যতই নগণ্য হোক-না কেন, তিনি বিরক্ত হইবেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের এই মূর্তিটিই আমার কাছে সবচেয়ে পরিচিত, কারণ তখন আমি বিশ্বভারতীতে কেবল প্রবেশ করিয়াছি, তখনো বহু ছাত্রের সমাগম হয় নাই, তাঁহার কাছে যাইবার সুযোগ অবাধ ছিল এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহারে আমার কখনো ত্রুটি হয় নাই। বোধ করি তখনকার দিনে এমন দুপুর ছিল না যখন আমি না যাইতাম। বিশেষত, দুপুরবেলা তিনি আমাকে পড়াইতেন, সেজন্যও যাইতে হইত।

আর-একদিনের কথা মনে আছে। তখন আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষের দিকে; আকাশ নূতন বর্ষার মেঘে ঘন নীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনো গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন

প্রশ্ন করিয়া করিয়া বালকদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন পৃ. ১৪

জগদানন্দবাবুর ক্লাসের জায়গা ছিল নাট্যঘরের কাছে ফটকটার তলায়··· পৃ. ২৫

লেদের অনেকগুলি হাতে-লেখা পত্রিকা ছিল পৃ. ৬৪

ার প্রকাণ্ড শীল্ডখানা অকালসূর্যের মতো ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিত পৃ. ৮২
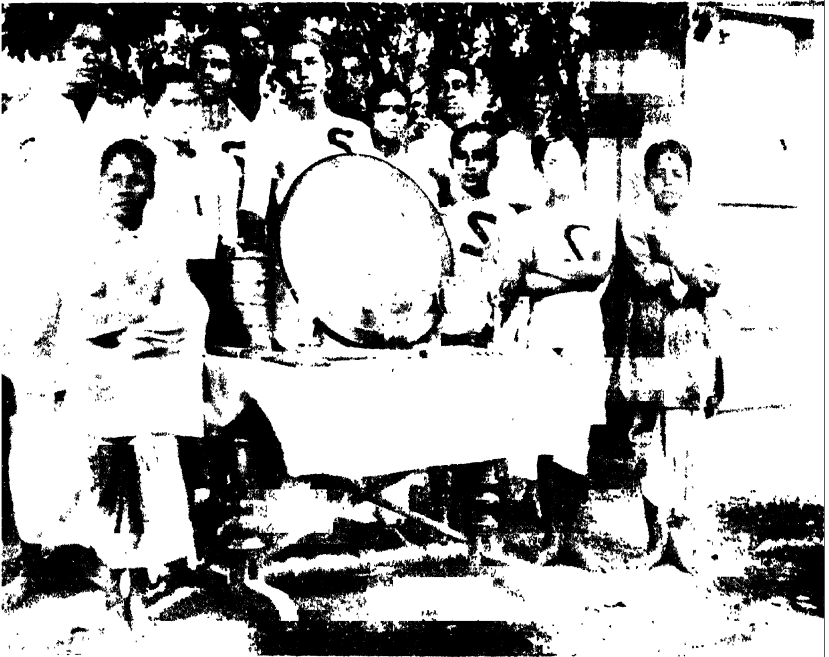
আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের একটি বাংলাতে। আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন; সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুন গুন করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন: ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি! ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিনুবাবু তখন থাকিতেন দেহলিবাড়িতে। পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যেটুকু সময় বেশি লাগিবে, সেটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো সুরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

তাঁহার গায়ে ছিল লম্বা বর্ষাতি; তাহাতে জল ঝরিতেছে; হাতে ছাতিটা বন্ধ; হয়তো পথে খুলিয়াছিলেন, কিন্তু গাছের ডালপালায় বাধিয়া গিয়াছিল, তাই বন্ধ করিয়াছেন; কিম্বা হয়তো খুলিবার কথা আদৌ মনে হয় নাই। ফলকথা তাঁহার এমন মত্ত ভাব আর কখনো দেখি নাই। উদাসীন দৃষ্টি সেই নিভৃত নীল পদ্মের দিকে বদ্ধ, দেহটা অভ্যাসের বসে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কাব্যে মত্ত গজরাজের পদ্মবন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি; এতদিন এই চিত্রটাকে কবিদের একটা কৃত্রিম অলংকারমাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নরশ্রেষ্ঠের এই ত্বরিত গতি দেখিয়া আমার মনে ঐ উপমাটা এক মুহূর্তে নূতন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি সেদিন জল-ঝরা বর্ষাতির আবরণে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল। সবসুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব!

এক সময়ে তিনি দেহলিবাড়িতে থাকিতেন। দেহলিবাড়ির দোতলায় পশ্চিমের কোণে বসিয়া লিখিতেন। সাধারণত সকালের দিকেই তাঁহার লিখিবার সময়। আমি তখন ঐ পাড়াতেই থাকিতাম। লিখিবার সময়ে মাঝে মাঝে কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। সেই উদাত্ত ধ্বনিতে পাড়ার সকলে বুঝিতে পারিত তিনি লেখায় নিযুক্ত।

অনেকের ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিত লোকের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন ছিল। ইহা মোটেই সত্য নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রচুর সময় নষ্ট করিয়া দিতে পারিত; কেবল একটু সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই।

দেহলিবাড়িতে যখন থাকিতেন একবার তাঁহার এক সম্পন্ন প্রজা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। লোকটি অনেক দূর হইতে আসিতেছে, কিন্তু কেহই তাহাকে কবিসন্নিধানে লইয়া যাইতে রাজি নয়। তখন কী করিয়া সে যেন আমাকে ধরিল। আমি তাহাকে অগোণে কবির কাছে লইয়া গেলাম। কবি আদৌ বিরক্ত না হইয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন। লোকটি আশাতীত খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক সহিষ্ণুতাও অসীম ছিল। সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া একাসনে দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিতেন, কখনো তাঁহাকে শরীরসংস্থান পরিবর্তন করিতে দেখি নাই। তাঁহার চেয়ে বয়সে যাঁহারা অনেক কম তাহারা সে সময়ের মধ্যে কতবার যে আসন-পরিবর্তন করিতেন তাহার ঠিক নাই।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়শক্তি যে অন্যান্য সকলের চেয়ে প্রবল, ইহার মধ্যে একটা রূপকের ভাব আছে। রূপক ছাড়িয়া দিয়া নিছক বাস্তব বিচারে বুঝিতে পারা যায়, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গ্রহণ করিবার শক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। রবীন্দ্রনাথের বেলায় ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন তাঁহার বয়স ষাটের উপরে তখনো দেখিয়াছি পূর্ণিমার আলোতে বিনা চশমায় ছাপানো কবিতার বই পড়িয়া শুনাইয়াছেন। উত্তরায়ণের উত্তর দিকে কিছু দূরে একটি তালগাছ আছে। শীতের সকাল-বেলায় উত্তরে-বাতাসে সেই তালের পাতায় মৃদু রব উঠিতেছিল, আমি সেখানে বসিয়া ছিলাম— আমার কানে মোটেই তা ধরা পড়িল না। রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নির্দেশের পরে আমি তাহা শুনিতে পাইলাম।

আশ্রমের কোথায় কোন্ ফুলটি আছে, কোথায় কোন্ লতাটির পত্রবিন্যাস কিরকম, কিছুই তাঁহার চোখ এড়াইত না। কোন্ ফুলের গন্ধের কী প্রকৃতি তিনি জানিতেন। 'নাম-না-জানা ঘাসের ফুলের' উল্লেখ তাঁহার গানে আছে— পুষ্পজগতের এই হরিজনদের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

একদিন কথায় কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, শব্দজগৎ ও দৃষ্টিজগতের মধ্যে একটাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলে তিনি চোখের দৃষ্টি ছাড়িতে রাজি আছেন। কথাটা আমার মনে রহিয়া গিয়াছে এবং এই সত্যের আলোয় তাঁহার কাব্য বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জগৎ বাণীময়; এই বাণীর সঙ্গে তাঁহার বাণী-বিনিময়; প্রকৃতির সঙ্গে মানবভাষায় নিরন্তর তাঁহার

উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে।—

> গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
> তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।

এই দুটি ছত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও কাব্যের ধুয়া ধ্বনিত হইতেছে। এ সেই শব্দ-জগতের কথা।

সাধারণ মানুষেরা বিধাতার কয়লা মাপিবার দাঁড়িপাল্লা, পাঁচ সের কম-বেশিতে পাল্লার ভারব্যত্যয় ঘটে না; আর প্রতিভাবানেরা বিধাতার হীরকখণ্ড মাপের অতিসূক্ষ্ম নিক্তি, একচুল কমবেশি হইলেই নিক্তিতে তাহা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সূক্ষ্মগ্রাহী নিক্তি বিধাতা আর তৈরি করিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন।

প্রাক্-পঞ্চাশ ও পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথে অনেকে বৈষম্য লক্ষ্য করেন। অনেকের মতে পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ কেমন যেন বিবিক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক-সম্বন্ধ-অসহিষ্ণু, কেমন যেন শীতল। তাঁহারা যেন বলিতে চান, নোবেল পুরস্কারের মতো জগৎকাম্য দুর্লভ খ্যাতিতে ইহা ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারে নোবেল পুরস্কারটা আকস্মিক, কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত নয়। এই প্রসঙ্গ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-চরিত্রের পরিণাম আরো একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

আবার গ্যয়্টে-চরিত্রের সূত্র অবলম্বন না করিয়া উপায় নাই। গ্যয়্টের জীবনেও ঠিক এমনি একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত ইটালিযাত্রা ঘটে। সেই ক্লাসিকাল শিল্পের দেশে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাটাইয়া হ্বাইমার-এর সমাজে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানকার সবাই লক্ষ্য করিল গ্যয়্টে কেমন যেন বিবিক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, শীতল হইয়া গিয়াছেন— যেন অহংকারজাত নির্লিপ্ততা। তাঁহার পূর্বতন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ দুঃখিত হইলেন, কেহ রুষ্ট হইলেন, অনেকেই তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

গ্যয়্টের জীবনের পরিবর্তনটা কী? অল্পকাল তিনি ইটালিতে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি ক্লাসিক্যাল শিল্পের ভিতর দিয়া এমন এক উদার শান্তসমাহিত শাশ্বত জীবনাদর্শ পাইলেন যাহাতে পূর্বতন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের রাজধানীর জীবন তাঁহার কাছে অবান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইল; তিনি যেন নূতন এক জগতে জন্মগ্রহণ করিলেন, যাহার ফলে পুরাতন জগতের সঙ্গে

তাঁহার সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এই দ্বিজত্বের ফলেই মহত্তর গ্যয়্টের জন্ম, যে গ্যয়্টে আর জার্মানির কবি মাত্র নহেন, মানুষের কবি। ইতিপূর্বে তিনি জার্মানজাতিকে মাত্র জানিতেন, এবারে তিনি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া মানুষকে মানুষরূপে দেখিতে পাইলেন।

পঞ্চাশের পরে রবীন্দ্রনাথও প্রায় দুই বছর ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিলেন—ইহা তাঁহার তীর্থভ্রমণ। এই তীর্থদেবতা কোনো জাতি নয়, কোনো ধর্ম নয়, জাতিধর্মসম্প্রদায়মুক্ত মানব। এই দেবদর্শনের ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে দেশে ফিরিয়া পূর্বতন গণ্ডির মধ্যে আর পূর্ব স্থানটি তিনি তেমনভাবে অধিকার করিতে পারিলেন না। এই মানবদর্শনের ফলে মহত্তর রবীন্দ্র-প্রতিভার সমুদ্ভব।

গ্যয়্টে খণ্ড ক্ষুদ্র বহুধাবিভক্ত জার্মান সামন্তরাজ্যের অধিবাসী, ক্লাসিকাল শিল্পের মধ্যে তিনি মানুষের উদার মূর্তি দেখিতে পাইলেন; ইউরোপীয় জীবনের নিরন্তর আন্দোলন হইতে ক্লাসিকাল শিল্পের শান্তসমাহিত জীবনোপকূলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আত্মস্থ হইবার সুযোগ পাইলেন। রবীন্দ্রনাথও বাঙালীর ক্ষুদ্র জীবন হইতে বিদেশে গিয়া মানুষের পরিপূর্ণ রূপটি দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার ভারতীয় শান্ত জীবনাদর্শের উপর বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনতরঙ্গ আসিয়া পড়িয়া তাঁহার স্তিমিত প্রতিভাকে পুনরায় প্রাণচঞ্চল করিয়া দিল। গ্যয়্টের পরিণতির পক্ষে প্রয়োজন ছিল এক রকম, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রয়োজন আর এক রকম। কিন্তু দুজনেরই জীবনে এই দুটি ঘটনায় মহৎ পরিবর্তন ঘটিল, যাহার ফলে জগতের দুই মহাকবির আবির্ভাব। এমন মানুষকে পূর্বের স্থানে ধরিবে কেমন করিয়া? ভোরবেলা যদি জাগিয়া দেখি উদ্যানের সযত্নরোপিত পুষ্পবৃক্ষটি বনস্পতি হইয়া উঠিয়াছে, তবে তাহার উপরে রাগ না করিয়া উদ্যানের সীমাকে বড়ো করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের আয়তন বড়ো করা সহজ নয় বলিয়াই, সে বড়োকে অস্বীকার করিবার সহজতর সমাধান করিতে প্রয়াস পায়। সে সমাধান ব্যর্থ হয় বলিয়াই সে বড়োর উপরে রাগ করে, তাহাকে অহংকারী বলে, আসলে তাহা নিজের ক্ষুদ্রতার জন্য নিজের প্রতি অবচেতন ধিক্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা, শান্তিনিকেতনে প্রধানত তিনি শিক্ষক। শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে তাঁহার শিক্ষাতত্ত্ব জানা দরকার; তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বের মূলে আবার তাঁহার নিজের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা তিনি নিজে একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ একটা বিষম ভাবসংকটে পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার বোধ হইল বিদ্যালয়গুলি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন একটা অসম্ভব বস্তু। এক দিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ যেমন তাহাতে নাই, তেমনি আবার আর-এক দিকে মানবীয় সম্পর্কের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা। সংসারে মানুষ পিতা-পুত্র ভ্রাতা-ভগ্নী; কিন্তু বিদ্যালয়ে দুটি মাত্র শ্রেণী, ছাত্র ও শিক্ষক। সংসারে ছাত্র ও শিক্ষক -রূপে কেহ জন্মগ্রহণ করে না, কাজেই এই দুই শ্রেণীভাগ স্বাভাবিক নয়। ফলে বালকেরা, সেখানে গিয়া পারিবারিক স্পর্শ পায় না; মানুষ, বিশেষ-ভাবে বালকেরা হৃদয়ের স্পর্শ আশা করে; কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকে যেটুকু যোগ তাহা কেবল বুদ্ধিতে, কাজেই সেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে লেনদেন নাই, কেবল মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। এই অস্বাভাবিকতা তাঁহার কাছে দুঃসহ বোধ হইল, ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহাকে বলে তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।

প্রত্যেক ভাবপ্রবণ বালকই বোধ করি প্রথমে মানবসম্পর্কের অভাব অনুভব করে; শেষে তাহাদের হৃদয় ইহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। প্রকৃতির স্পর্শের অভাব সবাই অনুভব করে না; বালক কবি এই অভাবটিও অনুভব করিয়া-ছিলেন, কারণ তিনি প্রকৃতির অন্ধ অনুরাগ লইয়া জন্মিয়াছিলেন।

পরিণত বয়সে যখন তিনি বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন তখন নিজের বাল্যকালের দুঃখ অনুভব করিয়া বালকদিগকে এই দ্বিবিধ দুঃখ হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

এই বিদ্যালয়কে পরিবারাশ্রম বলা যাইতে পারে। ছাত্রত্ব এখানকার ছাত্রদের রূপ নয়, এখানে তাহারা প্রধানত বালক বালিকা। নিজেদের পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আশ্রম-পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে তাহারা যেন পারে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম আমলে বিদ্যালয়টি তাঁহার নিজের পরিবারের অন্তর্গত ছিল বলিলেও হয়। তাঁহার পত্নী বালকদের জননী-স্থানীয়া ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের পুত্রদের ও অন্যান্য ছাত্রদের

মধ্যে বাসাহারে কোনো প্রভেদ ছিল না, শিক্ষকেরাও এই পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নীবিয়োগের পরে ও ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধিতে এই পরিবার-ভাবটি কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু এই পরিবারচৈতন্যই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখানে কবিপত্নী সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের জ্যোতির প্রভাবে এই মহীয়সী মহিলার প্রভা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, শান্তিনিকেতন-স্থাপনে তিনি যেমন সর্বতোভাবে নিজের সাহচর্য, শক্তি, এমন-কি, অনটনের দিনে অলংকারগুলি পর্যন্ত দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, সংসারে তাহা একান্ত বিরল। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাসের পাতায় ইহাদের স্মৃতি স্নেহের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। কবিপত্নী জীবিত থাকিলে বিদ্যালয়-পরিবারটি নিশ্চয় আরো সুপিনদ্ধ হইয়া উঠিত।

এই যেমন মানবসম্পর্কের কথা গেল, তেমনি বিদ্যালয়টি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে স্থাপিত হওয়াতে বাল্যকাল হইতেই ছাত্রেরা প্রকৃতির আকর্ষণ অনুভব করিত। এই আকর্ষণের প্রত্যক্ষ বিচার তেমন সম্ভব নয়, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রকৃতির স্পর্শ দ্বিতীয় মাতৃস্তন্যের মতো তাহাদের দেহে মনে অবচেতনভাবে সঞ্চারিত হইয়া যাইবার পূর্ণ সুযোগ এখানে পায়।

রবীন্দ্রনাথের জগৎ, ভগবান মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়া। ছাত্রদের যথার্থভাবে জগতের অধিবাসীরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে এই তিন সত্তা সম্বন্ধেই তাহাদের সচেতন করিয়া তোলা দরকার। সেইজন্য শান্তিনিকেতনে ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য ইহা সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নহে। সর্বধর্মগ্রাহ্য মূল কথাগুলিই কথিত হইয়া থাকে।

প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার নির্বাসন; প্রকৃতির স্পর্শ প্রভৃতি কথা বাতুলের প্রলাপ। আর মানবীয় সম্বন্ধও ছাত্র-শিক্ষকের সংকীর্ণ পরিধিতে পর্যবসিত। এই-সকল বিদ্যালয়ে কেবল বুদ্ধির তরবারিচালনা শিক্ষা হয়। বুদ্ধির তো মমত্ব নাই, ফলে এই তরবারি কখনো ছাত্রদের ঘাড়ে পড়ে, কখনো শিক্ষকদের।

আজকাল বিদ্যালয়সমূহে ধর্মঘট আর আকস্মিক নয়, নিত্যকার ঘটনা। তাহার কারণ এখানে ছাত্র শিক্ষক কর্তৃপক্ষ কেহই সমোদ্দেশ্য নয়! সকলের পথ এক, লক্ষ্য এক হইলে ঠেলাঠেলি হইবায় কথা নয়, কিন্তু প্রত্যেকে যেখানে

প্রত্যেকের বিরুদ্ধগামী সেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে— তার উপরে আবার হাতে বুদ্ধির অন্ধ অথচ শক্তিমান অস্ত্র তো আছেই।

কিন্তু যে বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ সমোদ্দেশ্য, সমলক্ষ্য, সেখানে সংঘর্ষের কারণ থাকে না। শান্তিনিকেতনের চল্লিশবর্ষাধিক জীবনে কখনো ধর্মঘটের কারণ ঘটে নাই। হুয়েন সাং লিখিয়াছেন, নালন্দার সাতশতবর্ষাধিক জীবনে কোনোদিন ধর্মঘট সংঘটিত হয় নাই।

বুদ্ধি মানুষের বহু বৃত্তির অন্যতম। বুদ্ধি উত্তম ভৃত্য, কিন্তু দুর্দান্ত প্রভু। একমাত্র বুদ্ধির চর্চা হয় বলিয়া প্রচলিত বিদ্যাগুলিতে বুদ্ধিই প্রভু এবং দুর্দান্ত প্রভু। এখন ইহার প্রচণ্ডতাকে হ্রাস করিতে হইলে মানুষের কোমলতর বৃত্তি-গুলির জাগরণের প্রয়োজন। শিল্পকলার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কিন্তু তাহার কোনোই ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নাই। শিল্পচর্চা, বিশেষত ছবি ও গান, শান্তিনিকেতন-জীবনে প্রধান অঙ্গ।

এ বিষয়ে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একেবারে অন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাতে যে-সব ছাত্র অসাধারণত্ব দেখাইয়াছে তাহাদের কারো কাছে একখানি ছবি আনিয়া দাও, সে অকূল সাগরে পড়িবে। সেখানা ভালো কি মন্দ সে জানে না, তাহার উদ্দেশ্য কী জানে না। চিত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে হয়তো সে স্থূল কথাগুলিও জানে, কিন্তু ছবি দেখিবার সৌভাগ্য কখনো তাহার ঘটে নাই। সংগীত সম্বন্ধেও সেই কথা। গানের জন্য দরকার কান তৈরি হওয়া, ছবির জন্য চোখ; এ দিক দিয়া যে পরিমাণে তাহার চোখ-কান থাকা দরকার তা না থাকাতে সে সেই পরিমাণে অন্ধ ও বধির; ফলে জগৎ-রস হইতে সেই পরিমাণে বঞ্চিত।

শান্তিনিকেতনকে চিত্র ও সংগীতের দানসত্র বলিলেও চলে। রবীন্দ্র-সংগীতের ইহা ঝর্নাতলা। সকাল হইতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত এখানে নানা উপলক্ষে গানের ঝর্না ঝরিতেছে— তাহারই শীকরে সকলের মন অভিষিক্ত হইয়া যায়, গানে ও ছবিতে মিলিয়া চিত্তপটে অক্ষয় ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইতে থাকে।

সকলেই যে গান করিতে পারিবে এমন নয়, কিন্তু গান উপভোগ করিবার কান অল্পবিস্তর সবাই লাভ করিতে পারে। যে'ছবি আঁকিতে না জানে তাহার পক্ষেও ছবি উপভোগ করা সম্ভব। ছবি ও গান, শুধু ছবি ও গান উপভোগের জন্য নয়; জগৎটা ছবিরূপে সংগীতরূপেই তো ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হইতেছে; ছবি

ও গানের চোখ-কান থাকিলে জগৎ-উপলব্ধি বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। শিল্পীর জগৎ সাধারণ লোকের জগতের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক রহস্যময়, অনেক ঐশ্বর্যবত্তর।

ছবি ও গান এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গীভূত। ছবি ও গান -শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহার চেয়েও বড়ো কথা এই যে ছবি ও গানের একটা আবহাওয়া এখানে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তার ফলে শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য সকলেও পরোক্ষে ইহার সুফল ভোগ করে। শিল্পজাহ্নবী এখানকার দুই কূল শ্যামল শোভন উর্বর করিয়া প্রবাহিত ; স্নান পান যে করিল সে তো ধন্য ; কিন্তু নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও এই পুণ্য সমীরণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আর-একটা প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে শিশুকে অত্যন্ত বেশি শিশু এবং বয়স্ককে একেবারে সর্বজ্ঞ মনে করা হয়। মানুষ কখনোই একেবারে শিশু নয়, আবার সর্বজ্ঞও নয় ; শৈশব তাহার কখনো ঘোচে না, আবার সর্বজ্ঞতাও কখনো আসে না। শৈশবের কৌতূহলকে বজায় রাখিয়া মানুষকে পরিণত করিয়া তোলাই বোধ করি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শিশুকে একান্তভাবে শিশু মনে করা হয় বলিয়া তাহাকে অনেকখানি বঞ্চিত করিয়া, অনেক বাদসাদ দিয়া, শিশুশিক্ষা দেওয়া হয়। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্র দিলে মানুষ তাহার চেয়েও কম পাইয়া থাকে। আর, ঠিক কতটুকু কাহার প্রয়োজন তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিবে! এ বিষয়ে প্রকৃতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। প্রয়োজনের বিচার না করিয়া সে দানের পাত্র পূর্ণ করিয়া দেয়। আমের ফলনের বিচার করিয়া সে আমের মুকুল ধরায় না।

সম্প্রতি বাংলাদেশে যে শিশুসাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূলে আছে এই সর্বনাশা বুদ্ধি। এই শিশুসাহিত্যের বই যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে দুধের সঙ্গে কী পরিমাণ জল মিশ্রিত। ফলে এই-সব বই হইতে শিশুরা যেটুকু পায় তাহাতে তাহাদের পুষ্টি হয় না ; এই-সব গ্রন্থকারদের প্রধান লক্ষ্য মুখরোচন, দেহপোষণ নয়।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের একান্তভাবে শিশু মনে করা হয় না। এখানকার নিম্নতম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যতালিকা লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকিবে না। এই-সব বই কলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে দিতেও অনেকে সংকোচ বোধ করিবেন।

ছোটো ছেলেরা অবশ্য ইহার সবটুকু বোঝে না; কিন্তু মনের পরিণতির পক্ষে না-বোঝা অংশেরও একটা আবশ্যক আছে। গণিত সবটুকু না বুঝিলে ষোলো-আনা না-বোঝারই শামিল, তেমনি সাহিত্যে সবটুকু বুঝিলে ষোলো-আনা না—বোঝারই শামিল; রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি নীচের দিকের শ্রেণীতে তিনি কীট্স-এর অটাম বা শেলির ইন্‌টেলেক্‌টুয়াল্ বিউটি পড়াইতেছেন। সেখানে বয়স্ক শ্রোতাও গিয়া বসিত। তাঁহার ব্যাখ্যার দানসত্র অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশি পাইত; এই উদ্‌বৃত্ত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য। তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রশ্ন করিয়া করিয়া বালকদের মুখ দিয়া ঠিক শব্দটি বাহির করিয়া লইতেন— ইহাতে তাঁহার শ্রান্তি বা অসন্তোষ দেখি নাই। বালকেরা প্রশ্নের ঈঙ্গিত ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে নিজেদের শক্তি আবিষ্কার করিত। আত্মশক্তির আবিষ্করণই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন বাংলা বলিলে কম বলা হয়— এখানকার জীবনেরই বাহন বাংলা ভাষা। সভাসমিতি, বক্তৃতা, তর্ক, প্রবন্ধরচনা, চিঠিপত্র, এমন-কি, একটু চিরকুট লেখাও বাংলায় হইয়া থাকে। ইংরেজি-পাঠনের ভাষাও বাংলা। এই প্রথা সেখানে আছে বলিয়া অতি অনায়াসে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছেলেরা প্রবেশ করিতে পারে। বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ; তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না। ইংরেজি বাঁধাবুলির ব্যবহারে বাল্যকাল হইতে এখানকার ছেলেরা অভ্যস্ত নয় বলিয়া হয়তো কখনো কখনো তাহাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু বিদেশী বাঁধাবুলির শক্তি অস্ত্রের শক্তি, তাহা দেহের শক্তি নয়; অস্ত্রকে শক্তিশালী করিবার চেয়ে দেহকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানকার ছাত্রদের মনের পূর্ণতা অন্য বিদ্যালয়ের অনুরূপবয়স্ক ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া থাকে ইহা বারংবার লক্ষ্য করিয়াছি।

বালকবালিকাদের একত্র শিক্ষালাভের যে প্রথা এখন ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে তাহার প্রথম পরীক্ষা এইখানেই হইয়াছে। ইহাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ।

এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার আর-একটা লক্ষণীয় বস্তু আছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাহারা দিবার রীতি এখানে নাই। ছাত্ররা প্রশ্নপত্র পাইয়া যাহার

যেখানে খুশি গিয়া বসে, লেখা শেষ হইলে খাতাগুলি নির্দিষ্ট স্থানে দিয়া যায়। আমার অভিজ্ঞতায় কখনো নকল করার অভিযোগ শুনি নাই। ছাত্রদের বিশ্বাস করিলে তাহারাও বিশ্বাস রক্ষা করিতে জানে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক অঙ্গই ক্রমে বাংলাদেশ গ্রহণ করিতেছে। বাংলাভাষার মাধ্যম এখন স্বীকৃত; সহশিক্ষা প্রসারিত হইতেছে; কোনো কোনো মহলে শিল্পশিক্ষাদানের কথাও শোনা যায়। ছাত্রদের পরীক্ষায় পাহারা না দিবার প্রথাও বাংলাদেশের গ্রহণ করা উচিত। প্রথম প্রথম ইহার অপব্যবহার ঘটিবে নিশ্চয়, কারণ কর্তৃপক্ষের দোষেই ছাত্রদের অভ্যাস খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবে তখন আর ব্যাপক অপব্যবহার না ঘটিবারই সম্ভাবনা। অবিশ্বাস করিয়া কর্তৃপক্ষের দোষী হওয়ার চেয়ে নকল করিয়া ছাত্রদের দোষী হওয়া শ্রেয়। তাহাদের বয়স কম, ত্রুটিসংশোধনের আশা আছে; পলিতকেশ হেড্‌মাস্টারের যে তিন কাল গিয়াছে, তিনি কবে আর ছাত্রকে অবিশ্বাসের মহদ্‌দোষ হইতে মুক্ত হইবেন?

আরো রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার বাতিক ছিল, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার দক্ষতাও ছিল। আশ্রমের কাহারো অসুখ হইয়াছে শুনিলে আগ্রহ-সহকারে তাহাকে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন। অন্যত্র রোগী চিকিৎসক খুঁজিয়া বেড়ায়, এখানে চিকিৎসক রোগী খুঁজিয়া বেড়াইতেন।

রোগীকে ঔষধ পাঠাইয়া দিয়া সে কেমন আছে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেন। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এই সংবাদই প্রায় পাইতেন।

তাঁহার আবার এক-একটা ঔষধের উপর খুব বেশি ঝোঁক ছিল। 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন' নামে একটা পাঁচনের উপর তাঁহার আস্থার অবধি ছিল না। এটা তাঁহার কাছে মকরধ্বজের ন্যায় সর্বরোগহর ছিল বলিলেও চলে। সকালবেলা হাস-পাতালে এই পাঁচন প্রচুর তৈরি হইত, সকল ছাত্রের পক্ষেই ইহা অবশ্যপানীয় ছিল।

সকালবেলা আমরা যখন জলযোগের পূর্বে লাইন করিয়া দাঁড়াইতাম তখন অক্ষয়বাবু চার-পাঁচটি বড়ো বোতল হাতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন; প্রত্যেককে খানিকটা করিয়া পাঁচন গিলাইয়া দিতেন। মুখ ঘুরাইয়া যে ফেলিয়া দিব

তাহার উপায় ছিল না, কারণ কাপ্তেনদের মধ্যে দু-একজন সেই আশঙ্কা করিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইত। এইভাবে 'বাধ্যতামূলক' পাঁচন-গ্রহণ শেষ হইলে তবে জলযোগ মিলিত।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে হাসপাতালের রোগীদের খবর লইতেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে মুষ্টিযোগ পাঠাইয়া দিতেন। একবার এইরকম এক মুষ্টিযোগের পাল্লায় আমি পড়িয়াছিলাম।

তখন আমার বয়স অল্প ; ফুটবল খেলিতে গিয়া পা মচ্‌কাইয়া ফেলিলাম ; হাসপাতালে গিয়া শুইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তিনি এই সংবাদ পাইয়া ধুতুরার পাতা এবং আরো কী কী দিয়া এক প্রলেপ পাঠাইয়া দিলেন। নির্দেশ ছিল আহত স্থানে তাহা লাগাইয়া দুইদিন বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দুইদিন পরে যখন পা খোলা হইল তখন সমস্ত জায়গাটা ফোস্কায় ভরিয়া গিয়াছে। ফলে আরো কয়েক দিন বেশি শুইয়া থাকিতে হইল। এই ব্যাপারে চিকিৎসকের প্রতি আমার যে মনোভাব হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলে গুরুনিন্দা হইবে এই আশঙ্কায় কিছু না লেখাই ভালো।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণের বৈকালিক চা-পানের জন্য একটি আসর ছিল ; চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুজব চলিত। ইহার আগে দিনুবাবুর বাড়িতেই যেন এই আসরটি জমিত ; তার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া লাইব্রেরির দোতলায় ইহার রাজসংস্করণ আরম্ভ হইল। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন চক্রপতি ; তাঁহার বিপুল কলেবরকে ঘিরিয়া অন্যান্য অধ্যাপকগণ সূর্য-সনাথ গ্রহমণ্ডলের মতো চায়ের পেয়ালার উপগ্রহ-সহ বিরাজ করিতেন।

মাঝে মাঝে আমরা ঠিক করিতাম আজকার কথাবার্তার মধ্যে ইংরেজি শব্দ যে উচ্চারণ করিবে তাহাকে প্রতি ইংরেজি শব্দের জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। এক-একদিন জরিমানা অল্প আদায় হইত না।

এইরকম এক দিনে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা ভাবিলাম আজ ভাগ্য ভালো, মোটারকম কিছু আদায় হইবে। তাঁহাকে নিয়মটা শুনাইয়া দেওয়া হইল। এক ঘণ্টার উপরে গল্পগুজব চলিল। তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হইতে লাগিল বিষয়ের স্রোতে ইংরেজি শব্দ স্বভাবতই যাহাতে আসিবার সম্ভাবনা। কিন্তু হায়, একটি বিদেশী শব্দও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সেদিন আমাদের কোষাধ্যক্ষের মুখ ভারী। রবীন্দ্র-

নাথ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এতগুলি নিরীহ লোকের আশাভঙ্গের কারণ হইয়া রহিলেন না; দু-একদিন পরেই সমস্ত চা-চক্রীদের উত্তরায়ণে চায়ের নিমন্ত্রণ হইল।

রবীন্দ্রনাথের বৈকালিক চায়ের টেবিলে অধ্যাপকদের অনেকেরই ডাক পড়িত; দু-একজন তো নৈমিত্তিক হইতে নিত্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। নানা রকম ফল ও মিষ্টিতে টেবিল ভরা থাকিত; তিনি সামান্যই খাইতেন, কিন্তু টেবিল ষোড়শোপচারে সাজাইয়া রাখিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার নিয়ম। ইহা যে একেবারে অকারণ ছিল তাহা নয়; কারণ, আহূত ছাড়াও রবাহূত অনাহূত অনেকে গিয়া জুটিত। মাঝে মাঝে আমিও গিয়া জুটিতাম— কী করিয়া ঠিক ঐ সময়েই তাঁহার কাছে আমার কাজের কথা মনে পড়িয়া যাইত। তখন তাঁহার খাস খানসামা ছিল সাধুচরণ। আমাকে দেখিলে তিনি সাধুচরণকে বলিতেন, "ওরে, ভালো করে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করিস।" সাধুচরণের নামের সার্থকতা লইয়া রবীন্দ্রনাথের হয়তো সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমার কখনো অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। আমার সযত্ন চেষ্টার ফলে টেবিলের উপর প্লেটগুলি ছাড়া আর-কিছু যখন বাকি থাকিত না তখন তিনি আরো এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া পান করিতে বলিতেন। আহার্য সম্বন্ধে আমার উদারতা দেখিয়া তিনি মনে মনে কী ভাবিতেন জানি না। হয়তো ভাবিতেন গুরুর খাদ্য শিষ্যের পক্ষে বা গুরুপাক হইয়া পড়ে! বোধ করি তাহারই প্রতিষেধক হিসাবে একাধিক পেয়ালা চা পান করিলে তবে উঠিতে দিতেন।

আমার অত্যুৎসাহী লোলুপতা মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে বিপদ্‌গ্রস্তও হইত। একদিন দুপুরবেলা তিনি কী একটা বই যেন পড়াইতেছেন, বোধ করি ব্রাউনিঙের কোনো নাটক হইবে। এমন সময়ে সাধুচরণ তাঁহার হাতে একটি কাচের গেলাসে করিয়া কী একটা পানীয় আনিয়া দিল। কাঁচা সোনার মতো তাহার বর্ণ। তিনি পান করিতেছেন, আর আমার লুব্ধ দৃষ্টি ঐ গেলাসটার চারি দিকে মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। পান শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কী রে, খাবি নাকি?" আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "তা মন্দ কী!" তিনি সাধুচরণকে ইঙ্গিত করিলেন। সাধুচরণ আর-একটি গেলাসে পানীয় আনিয়া দিল। আমার সহপাঠী অধ্যাপকগণ তখন আমার সৌভাগ্যের নিশ্চয় ঈর্ষা করিতেছিলেন। এক চুমুক পান করিয়া দেখি, নিমের পাতা-সিদ্ধ জল। সর্বনাশ! এ যে নিদারুণ

রসাভাস! কিন্তু, তখন তো আর ফিরিবার উপায় ছিল না; তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে হাসিমুখে গিলিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরকম লাগল?" আমি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলিলাম, "চমৎকার! এইরকম জিনিস আপনি প্রত্যেক দিন খান!" আমার কথা শুনিয়া সহপাঠীদের অনেকের রসনা নিশ্চয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ অনেকেই উসুখুসু আরম্ভ করিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ রহস্যভেদ করিয়া দিয়া বলিলেন, "আপনারা অকারণ চঞ্চল হবেন না, নিমের জল!" তাঁহাদের সন্দেহ যে ইহাতে সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল তাহা মনে হয় না; তাঁহারা হয়তো ভাবিলেন, কৌশল করিয়া ইঁহারা দুইজনে ব্রাউনিঙের নীরসতা খানিকটা সরস করিয়া লইলেন।

বৈকালিক চায়ের আসরের পরে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্যবৈঠক ধীরে ধীরে জমিতে আরম্ভ করে।

এখনকার উত্তরায়ণের বৃহৎ প্রাসাদ তখন তৈয়ারি হয় নাই; উত্তর দিকে দুখানি ছোটো কোঠাঘর মাত্র ছিল। তাহারই একখানিতে রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন।

সে একটি অদ্ভুত বাড়ি। বাড়িটিতে পাঁচ-সাতটি ছোটো-বড়ো কক্ষ; কোনোটির ছাদ অপরটির সঙ্গে সমতল নয়। উঁচু, নিচু, আরো উঁচু, আরো নিচু ছাদের বিচিত্র সমবায়। উপরে উঠিবার সিঁড়ি নাই— এক ছাদ হইতে উচ্চতরটিতে অনায়াসে ওঠা যায়। ঘরের দরজা জানলা বলিয়াও বিশেষ কিছু নাই; সবই দরজা, সবই জানলা; দেয়ালের চেয়ে ফাঁকের অংশই বেশি; চারি দিকে ছোটো বড়ো নানা মাপের বারান্দা। ঘরে আসবাবপত্রও বিরল; খানকয়েক চেয়ার ও অনেকগুলি মোড়া মাত্র; মাঝখানকার বিস্তৃততর ঘরটাতে আগাগোড়া শতরঞ্জি পাতা, শতরঞ্জির উপরে চাদর; তাহার এক দিকে কবি বসেন, চারি দিকে শ্রোতার দল। ঘরের চারি দিকে নানা জাতের গাছ; কতক বা বুনো, কতক সযত্নরোপিত। পশ্চিম দিকে লজ্জাবতী ও কন্টিকারির খেত; পুবে উত্তরে নিম লেবু আর ঝুম্‌কো ফুলের লতা; কাঁকর-ঢালা পথের দুই ধারে সারবাঁধা বেলফুলের চারা।

পুবের বারান্দায় চায়ের টেবিল। চায়ের সরঞ্জাম সরাইয়া লইবার পরেও তিনি সেখানেই বসিয়া থাকিতেন। একে একে শ্রোতার দল আসিয়া পড়িলে বারান্দার মোড়াগুলি ভরিয়া যাইত।

হয়তো কলিকাতা হইতে দু-একজন অনুরাগী আসিয়াছেন, প্রশান্তবাবু ও রামানন্দবাবু। অদূরবর্তী বাড়ি হইতে পুব দিকের মাঠ ভাঙিয়া দিনুবাবু পাল-

তোলা প্রকাণ্ড বজরার মতো দ্রুত চলিয়া আসিতেছেন ; পুব-দক্ষিণ কোণ হইতে সন্তোষবাবু ও তেজেশবাবু ধীরে ধীরে আসিলেন ; সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া উত্তর দিক হইতে ক্ষিতিমোহনবাবুর আগমন ; সান্ধ্যভ্রমণে বাহিরে হইয়া শাস্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; নেপালবাবুর দীর্ঘসূত্রিতা সর্বজনজ্ঞাত, তিনি বেলা তিনটায় উত্তরায়ণ বলিয়া রওনা হইয়াছিলেন, পথে বহুলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বহু আলাপ করিতে করিতে সকলের শেষে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে উত্তরায়ণে আসিয়া পৌঁছিলেন। নেপালবাবু আসিলে বুঝিতে পারা গেল সভা আরম্ভের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর কাহারো আসিবার সম্ভাবনা নাই। ততক্ষণে মোড়ার আর একটিও খালি নাই। লেখক প্রভৃতির মতো বয়স যাহাদের অল্প, যাহাদের খুচরা বলিয়া ধরা হয়, তাহারা এ দিকে ও দিকে দাঁড়াইয়া জটলা করিতে লাগিল। নন্দলাল-বাবু কখন সকলের অগোচরে আসিয়া পিছনে বসিয়াছেন।

বারান্দায় বসিয়া থাকার সময়ে প্রধানত সাময়িক প্রসঙ্গ ও দেশের খবরাখবর আলোচনা হয়। কবির প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দবাবু নিজের মত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে নেপালবাবু আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়া ওঠেন, "সকলেই আপনার অপেক্ষা করছিলেন, নেপালবাবু।" নেপালবাবু সপ্রতিভভাবে বলিয়া ওঠেন, "আজ তো আমার দেরি হয় নি, অনেক-ক্ষণ রওনা হয়েছি।" সকলেই হাসিয়া ওঠেন, নেপালবাবুও হাসিতে থাকেন।

তখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এবারে ভিতরে যাওয়া যেতে পারে।" ততক্ষণে শীতও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার আগেই শাস্ত্রীমহাশয় "সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হইয়াছে" বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

সকলে ভিতরে গিয়া বসেন। রবীন্দ্রনাথ এক দিকে, অন্য দিকে সকলে ঠাসা-ঠাসি করিয়া। তিনি বলেন, "এ দিকে এগিয়ে বসুন-না।" কিন্তু তাঁহার দিকে কেহ অগ্রসর হইতে চাহেন না। ঘরের অপর প্রান্তে কয়েকজন মহিলাও বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ। তখন ক্ষিতিমোহনবাবু সাহসে ভর করিয়া বলেন, "নূতন কবিতা কিছু আছে কি ?"

"আছে, তবে আপনাদের কেমন লাগবে জানি না।" এই বলিয়া তিনি বাঁধানো খাতাখানি লইয়া বার কয়েক পাতা উল্টাইয়া কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন :

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি ?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল 'আহা আহা'
সকল বনভূমি ?

সেটি শেষ হইলে আবার নূতন একটি আরম্ভ করেন :

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎ-স্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।

পাঠ শেষ হইলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের বাতাস থম্‌থম্‌ করিতে থাকে, কেহ কথা বলে না। শেষে রবীন্দ্রনাথই আরম্ভ করেন, হয়তো কবিতা দুটির অনুপ্রেরণার অভিজ্ঞতা, হয়তো তৎসংক্রান্ত আরো কিছু। এক কোণে বসিয়া সন্তোষবাবু খাতায় তাহা টুকিয়া লন।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তার স্রোত মন্দ হইয়া আসে। তখন হয়তো রামানন্দবাবু বলেন, "নূতন কোনো গান ?"

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দিনু, এবার তোর পালা। বুঝলেন রামানন্দবাবু ? এখন আমার গানের রাজ্যে শীতের পালা চলছে।"

দিনুবাবু এক কোণে বসিয়া ছিলেন, সেখান হইতে মাথা নিচু করিয়া গান ধরেন :

শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই ফুরোলো,
আমার শীতের বনে এলে যে—

দিনুবাবুর সুরের ইন্দ্রজালে ঘর ছাপাইয়া যায়, সুর মাঠের মধ্যে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে।

গান শেষ হইলে শ্রোতারা একে একে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়ে। সবাই চলিয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ বারান্দার চেয়ারটাতে আবার গিয়া বসেন—কতক্ষণ বসিয়া থাকেন কে জানে! মৌন প্রকৃতির সঙ্গে একক কবির কী নীরব বাণী-বিনিময় হইতে থাকে কে বলিতে পারে!

এক-একদিন রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য আসর রীতিমত অভিনয়মঞ্চে পরিণত হয়। মাঝখানকার হলটাতে, সেটাকে রঙ্গমঞ্চও বলিতে পারা যায়, অভিনয়ের ক্ষেত্র।

আলোতে আল্পনায়, ফুলে পল্লবে, সাজসজ্জায় সবসুদ্ধ ঝল্মল্ করে। দর্শকেরা বারান্দায় বসে, নীচের জমিতে চৌকির উপরে বসে। রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের নীচেই উপবিষ্ট। তার পরে ইঙ্গিতমাত্রে আলো উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে, মণিপুরী বাদকের খোল-করতাল উত্তাল হয়, তানপুরা এস্রাজ ঝংকার দিয়া ওঠে— আর অমনি নেপথ্য হইতে সুসজ্জিতা বালিকারা রঙের বন্যার মতো নাচের তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে :

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।
আমার মন কয়, চিনি চিনি ॥

তখন গানে নাচে আলোতে বাদ্যে সব একাকার হইয়া গিয়া একটিমাত্র শিল্পের অপরূপ ইন্দ্রধনুতে পরিণত হয়। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের পাঁচ আঙুলে দর্শকের চিত্তে টান পড়ে— সেই রসজাহ্নবীতে তাহাদের আপাদমস্তক অভিষিক্ত হইতে থাকে।

পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।

বালিকারা লতায়িত দেহভঙ্গিতে গানের পর্দার উপরে লাস্যের ফুল তুলিতে তুলিতে নাচিতে থাকে।

কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবন এলো-চুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে,
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি ॥

সমে আসিয়া খোল-করতাল তানপুরা এস্রাজ সুর ও লাস্য উদ্দাম হইয়া ওঠে, আর তার সঙ্গে মেশে লেবুফুল ও ঝুমকোলতার সৌরভ, নিমফুল ও শিরীষের সৌগন্ধ। মানুষ ও প্রকৃতির ঐকতানে দর্শকেরা স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে থাকে— এ কি বাংলা দেশ না উজ্জয়িনী ? মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয়-রজনীতেও কবিসম্রাটের রাজধানীতে কি এমনি অলৌকিক উৎসব-সমারোহ পড়িয়া যায় নাই ?

রচনাপাঠ

রবীন্দ্রনাথ নূতন কিছু লিখিলে প্রথমে শান্তিনিকেতনে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার নূতন নাটক এখানে যে কেবল প্রথম পঠিত হইত তাহা নয়, সেগুলির প্রথম অভিনয়ও এখানেই হইত।

ডাকঘর নাটক পাঠের কথা এখনো আমার মনে আছে। তার পরে আসিল ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী। তপতীর পাঠ প্রথম আমি শুনি কলিকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে।

অচলায়তনের রূপান্তর গুরু, রাজার রূপান্তর অরূপরতন, শারদোৎসবের রূপান্তর ঋণশোধও এখানে প্রথমে পঠিত হয়।

প্রহসনগুলির নাট্যকৃত রূপ চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, শোধবোধ পাঠের কথাও মনে আছে। 'শেষের রাত্রি'কে যখন গৃহপ্রবেশে পরিণত করেন তাহাও এখানে প্রথম পঠিত হয়।

তিনি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কোনো নাটক পুরাতন আকারে প্রায়ই অভিনীত হইতে পারিত না; বদল-সদল করিতে করিতে প্রায় নূতন আকার দিয়া দিতেন।

মুক্তধারা পাঠ করিয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কী নাম দেওয়া যায়। কেহ উত্তর করিল না। শেষে তিনি নিজেই বলিলেন, নাটকটার প্রকৃত নাম পথ। কিন্তু নামটা অত্যন্ত ছোটো বলিয়া তাঁহার পছন্দ হইল না, শেষে নাম রাখিলেন: মুক্তধারা।

রক্তকরবী বার-তিনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে নাম বলিলেন যক্ষপুরী, দ্বিতীয়বার পাঠে নন্দিনী, তৃতীয় এবং শেষবারে নাম দিলেন রক্তকরবী।

নাটকখানি কেন যে বারংবার পরিবর্তন করিতেছিলেন বুঝিতে পারি নাই; আমাদের কাছে প্রথমখানা এবং শেষখানা সমান ভালো লাগিয়াছিল। তিনি বলিতেন, আর্টিস্টদের খুঁতখুতে প্রকৃতির হওয়া দরকার, যতক্ষণ খুঁত থাকিবে ততক্ষণ তাহাদের মনে শান্তি থাকিবে না।

নাটক-পাঠের সময়ে সব গানগুলি নিজেই গাহিয়া শুনাইতেন।

তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, অনেক লেখক চরিত্রসৃষ্টির সময়ে মনের সম্মুখে এক-একটা বাস্তব মানুষ খাড়া করিয়া রাখে, তাহার উপর রঙ করিয়া বদল করিয়া চরিত্র সৃজন করে; তাঁহার অভ্যাস কিন্তু সে রকম নয়;

তাঁহার সম্মুখে কোনো বাস্তব চরিত্র থাকে না—আগাগোড়াই কাল্পনিক। সামান্যভাবে তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সত্য হইলেও সর্বতোভাবে নয়। তাঁহার প্রহসনগুলির অনেক চরিত্রেরই বাস্তব মূল আছে বলিয়া মনে হয়। বৈকুণ্ঠ, চন্দ্রমাধববাবু, অক্ষয়, রসিক বাস্তব আকারে এক সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিশ্চয় যাতায়াত করিত।

নূতন রচনা ছাড়া পুরাতন রচনাও অনেক সময়ে তিনি পাঠ করিয়া শুনাইতেন; পাঠের সঙ্গে ব্যাখ্যাও চলিত। এইভাবে বলাকা কাব্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক সেই ব্যাখ্যার অনুলেখন ধারাবাহিকভাবে শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সোনার তরী কাব্যের সোনার তরী কবিতাটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল—এটিকে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে করিতেন। একদিন যখন এই কথা বলিতেছিলেন আমি ক্ষীণভাবে প্রতিবাদ করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুই কিছু বুঝিস না, চুপ কর্।" আমি সেই হইতে চুপ করিয়া আছি, কিন্তু মত পরিবর্তন করি নাই।

বর্ষশেষ কবিতা ব্যাখ্যার সময়ে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কবিতাটি লিখিবার সময়ে শেলির ওয়েস্ট উইন্ড্ তাঁহার মনে ছিল। কবিতা ব্যাখ্যার সময়ে মাঝে মাঝে তিনি শ্রোতাদের ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। বুদ্ধিমান বলিয়া তাহারা নীরব হইয়া থাকিত। আমি নিতান্ত নির্বোধ ছিলাম বলিয়া মাঝে মাঝে হাস্যকর অর্থ বলিতাম।

পলাতকা ও লিপিকা লিখিবার সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেদিনের লিখিত অংশ পড়িয়া শুনাইতেন। সভায় বৈদেশিক অধ্যাপক কেহ থাকিলে তাঁহাদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদও করিয়া যাইতেন।

বারংবার অভিনয় দেখিবার ফলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকগুলি আমাদের মনের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। বোধ করি এখনো অনেক অংশ মুখস্থ হইয়া আছে। শুধু তাই নয়, ঘরে বসিয়া এখন যখন সেই-সব নাটক পড়ি তখন অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর মনে পড়িয়া যায়। অচলায়তনের আচার্যের এবং শারদোৎসবের সন্ন্যাসীর অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর নিত্য জড়িত। মহাপঞ্চক ও লক্ষেশ্বরের অংশে জগদানন্দবাবুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া ওঠে; অচলায়তনের দাদাঠাকুরের কথা হইতে ক্ষিতিমোহনবাবুর কণ্ঠস্বরকে ভিন্ন

করিতে পারি না। আর অধিকাংশ গান পড়িবার সময়ে হয় রবীন্দ্রনাথের নয় দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ অশ্রুত সংগীতে বাজিয়া ওঠে।

অনেক সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নাটক ও গানের নিরপেক্ষ সমালোচনা আমার মতো রবীন্দ্রসাহিত্যে আবাল্যপুষ্ট লোকের পক্ষে বোধ করি সম্ভব নয়; যতই নিরপেক্ষতার ভান করি-না কেন, কিছু পরিমাণে অত্যুক্তি তাহাতে থাকিয়া যাইবেই।

রবীন্দ্রনাথের গান

সুরে ও সংগীতশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কাজেই রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কেবল সাধারণভাবে বলিবার যোগ্যতাই আমার আছে। শান্তিনিকেতনের জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান আমার মনে যে মায়া-রসায়ন সঞ্চার করিয়াছে তাহাই ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাল্যকাল হইতে আমি দুঃসাহসী নাবিকের মতো ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; নৌকার হালের উপর তখনো ভালো করিয়া অধিকার জন্মে নাই; যখন যে দিক হইতে বাতাস আসিয়াছে, নূতনের আশায় পাল তুলিয়া দিয়াছি; অসহায় নাবিকের দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র বলিয়া আমার কিছু ছিল না; যখন নিতান্ত ভীত হইয়াছি মাস্তুলের চূড়ায় উঠিয়া একাগ্র চক্ষু হইতে উগ্র সূর্যালোক ঢাকিবার জন্য কপালের উপর বাম করতলের তোরণ সৃষ্টি করিয়া বাষ্পলেখালীন দিগন্তের দিকে তাকাইয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিয়াছি; চঞ্চল ঊর্মিশিখর এক-একবার আশার মতো কাঁপিয়া উঠিয়া আবার নিবিড় কালিমায় মিশিয়া গিয়াছে; যে ভূখণ্ড একদা মহাদেশ ছিল লবণাম্বুরাশির লক্ষ লক্ষ যুগের আঘাতে আজ তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাদ্বীপপুঞ্জমালায় পরিণত; সে দ্বীপপুঞ্জ কত বিচিত্র, কত সুন্দর, কত অভাবিত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ! যে সংকীর্ণ সামুদ্রিক প্রণালী কার্তবীর্যার্জুনের হাজার হাতের পাঁচ হাজার আঙুলের মতো দ্বীপমালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই জলবিচ্ছেদে কত আবর্ত, কত চোরাবালি, কত ডোবা-পাহাড়; দূরদিগন্তের হাওয়ার হাহাকার মুক্ত সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জোয়ারকে কেশরভঙ্গাভিরাম উৎক্ষিপ্তফেনমল্লিকা সমুদ্রগুপ্তের বিজয়ী রথাশ্বের মতো চালনা করিতেছে; কোথাও বা আবর্তভীষণ উপকূলে মগ্নতরীর ছিন্নপাল শুভ্র ফেনপুঞ্জের মতো ঘূর্ণ্যমান; কোথাও বা আহত নাবিকের শিয়রে দ্বিধাগ্রস্ত গৃধ্র; কোনোখানে

জলরেখা ও স্থলরেখার মাঝে জ্যোৎস্নাফালির মতো নির্মল একটা বেলাভূমি, এতই কোমল যে অপ্সরীদের পদরেখাও চিহ্নিত হইয়া যায়; কোনোখানে লীলায়িত তরঙ্গ-বাহুতে শুক্তিরাজি উৎক্ষেপ করিয়া জলদেবীদের মধ্যে যেন কড়িখেলা চলিতেছে; ঘন নারিকেলবনের শাখাসংলগ্ন মরকতগুচ্ছের মতো কচি ফলগুলিতে সূর্যালোক ঝলকিয়া উঠিয়া বন্দরপ্রয়াসী নাবিকের কাছে অভিনব বাতিঘরের বিকল্প; আর সেই দ্বীপপুঞ্জের উপত্যকাগুলিই বা কত গভীর! বরফ-গলা জলের নদীতে কী শীত-স্বচ্ছতা! পাহাড়ের পাদদেশে বনরাজি নিদ্রার মতো অতলস্পর্শ; তরুশাখার পুষ্পগুলি স্বপ্নের মতো অলৌকিক; আর সেখানকার তুষারের তুঙ্গতা তপস্তপ্ত মহাদেবের ধ্যানস্বপ্নের মতো নির্মল ও অভ্রভেদী।

এই বিচিত্র দেশে কে না ভ্রমণ করিতে চায়! কত-না নাবিক এই দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করিয়াছে! কত-না লোকে এখানে পৌঁছিয়াছে, আর তারও চেয়ে কত বেশি না লোকে অকস্মাৎ জড়বুদ্ধি হইয়া হালছাড়া অবস্থায় কোন্ সর্বনাশের অভিমুখে বানচাল হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

এই দ্বীপপুঞ্জের কোন্ রহস্যগহ্বরে এক মায়াবী কুহকিনী বাস করে। নীল-সমুদ্রের উপরে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না যখন অমরার শ্বেতশতদলের মতো পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্‌দিগন্তে দলগুলিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া চন্দ্রের সুধাকোষটিকে অবারিত করিয়া দেয়, তখন সেই কুহকিনী চুল খুলিয়া দিয়া সমুদ্রের তীরে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করে; সে গানের সুর অলৌকিক মলমল-কুণ্ডলির মতো ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইয়া গিয়া কোন্ নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের দুর্লভ বাসরশয্যা রচনা করিতে থাকে! যদি কোনো হতভাগ্য নাবিকের কানে সে সুর প্রবেশ করে অমনি তাহার সর্বনাশ! সে তখনি দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্রটাকে তপ্ত অঙ্গারের মতো জলে নিক্ষেপ করিয়া, হাল ভাঙিয়া, পাল ছিঁড়িয়া সেই সর্বনাশের মুখে ধাবিত হয়। কিছুক্ষণ পরে আর সেই জড়বুদ্ধির কোনো চিহ্ন থাকে না— কেবল ছিন্ন পালের টুকরা ফেনপুঞ্জের সঙ্গে মিশিয়া আবর্তচক্রে একটি শ্বেত কহ্লার সৃষ্টি করিয়া কাঁপিতে থাকে আর কাঁপিতে থাকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বীপপুঞ্জের এই কুহকিনীই রবীন্দ্রনাথের গান।

গীতিকবিতা শব্দটা আজকাল ব্যর্থপ্রয়োগ, কারণ বহুকাল হইল গীতি ও কবিতায় বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে সত্য সত্যই গীতিকবিতা বলা চলে। তাঁহার গীতিকবিতায় ঝর্নার টানে নুড়ির মতো সুরের

টানে কথা আপনি চলিয়া আসে। এই গানগুলিকে সব সময়ে সচেতনভাবে গাহিবার আবশ্যক করে না, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পড়িতে বসিলেও এগুলি আপনি গুন্‌ গুন্‌ করিয়া ওঠে। যথার্থ গীতিকবিতা ভ্রমরজাতীয়, উড়িবামাত্র তাহার পাখা গুঞ্জরণ করিতে থাকে। তাহার পক্ষে ওড়া ও গান করা একার্থক।

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মুখে কাব্যাবৃত্তি শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাঁহার পাঠও গানের অনুরূপ ছিল, একটা সুরের মতো ধ্বনিত হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই সুর-সংযোজন করা সম্ভব। শুনিয়াছি, শেষ বয়সে তিনি উর্বশী কবিতাতে সুর-যোজনা করিয়াছিলেন এবং বিদায়-অভিশাপকে সুরে গাঁথিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সত্য কথা বলিতে কী, বাক্য ও ধ্বনির মধ্যে কোন্‌টির উপরে তাঁহার বেশি স্বাভাবিক অধিকার ছিল বলিতে পারি না; হয়তো দুটির উপরেই সমান দক্ষতা ছিল, হয়তো বাক্যের চেয়ে ধ্বনির উপরেই বেশি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিকিবে। অনেকে বলেন তাঁহার গান কেবল শিক্ষিতসমাজেরই গান। এ দেশে এখন পর্যন্ত শিক্ষিতসমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতসমাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারও অনিবার্য। মহাকবিদের কাব্যে সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান থাকে, তাই তাহাদের ধ্বংস নাই। বাল্মীকির রামায়ণ টিকিয়া আছে, কিন্তু কবিগুরুর সময়ে যে-সব 'মাইনর' কবি ছিল, যাঁহাদের কবিতা সেই সময়ের পাঠশালায় খুব চলিত, অনুভূতির সংকীর্ণতাই যাঁহাদের প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল, তাঁহাদের কাব্য আজ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের গান সিন্ধুপারের পাখির মতো ঝাঁক বাঁধিয়া আসিত; এক-এক ঝাঁকে এক-এক জাতের পাখি। মধ্যবয়সের গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি এক ঝাঁকের এক জাতের পাখি। তার আগে তাঁহার জীবনে ঝাঁকে ঝাঁকে গান আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জাত প্রায় এক। আবার শেষের জীবনেও ঝাঁকে ঝাঁকে গান আসিয়াছে, তাহারাও প্রায় এক জাতের। এই তিন বয়সের তিন ঝাঁকে বিশেষ জাতিভেদ আছে।

তাঁহার প্রথম বয়সের গান আবেগপ্রধান; শেষ বয়সের গান সৌন্দর্যপ্রধান; প্রথম বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনপূর্ণ খণ্ড ক্ষুদ্র সংসারের দিকে; শেষ বয়সের গানের মুখ বিরহমিলনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে; মধ্য বয়সের গানে,

অল্প কিছুদিনের জন্য এই দুই স্বতোবিরুদ্ধের মধ্যে সেতুবন্ধনের সুর— কখনো তাহার মুখ এ দিকে, কখনো ও দিকে ; মধ্যবয়সের এই গানের পর্বটিকে রবীন্দ্র-গানের গিরিমালার ওয়াটারশেড্ বলিতে পারা যায় ; ইহার দুই দিকে ভূ-প্রকৃতি দুই রকমের ; ইতিপূর্বে মধ্য বয়সে মহত্তর রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ভবের কথা বলিয়াছি তাহার সঙ্গে এই ভাগের ঐক্য আছে ; মধ্য বয়সের এই ওয়াটারশেড্ রবীন্দ্রজীবন ও কাব্যকে দুই ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার জীবনের উত্তরার্ধের গান সত্য সত্যই সিন্ধুপারের পাখি ; সিন্ধুপারের কোনো দ্বীপে তাহাদের জন্ম, সিন্ধুপারের হাওয়ায় ভর করিয়া তাহাদের আবির্ভাব ; এক পাখায় তাহাদের মানুষের বাণী, আর-এক পাখায় প্রকৃতির ; বুকে তাহাদের নিরুদ্দেশে পাড়ি দিবার উদ্দাম অভিসার।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ত্ব বিচার করিতে হইলে জগতের মহাকবিদের সঙ্গে তাঁহাদের স্থাপন করিতে হইবে। সে শক্তির আমার একান্ত অভাব। অন্যান্য মহাকবির সঙ্গে আমার পরিচয় খণ্ডিত, অনেক সময়ে আবার তাহা অনুবাদের দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত। তবু এইটুকু সাহস করিয়া বলিতে পারি, এত বড়ো প্রকৃতির কবি বোধ করি জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রকৃতির প্রত্যেক হৃদয়াবেগের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কাহার? প্রাচীনকালের কবিরা প্রকৃতির স্থূল রূপটি মাত্র জানিতেন ; প্রকৃতির রাজপথটির সহিত মাত্র তাঁহাদের পরিচয় ছিল ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রকৃতি-রাজ্যের গলিঘুঁজি অন্ধিসন্ধি এমনটি আর কে জানে? ভার্জিলের ও শেক্সপীয়রের প্রথম বয়সের কবিতা ছাড়িয়া দিলে আর কাহার কবিতায় এমন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়— এমন একাধারে পরিচয় ও প্রীতি? ভার্জিল ও শেক্সপীয়র প্রকৃতিকে ছাড়িয়া মানুষের রাজ্যে ঢুকিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রকৃতির লীলাঘরে আবদ্ধ হইয়া মধ্যবয়সে মানুষের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, শেষ বয়সে আবার প্রকৃতির সেই লীলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া 'সমে' ঠেকিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সুরের এই সুরধুনীর উপত্যকায় শান্তিনিকেতন-পল্লী অবস্থিত। এখানকার জীবনস্রোত এই নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া নিত্য প্রবাহিত। তাঁহার সব গান যে আমার মনে আছে এমন নয় ; যে-সব গান মনের প্রত্যক্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছে বিস্মৃতির নেপথ্য হইতে তাহারা স্মৃতির অঙ্গুলিতে কত রকম মানসপ্রতিমা রচনা করিয়া জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রেরণ করিতেছে ;

ইহাতেই শিল্পের সার্থকতা, ইহাই শিল্পের সৃষ্টিকার্য।

সেই-যে সেবার পূজার ছুটিতে জনবিরল আশ্রমে আমরা গুটিকতক মাত্র প্রাণী ছিলাম, প্রতিদিন শুক্লসন্ধ্যার রাত্রে উত্তরায়ণের ছাদে কবির উপস্থিতিতে গানের আসর জমিত, সে কথা কি ভুলিবার! তারা-নেভা জ্যোৎস্নায় সেই-যে কাহার কৌতুকস্ফুরিত চক্ষু নূতন তারার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আবার সেই-যে আর-একদিন শরৎকালের আতপ্ত সন্ধ্যার নির্জন শিউলিবীথিতে 'হে ক্ষণিকের অতিথি' সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি ভুলিতে পারিব? আর-এক দিনের কথা মনে আছে, চৈত্রের তপ্ত দ্বিপ্রহরে শিরীষশাখায় বাঁধা দোলনায় দুলিতে দুলিতে বিদায়ের প্রাক্কালে 'যাব যাব যাব তবে, যেতে যদি হয় হবে' গান— সে-যে আজ কত দিনের কথা!

রবীন্দ্রসংগীতের সোনার ফসল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই; ফসলের এই-সব উঞ্ছমাত্র পড়িয়া আছে; জীবন এই-সব উঞ্ছেরই স্তূপীকৃত সঞ্চয়: স্মৃতির ভাণ্ডার যাহার জিম্মায় সে সোনার তালগুলি অনাদরে নিক্ষেপ করিয়া উঞ্ছকণাকে তিল তিল সংগ্রহ করিয়া মানসের তিলোত্তমা রচনা করে। স্মৃতির রহস্য ভেদ করিবার স্পর্ধা আমার নাই। কেমন করিয়া ইহা ঘটে জানি না; কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ইহাই ঘটিতেছে।

আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে; তখন রবীন্দ্রনাথ গত হইয়াছেন। মধুপুরে নির্বাসন যাপন করিতেছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া শুনিলাম পাশের বাড়ি হইতে কে যেন 'বীরপুরুষ' কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছে। একি! এ যে বহু দিনের চেনা কণ্ঠ! বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সদ্যোভগ্ন নিদ্রার মোহের সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরের জাদু মিশিয়া মুহূর্তকালের জন্য সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা গোলমাল হইয়া গেল, নিশ্চিততম বাস্তবকে একবারের জন্য লঘু বলিয়া মনে হইল, কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই আবার বাস্তববোধ ফিরিয়া আসিল— কালের স্রোত কখনো ফিরিয়া বহে না। পাশের বাড়িতে সেই চেনা কণ্ঠের জাদু আবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছে। কোথা হইতে অকালবাষ্পে ঘরের চারি দিক এমন ঝাপসা হইয়া উঠিল।

শান্তিনিকেতনের উৎসব

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই-সব উৎসবকে অহৈতুক বা ভাববিলাস মনে করিবার কারণ নাই। প্রাত্যহিক নিয়মের চিহ্নিত পথ হইতে অভ্যাসের জড়তাগ্রস্ত মনকে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এগুলির আবশ্যক; তন্দ্রিত মনের চেয়ে মানুষের বড়ো বিপদ আর কী হইতে পারে।

ঋতু-উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনের জীবনের প্রধান অঙ্গ। বর্ষশেষ, বর্ষারম্ভ, বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, বসন্তোৎসব তো গোড়া হইতেই ছিল; শেষের দিকে হলচালনা, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি উৎসবও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই-সব অনুষ্ঠানের রাখীবন্ধন প্রকৃতি ও মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবে বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

এখানকার উৎসবের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি প্রকৃতিমুখী; ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঋতু-উৎসবের দিকেই নিশ্চিতগতি। ইহার সম্যক রূপ অবগত হইতে হইলে ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনকে মিলাইয়া লইয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার কবি-জীবনের সঙ্গেই সমান তালে পা ফেলিয়া শান্তিনিকেতনের জীবন চলিয়াছে। রবীন্দ্র-জীবন ও শান্তিনিকেতন একই প্রবাহের সমান্তরাল দুই তটরেখা, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে দর্শন একদেশ-দর্শন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের কোঠা নৈবেদ্য, খেয়া, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্ধাদি, গোরা, গীতাঞ্জলির দ্বারা চিহ্নিত; শান্তিনিকেতনের প্রাচীনাদর্শী ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই যুগের সৃষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, বলাকা-ফাল্গুনীর যুগ, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি সেই যুগধর্মজাত। ইহার পরবর্তী রবীন্দ্র-জীবনের তত্ত্বানুধাবন করিলে দেখা যায় তাঁহার সমগ্র প্রতিভা-প্রবাহ মানুষ ও ভগবানের দুই উপকূলের দ্বারা সীমায়িত প্রকৃতির উপসাগরের মধ্যে যেন আত্মবিসর্জন করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ ও ভগবানের সমন্বয় তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বলাকার পররর্তী তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও সংগীত এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার বাল্যকালের প্রকৃতি-প্রীতি শেষ বয়সে গভীরতর অর্থ লাভ করিয়াছে। অবশ্য, এই পরিণতি তাঁহার কাব্যে অনুধাবন করা যায়, কিন্তু ইহার অনুধাবনের প্রত্যক্ষতর ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবের ক্রমবিকাশ এক অর্থে রবীন্দ্র-জীবনের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর মিলনের ক্রমবিকাশ মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে

রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে একপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদ বলা যাইতে পারে।

এখানে আর-এক শ্রেণীর উৎসব আছে যাহা প্রধানত মানবসম্পর্কিত। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পৌষ-উৎসব : মহর্ষির দীক্ষা ও আশ্রমপ্রতিষ্ঠার বার্ষিকী।

আনন্দবাজার নামে একটা মেলা মাঝে মাঝে এখানে বসিত। ছেলেমেয়েরা ছোটো ছোটো দোকান খুলিত; তাহারাই ক্রেতা, তাহারাই বিক্রেতা। যে টাকা লাভ হইত আশ্রমের দরিদ্র-ভাণ্ডারে তাহা প্রদত্ত হইত। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে এই মেলায় তিনি বেড়াইতে আসিতেন। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাঁহার মতো নিরীহ খরিদ্দার পাইয়া খুশি হইত। অপরে যাহা কিনিত না সেই-সব জিনিস তাঁহার হাতে দিয়া দাম আদায় করিয়া লইত। একবার একটা বেল তিন-চার আনা দিয়া কিনিবামাত্র মেলার সব বেলের দর চড়িয়া গিয়া আপেলের দরে বিক্রীত হইতে লাগিল।

এইরকম একটা উপলক্ষে একবার রামানন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মুলু ও আমি একটা ঐতিহাসিক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলাম। তাহাতে রামের খড়ম, সীতার চিরুনি, চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর প্রভৃতি সব বিস্ময়কর ঐতিহাসিক বস্তু ছিল। লোকে উৎসাহের সঙ্গে উচ্চ দর্শনী দিয়া ঢুকিয়া জিনিসগুলি দেখিল। দর্শকরা একেবারে প্রতারিত হয় নাই। রাম মানে রামানন্দবাবু, সীতাদেবী তাঁহার কন্যা, আর চণ্ডীদাস আমাদের পাকশালার একজন পাচক। ইহাদের খড়ম, চিরুনি ও হস্তাক্ষর দেখিয়া বোধ করি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীমাত্রেরই প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল।

মাঝে মাঝে অকালে উৎসব পণ্ড হইয়া যাইত, এমন একটা ঘটনা আমার মনে আছে।

সেবারে বসন্তোৎসব খুব ধুম করিয়া হইবে স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ নূতন গানের পালা লিখিয়া গানের দলকে শিখাইয়া তুলিলেন। আম্রকুঞ্জের সভাস্থল আল্‌পনা ও আবীরে সজ্জিত হইল; আমের ডালে ডালে বাতির ব্যবস্থা হইল, সকলে পীতবর্ণের ধুতি ও শাড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল— পুব আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিলেই সভারম্ভ হইবে। আমরা যখন পুব আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম তখন বিধাতাপুরুষ পশ্চিম আকাশে যে আর-এক আসর সাজাইয়া তুলিতেছিলেন তাহা কেহ লক্ষ্য করি নাই। আমবাগানের আড়ালে পশ্চিম দিক কখন ঝড়ের মেঘে ভরিয়া গিয়াছে, বাতাস দম বন্ধ করিয়া

আদেশমাত্রের অপেক্ষা করিতেছিল। কালবৈশাখীর ঝড় যখন বিপুল সমারোহে আসন্ন উৎসবের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখনই প্রথম আমরা জানিতে পারিলাম। তার পরে ঝাপটের পর ঝাপট; ঝড় থামিতেই বৃষ্টি নামিল, বৃষ্টির সাপটের পর সাপট: কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আসন্ন উৎসবের ভূমি ও ভূমিকা ঝড়ে জলে একাকার হইয়া গিয়া সে এক করুণ কুঞ্জভঙ্গের পালা। সেদিনকার ভাঙা উৎসবের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে বোধ করি আছে।

কিন্তু সাধারণত শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি আমাদের উৎসবাদির প্রতি কৃপাপর ছিল; আমাদের প্রায় সমস্ত উৎসবই খোলা আকাশের উৎসব, দেবতার রোষ কদাচিৎ তাহাদের উপর পড়িত।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক

অতিদূর দিগ্‌বলয়রেখামাত্রটির দ্বারা সীমায়িত শান্তিনিকেতনের মাঠ এমন সম্পূর্ণভাবে রিক্ত বলিয়াই নূতন নূতন ঋতুর ঐশ্বর্যে এমন পরিপূর্ণভাবে ভরিয়া উঠিবার সুযোগ পায়। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল প্রকৃতির সৌন্দর্যে সমৃদ্ধতর হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল ঋতুবিশেষেরই সম্পদ; কোনোখানে বা বর্ষার, কোনোখানে বা হেমন্তের, কোনোখানে বা শরৎকালের। কিন্তু ছয় ঋতুর পূর্ণ আবর্তনের প্রকাশ এখানে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কোথাও নয়। ছয় ঋতুকে নিঃশেষে প্রকাশ করিবার জন্যই বিধাতা যেন এই প্রান্তরখানিকে এমন নিঃস্ব করিয়া গড়িয়াছেন; পটভূমি রিক্ত হইলে তবেই তো নূতন নূতন লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বরেন্দ্রভূমে আমার জন্ম; সে লাল মাটির দেশ; আবার রাঢ়ের লাল মাটির দেশে আমার দ্বিতীয় জন্ম। আমার দুই জীবনের দুই উদয়দিগন্ত লাল মাটির আভায় চিররক্তিম। এই বীরভূমের যে বর্ণনা আমি অন্যত্র করিয়াছি তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।

'বীরভূমের পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনার অনুর্বর ও রুক্ষ গিরিরাজি; সমস্ত জেলাটাই পশ্চিমের উচ্চভূমি হইতে গড়াইয়া পুবের দিকে নামিতে নামিতে এক সময়ে মুর্শিদাবাদের শস্যসমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অবশেষে ভাগীরথীর মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এই মাটির নিম্নমুখী চিরশৃঙ্খলিত তরঙ্গের সঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া বীরভূমের নদনদীও পূর্ব-প্রবাহিণী— কাঁসাই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা,

ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, হিংলা, অজয়।

'বীরভূমের নদনদী নদীর স্মৃতিমাত্র; সারা বছর তারা অর্ধচেতনভাবে বিস্তৃত বালুশয্যার এক প্রান্তে ক্ষীণ জলধারায় ঘুমাইয়া থাকে; তার পরে বর্ষার প্রারম্ভে অরণ্যহীন কোন্ উৎসমূলের মালভূমিতে বর্ষণ হয়, আর তরঙ্গের ডম্বরুধ্বনিতে এই-সব নাগিনীরা ভূগর্ভের ফল্গুলীলা ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া ফুঁসিয়া ফাঁপিয়া ফেনাইয়া জাগিয়া ওঠে, সেদিন সারা বৎসরের শোধ তুলিয়া তারা তীরে নীরে একাকার করিয়া দেয়। সেদিন অজয়ের সহস্রজিহ্ব গৈরিক জলরাশি আনন্দমঠের গা ঘেঁষিয়া লক্ষ লক্ষ গেরুয়াধারী সন্তান-সৈন্যের মতো 'হর হর' শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিয়া ছোটে; সেদিন অজয় আর নদী নয়, কোন্ পূর্ণজাগ্রত বিদ্রোহী সত্তা। সেদিন প্রকৃতি মেঘের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে শঙ্কিতবক্ষে সেই তর্জন শুনিতে থাকে। সেদিন উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত নদনদী দুর্নিবার তরঙ্গের জপমালার আবর্তনে বীরভূমকে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লয়।

'বীরভূমের মাটির প্রকৃতিতেও এই দ্বৈধ লীলা। এই জেলাকে একটি রেলপথ দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রায় সমভাগে চিরিয়া ফেলিয়া অতিক্রম করিয়াছে; ইহার পশ্চিমে ভূপ্রকৃতি এক রকম, পূর্বে আর এক রকম। পশ্চিমে রুক্ষ, অনুর্বর, দগ্ধ, কঠিন, নিঃস্ব, বিরাগী ভূখণ্ড সন্ন্যাসীর শুষ্ক উদার ললাটের মতো; আর পূর্ব দিকে শ্যামল, কোমল, সমতল, শস্যান্বিত, স্নিগ্ধ, তরুবহুল প্রান্তর সন্ন্যাসীর কৃপাস্নিগ্ধ করুণ ওষ্ঠাধর: বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ যেন ভেদ ভুলিয়া পাশাপাশি তপোমগ্ন! এই বিচিত্র ভূখণ্ডের মধ্যে অর্ধনারীশ্বর হরগৌরীর অলৌকিক সমাধি।

'ইহার একদিকে প্রান্তর, অন্য দিকে বন; একদিকে নগ্নতা, অন্য দিকে আচ্ছাদন; এক দিকে নিঃস্বতা, অন্য দিকে সম্পদ। ইহার পশ্চিমে শাল পিয়াল মহুয়া, পূর্বে আম জাম কাঁঠাল; পশ্চিমে তাল, পূর্বে খেজুর; পশ্চিমে অর্জুন, পূর্বে বাঁশ। ইহার এক দিকে সন্ন্যাস, অন্য দিকে গার্হস্থ্য; এক দিকে ঘরছাড়া বনস্পতির দল, আর-এক দিকে ঘর-ঘেঁষা উদ্ভিদের শ্রেণী। ইহার মাঝখানে দাঁড়াইলে দেখিবে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত একটানা ধান্যশীর্ষের স্নিগ্ধ শ্যামলতা আর পশ্চিমে সূর্যাস্তের সীমা পর্যন্ত রক্ত মাটির বিবর্ণ ধূসরতা। এক দিকে কঠোর দৃঢ়-পিনদ্ধ নিশ্চপল স্তব্ধতা; অন্য দিকে শ্যামলে কোমলে উর্বরে বৈদগ্ধ্যে নর্মলীলা। এক দিকে তপঃসংযত বিশ্বামিত্র, আর-এক দিকে সেই তপ ভাঙাইবার জন্য মেনকা; ইহার পূর্বচক্রবালে বনলেখাবগুণ্ঠনের নীলিমা, আর পশ্চিম প্রান্তর

হা-হা শব্দে বিরাট বৈরাগ্যে ধ্বনিত হইয়া বনরেখাহীন অসীম শূন্যতার মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে।

'বীরভূমের এই বিচিত্র ভূখণ্ডে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শাক্তদের পীঠস্থান তারাপুর লাবপুর নলহাটি কঙ্কালীতলা, আবার বৈষ্ণবদের পীঠস্থান নান্নুর ও কেন্দুলি ; এই মাটি একাধারে বীর ও কবিদের জননী ; প্রাচীন বীরগণের স্মৃতি বহিয়া ইহা বীরভূম, আর যাঁহাদের স্মৃতি কখনো প্রাচীন হয় না। সেই কবিদেরও ইহা ধাত্রী ; জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুর। এই অলৌকিক ধূলিমুষ্টি নানা সুরের মন্ত্রপড়া ; গীতগোবিন্দের যে সুরের সাহায্যে বিরহিণী রাধা নবীন মেঘ ও পুরাতন তালীবনের দ্বিগুণিত অন্ধকারের মধ্যেও পথ খুঁজিয়া পায় ; পদাবলীর যে সুরে সামান্য রমণী কবির চক্ষে অসামান্য হইয়া উঠিয়া বৈকুণ্ঠকে-ধিক্কৃত-করা তাহার শীতল চরণে আশ্রয় দান করে। বাউলের মনের-মানুষ-খোঁজা সুর গ্রামছাড়া কোন্ রাঙা মাটির পথের অনুসরণে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য সাঁওতাল-বালকের করুণ একটানা বাঁশের বাঁশির রবের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাট প্রান্তরের চরমপ্রান্তে কোথায় মিলাইয়া যায় ; আর ভানুসিংহ ঠাকুরের সহস্রতার বীণার মীড়ে মীড়ে যুগপৎ মানুষ ও প্রকৃতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরহ-মিলনের সংগীত আপনার-অসহ্য-রসভরে-পরিণত দ্রাক্ষা-গুচ্ছের মতো ফাটিয়া ফাটিয়া পড়ে ; এখানকার অসীম আকাশের নীলকান্ত থালিকায় সোনার রোদের স্তবকে মোড়া দিনগুলি কোন্ পরম রসিকের পায়ে নিবেদিত নৈবেদ্য আর নিশীথ-নক্ষত্রের-স্বর্ণাক্ষরে-ভাস্বর দিগন্তবিস্তৃত অক্ষয় পাণ্ডুলিপি কোন্ ধ্যানী পাঠকের সম্মুখে কী এক উদার শাস্ত্র !'

বীরভূমের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে আপনার স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। শান্তিনিকেতনের মাঠে বর্ষার অবিশ্রাম ধারাপাত ও শান্তিনিকেতনের শালবনে বাতাসের উদ্দামতা একসঙ্গে না দেখিলে

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে—

এই চিত্রের সম্যক্ রসোপলব্ধি কিছুতেই করা সম্ভব নয়। কিংবা চৈত্রের দ্বিপ্রহরে শান্তিনিকেতনের মাঠের দিকে তাকাইতে যখন চোখে জ্বালা ধরিয়া যায় তখনই

কেবল নিম্নোক্ত শ্লোকের মর্ম পরিপূর্ণভাবে অর্থদ্যোতক হইয়া ওঠে :

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

ফল কথা শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের টীকাকার; এখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য মিলাইয়া লইলে তবেই তাহার সটীক সংস্করণ হওয়া সম্ভব। আর স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মল্লিনাথ; সে ফুলে ফলে লতায় পাতায় মেঘে মেঘে বনে বনে ঋতুতে ঋতুতে রবীন্দ্রকাব্যের সঞ্জীবনী টীকা লিখিয়া চলিয়াছে। কবির লেখনী থামিয়াছে, কিন্তু টীকাকারের লেখনীর কোনোদিন আর থামিবার উপায় নাই।

শান্তিনিকেতনের অবারিত প্রান্তর ও দিক্‌বিনত আকাশ একজোড়া যুক্ত খঞ্জনীর মতো পড়িয়া আছে; এই খঞ্জনীর তালে তালে চল্লিশ বৎসরের উপর এখানে বিশ্বকবির কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে; বিশ্বকবির কণ্ঠ, আর সেই কণ্ঠের দোহার ছয় ঋতুর ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী।

শান্তিনিকেতনের বর্ষার আকাশে পূর্বদিগন্তে একখণ্ড মেঘোদয় হইলে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত তাহার সদাপরিবর্তনশীল জীবনলীলা অনুসরণ করা যায়। দেখিতে দেখিতে পূর্ব-আকাশ মেঘের কানাতে ভরিয়া যায়; তাহার কালো ছায়া বাঁধের কিনারে কাজলের তুলি টানিয়া দেয়; জামবনের ডালে ঘনশ্যামল পাতার ফাঁকে কালো কালো ফলগুলি মিলাইয়া আসে; মেঘের ছায়া প্রসারিত হইয়া পড়িয়া মালতীকুঞ্জের ফুলের শুভ্রতা ঈষৎ ম্লান হইয়া যায়; তালতোড়ের পথে বাঁধের ধারে যে বেঁটে তালের ঘন সারি আছে কালো মেঘের পটের দ্বন্দ্বে তাহাদের প্রত্যেকটি গাছ প্রত্যেকটি পাতা প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্টতর হইয়া ওঠে; কচি ধানের পাতা চাপা-আনন্দে রী রী করিতে থাকে— পৃথিবী তো অনেক আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের ইহাই পূর্বরাগ।

বর্ষার প্রথম বারিপাত-মাত্রে শান্তিনিকেতনের পোড়া মাঠে সবুজ অঙ্কুর জাগে; প্রথমে নিচু জায়গায় সবুজ দেখা দেয়; খোয়াইয়ের তলদেশে কচি দূর্বা

গজায়া আর সেখানে লাল-মখমলের-পোশাক-পরা ইন্দ্রগোপ কীটের দল ব্যস্ত হইয়া ওঠে।

শান্তিনিকেতনের বর্ষার ফুল মালতী ও কেয়া। দক্ষিণের ফটকের মাথা অজস্র মালতীতে ভরিয়া যায়; ছাতিমতলায় ছাতিম গাছদুটির উপরে মালতীর লতা উঠিয়া গাছ দুটাকে মস্ত একটা মালতী ফুলের তোড়ার মতো দেখায়। আর খোয়াইয়ের বাঁকে বাঁকে, কোপাই নদীর ধারে, কেয়ার ঝোপে কণ্টকিত কেয়া উঁকি মারিতে থাকে।

যেদিন ঘন বর্ষা নামে, ক্লাস বন্ধ হইয়া যায়, লোকের চলাফেরা ক্বচিৎ হইয়া ওঠে, বর্ষার অবিরাম ঝর্ঝরের সঙ্গে তাল রাখিয়া অবাধ্য বাতাস শালে জামে আমে মহুয়ায় মাতামাতি করিয়া ফেরে। জলযবনিকা, দিগন্তের প্রান্ত হইতে শ্যামচ্ছবি মুছিয়া দিতে দিতে ছুটিয়া আসে, জানলা-দরজা দুদ্দাড় করিয়া আছাড় খায়, আর সেই জানলা-দরজার আড়াল হইতে ঘরে ঘরে নানা কণ্ঠে গান উঠিতে থাকে; তার পরে বৃষ্টি থামিয়া যায় কিন্তু বাতাসের দাপটে গাছের পাতা হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে; বাতাস থামিয়া যায়, তখনো শালগাছের বল্কলের রেখায় রেখায় তানপুরা বাহিয়া সুরের মতো জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

তার পরে কবে আবার একদিন শরতের-রৌদ্রে-মাজা নির্মল আকাশ দিগন্ত জোড়া ডানা মেলিয়া অতিকায় স্বর্ণ-ঈগলের মতো আসিয়া জলস্থল ব্যাপ্ত করিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকে। আকাশ বাতাস শিশির শেফালি রৌদ্র ছায়া সবসুদ্ধ মিলিয়া যেন একটা অলৌকিক প্রসন্নতা। কাশের বনে আর ধানের ক্ষেতে সাদা ও সবুজের হিল্লোলের প্রতিযোগিতা।

শরৎকালে শান্তিনিকেতনের প্রধান পুষ্পসম্পদ শিউলিফুলের বীথি রঙিন বোঁটার ফুলের আল্‌পনায় পরিকীর্ণ।

শরতের লঘু স্বচ্ছতার সঙ্গে ছুটির আনন্দ চিরজড়িত। সে আনন্দ শিউলি-বনে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কোথাও নয়। সকালবেলার ফোটা ফুলের ছড়াছড়ির চেয়ে সন্ধ্যাবেলার কুণ্ঠিত কুঁড়ি আমার কাছে বরাবর অধিকতর আকর্ষণের। শরতের সন্ধ্যায় মেঘ-চাপা গরম পড়ে, সেই তাপের পুটপাকে কুঁড়িগুলির অধরোষ্ঠ এতটুকু ফাঁক হয়, যাহাতে কথা বলিতে পারে না, কেবল কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তার উপরে পড়ে

জ্যোৎস্নার ভাঁজে ভাঁজে শেফালির গন্ধের স্তর; আকাশের প্রান্তে জ্যোৎস্নার উৎকণ্ঠার মতো টিট্টিভের কণ্ঠ, আর মৌন দিগন্ত হইতে বাষ্পের নীরবতায় কী এক সংগীত যেন উঠিতে থাকে।

বর্ষা ও শরতের জাতিভেদ আছে, কিন্তু শরৎ ও শীত এক জাতের ঋতু, তাহাদের প্রধান ঐশ্বর্য রৌদ্র; মাঝখানে হেমন্ত-নামে ঘর-পূরণের জন্য একটা ঋতুর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু কখন যে শরৎ হেমন্তের সেতু পার হইয়া শীতের রাজ্যে প্রবেশ করে তাহা যেন ধরিতেই পারা যায় না।

শীতের যদি কোনো রঙ থাকে তবে তাহা স্বর্ণাভা। তাহার রৌদ্র স্বর্ণাভ, তাহার রাজ্য স্বর্ণাভ, তাহার শুষ্কতৃণ মাঠের রঙ স্বর্ণাভ।

কবিদের কাছে শীতের কেন তেমন আদর নাই জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব যদি কোনো ঋতু থাকে তবে তাহা শীতকাল। শীতকালেই বাংলাদেশকে বুঝিবার সময়। আকাশের নীলার ও পৃথিবীর মরকতের ফ্রেমে আঁটা পৃথিবী, আর তাহার উপরে সোনার রৌদ্রের একটা উজ্জ্বল প্রলেপ—এমন প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে দেখিবার সুযোগ আর কোন্ ঋতুতে!

শান্তিনিকেতনের শালবনের পাতা ভূতে-পাওয়া লাল হইয়া উঠে, তার পরে ঝরিতে থাকে। আমের পাতা শীর্ণ হইয়া ঝরে, মহুয়ার পাতা খসিয়া খসিয়া স্রোতের মুখে নৌকার মতো ভাসিয়া যায়; গোলকচাঁপার ডালগুলি একেবারে নিষ্পত্র। পৌষের শেষে হঠাৎ একদিন দুটি আমের মুকুল চোখে পড়ে, শালের ডালে নূতন পাতার উস্খুস্ বাধিয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে গাছ ও ফুল অজস্র, যত্রতত্র। ফাল্গুনের প্রথম হাওয়াটি যেমন দিয়াছে অমনি মাধবীফুলে গাছ ভরিয়া গেল। আগের দিনও সেখানে ফুলের চিহ্ন ছিল না। আবার যেমন একটু গরম পড়িল, অমনি মাধবী কোথায় গেল, পরের দিন তাহার আর কোনো চিহ্ন দেখা যাইবে না। মুকুলে আমবন ভরিয়া যায়, মুকুলের মধুক্ষরণে আমের পাতা চিক্কণ হইয়া ওঠে, গাছের তলা মধুতে পঙ্কিল হয়, পথিকের পায়ে পাতা লাগিয়া যায়। শালের বলিষ্ঠ বৃক্ষ ফুলের ভারে আনত হইয়া পড়ে, তখন আর ঝরা ফুল পদদলিত না করিয়া চলিবার পন্থা থাকে না। গোলকচাঁপার হলদে ছোপ দেওয়া ফুল! রক্তকরবীর গাছটা আগাগোড়া ফুলে পরিপূর্ণ, দেবরাজ সহস্রাক্ষের ঘুম-ভাঙা হাজার চোখ। নিচু বাংলায় ফোটে চাঁপা আর মুচকুন্দ।

আর শেষের দিকে আসে শিরীষ; সে বড়ো স্পর্শকাতর; বাতাসের কানে কী স্বগতভাষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া যায়। বসন্তের এই শোভা বেশিদিন থাকে না, চৈত্রের মাঝামাঝি ঋতুরাজের ভূষণ ধীরে ধীরে খসিতে থাকে, তার পরে রিক্তভূষণ ঋতুরাজ গ্রীষ্মের চীরবাস পরিয়া মহারাজ হর্ষের মতো সর্বস্বান্ত হইয়া বিবাগী হইয়া চলিয়া যায়।

ঋতুরাজ একই সঙ্গে রাজা ও সন্ন্যাসী; ঐশ্বর্য তাঁর সত্য বলিয়াই ত্যাগে তাঁর দুঃখ নাই; বরঞ্চ ত্যাগের দ্বারাই তিনি ঐশ্বর্যের পূর্ণতা অনুভব করেন; রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির ইহাই মূল কথা। এই মূল সত্যটি তিনি ঋতুচক্রের লীলা পর্যবেক্ষণ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; আর সে পর্যবেক্ষণের সম্যক্ স্থান শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি!

শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে শেষের জীবন অতিবাহিত না করিলে এবং সেই-সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাদের না পাইলে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য লিখিত হইত কি না সন্দেহের বিষয়। এখানে বসিয়া ঋতুবীক্ষণজাত যে সত্য তিনি দর্শন করিয়াছেন তাহা এখানকার বালক-বালিকাদের অভিনয়কৌশলের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার বিকাশের জন্য এ দুটিরই আবশ্যক ছিল— প্রকৃতির কোলে বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়। সত্য কথা বলিতে কী, রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক-বালিকাগণ যতখানি মানবিক ততখানি প্রাকৃতিক; তাহারা যেন প্রকৃতি হইতে মানবে যাইবার সেতু। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে শিশুচরিত্র বালকচরিত্র বুঝা এত সহজ; আবার ইহা তাঁহার পক্ষে বুঝা সহজ বলিয়াই তিনি শিশু ও বালকের আদর্শ-শিক্ষক।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে গন্ধের আকর্ষণই, বোধ করি, আমার উপর সবচেয়ে প্রবল। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ঋতুর গন্ধ অনুসরণ করিয়া আমি একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে পারি।

গ্রীষ্মের শেষে যখন প্রথম বৃষ্টি পড়ে তখন দগ্ধ মাঠ হইতে সে কী ভিজা মাটির গন্ধ উঠিতে থাকে— সেই গন্ধটি যেন পৃথিবীর আরামের 'আঃ' শব্দ!

বর্ষার একটি সুগন্ধ আছে, খড়ের গাদায়, ঘরের চালে, বৃষ্টি পড়িয়া একটি সিক্ত গন্ধ বাহির হয়; তাহার সঙ্গে মেশে মালতী আর বকুলের সৌরভ।

শরতের বিশেষ গন্ধটি পাওয়া যায় সন্ধ্যাবেলায় প্রৌঢ় ধানক্ষেতের সান্নিধ্যে

—তপ্ত কোমল উদ্ভিজ্জ সুবাস।

শীতের সৌরভ নূতন-কাটা ধানের, ক্ষেতে পালা দিয়া রাখা খড়ের শুষ্ক তৃণের উপরে সান্ধ্য শিশিরসম্পাতের।

বসন্তের গন্ধ বহু সৌরভের টানাপোড়েনে গড়া। তাহাতে আছে আমের মুকুল ও শালফুলের মোটা সুতা, সূক্ষ্ম বুনানি আছে শিরীষ আর মহুয়ায়; চটকদার ফুল-কাটা আছে চাঁপার আর মুচকুন্দ ফুলের।

শান্তিনিকেতনের এক-একটি স্থানের সঙ্গে এক-একটি গন্ধের স্মৃতি জড়িত। ছাতিমতলায় ছাতিমফুলের উগ্রমদির গন্ধ; উত্তরায়ণের পথে হেনা আর রজনীগন্ধার তরল সুরভি; নূতন বাড়িতে ঝুমকো ফুলের সুবাস; আর যেদিন ফাল্গুনের দুপুরবেলায় নূতন দক্ষিণা বাতাস তপ্ত হইয়া উঠিয়া শালবনের মধ্যে মাতামাতি লাগায়, এই-সব বিচিত্র গন্ধ একদল অদৃশ্য কস্তুরীমৃগের মতো কোন সর্বনাশের মুখে উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে।

'বীরভূমে প্রকৃতির এক খেয়াল আছে; এই অঞ্চলের লোকে তাহাকে খোয়াই বলে; খোয়াই আর কিছুই নয়, বর্ষার জলে ক্ষইয়া-যাওয়া কঙ্কর-বাহির-হওয়া ভাঙা-ভাঙা ডাঙা; এই খোয়াই বীরভূমের বৃহৎ একটা অংশ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। বর্ষার বারিধারা অজস্র আঙুলে ইহাকে রচনা করিতেছে; জল চলিয়া গেলে কার্তবীর্যার্জুনের হাজার হাতের হাজার হাজার আঙুলের কীর্তি পড়িয়া থাকে; তখন এই শূন্য প্রান্তরগর্ভে দাঁড়াইলে যতদূর চোখ যায়, উত্তরে পূর্বে, পশ্চিমে দক্ষিণে, ধূসর, রক্তিম, গহ্বর দৃষ্ট হয়; চারি দিকে উঁচু নিচু মাঝারি কঙ্করের গিরিমালার মতো; নীচে বালুর শয্যা; বালুশয্যার একান্তে কোথাও কোথাও স্বচ্ছ ক্ষীণ জলরেখা; এই জলরেখার তীরে তীরে কেতকী-ফুলের ঝোপ; যেখানে মাটির অংশ বেশি সেখানে হৈমন্তিক ধানের ক্ষেত; এই ক্ষেতের পাশে পাশে শরৎকালে কাশের ফুল ফোটে, বর্ষায় আর শরতে প্রকৃতির এই দিগন্তব্যাপী গেরুয়ার মধ্যে সাদা আর সবুজের প্রক্ষেপ দেখা যায়; বৎসরের বাকি সময়ে এই দগ্ধ ধূসর রক্তিম বন্ধুর তরঙ্গায়িত ভূখণ্ড আনন্দমঠের সন্তানবাহিনীর পুঞ্জ পুঞ্জ গেরুয়া বস্ত্ররাশির মতো পড়িয়া থাকে; খোয়াই আর কিছুই নয়, জলহীন জনহীন জীবহীন নিস্তব্ধ লোহিত সমুদ্র মাত্র।'

এই খোয়াই শান্তিনিকেতনের মাঠের একটা বৃহৎ ব্যাপার; এখানকার জীবনের সঙ্গে এই জীবনহীন প্রাকৃতিক খেয়াল নানা ভাবে সংযুক্ত হইয়া

গিয়াছে। আমার কাছে শান্তিনিকেতনের জীবনে প্রধানতম আকর্ষণ ছিল কোপাই নদী।

'কোপাই বিশেষভাবে বীরভূমের নদী, বীরভূমের মধ্যেই তাহার জীবনের আদ্যন্ত; এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তে তাহার জন্ম এবং এই জেলার পূর্বপ্রান্তে বক্রেশ্বরের নদীতে তাহার লীলাশেষ; অজয়ের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে কোপাই প্রবাহিত; ইহার উৎস-মূলে কোনো পাহাড় বা নদী নাই, সেখানে এক ভূবিবর হইতে ইহার উদ্ভব। উৎস হইতে জলের সঞ্চয় পায় না, কিন্তু পথে চলিতে চলিতে বীরভূমের দক্ষিণ-অংশ-ধৌত জল সংগ্রহ করিয়া কোপাই পথের শেষে পৌঁছিয়াছে।

'উৎস হইতে আরম্ভ করিয়া কোপাইয়ের গতিপথের মাঝামাঝি পর্যন্ত তীরভূমি অত্যন্ত নিচু, অনেক স্থানেই নদীর সমতল; দুই তীরে মাঠ, সে মাঠে ধান ছাড়া আর-কিছুই ফসল ফলে না। নদীর শেষের অংশটায় তীরভূমি অত্যন্ত উচ্চ, নদীগর্ভ গভীর; গ্রীষ্মকালেও হাঁটুজল থাকে, তীরভূমিতে কোথাও কোথাও গভীর বন শাল তাল পলাশ সেগুনের।'

সতেরো বছরের পরিচয়ে কোপাই আমার কাছে সপ্তদশী। আমি তাহার নাম রাখিয়াছিলাম কোপবতী। এই তন্বী কিশোরী ক্ষীণতনুতে গঙ্গাজলী ডুরে শাড়িখানা আঁটিয়া পরিয়া নুড়ির নূপুর বাজাইয়া ক্ষিপ্রচরণে চলে; পাথরে-লাগা ফেনায় তাহার হাসির শুভ্রতা; স্রোতের কলধ্বনিতে তাহার প্রগল্‌ভ প্রলাপ; আর দুই তীরের স্রস্ত ছায়াতে দ্বিধাবিভক্ত, শিশিরস্নিগ্ধ, তাহার কালো চুলের অজস্রতা।

শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের সঙ্গে কোপাইয়ের হাজার ঘটনায় গ্রন্থি পড়িয়া গিয়াছে; বনভোজনে কোপাইয়ের তীর, বনভ্রমণে কোপাইয়ের তীর, সান্ধ্যভ্রমণে কোপাইয়ের তীর; আমাদের জীবনের নানা স্তরের সঙ্গে কোপাইয়ের সৌন্দর্য মিশিয়া গিয়াছিল।

এমনি একদিনের কথা মনে আছে। তখন আমার আশ্রমবাসের শেষের দিক। একদিন আমরা একদল সন্ধ্যাবেলা কোপাইয়ের তীরে বেড়াইতে গেলাম। সেটা ছিল বসন্তকাল, আর তিথি ছিল পূর্ণিমা।

'কোপাই নদীর দুই তীরের বনে যেমন বসন্তসমারোহ, এমন বাংলাদেশে আর কোথাও নহে। শান্তিনিকেতনের উত্তরে কোপাই নদীর তীরে বহু ক্রোশ

জুড়িয়া কোনো গ্রাম নাই, কেবল অরণ্য। ঘন অরণ্য নয়, গ্রামের নিকটেই, অথচ গ্রাম হইতে বিভক্ত।

'তখন পলাশগাছের শেষ পাতাটি ঝরিয়া গিয়াছে, গোড়া হইতে চূড়া পর্যন্ত কেবল ফুল আর ফুল, এমন শত শত গাছ, শিমুল গাছ উচ্চ দীর্ঘ শাখাগ্রে রক্তিম ফুল ফুটাইয়া আকাশকে রঙ করিতে চাহিতেছে; ইহাদের অজস্র পুষ্পসম্ভারের সঙ্গে আকাশফাটা বিরাট একটা রক্তিম অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুর তুলনা হয় না। এমন ক্রোশের পর ক্রোশ, নির্জন অরণ্য নদীর দুই তীর ব্যাপিয়া। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, অজস্র রক্তিম পুষ্পশিখায় পুরাকালের খাণ্ডবদাহনের পুনরভিনয় চলিতেছে।

'আর-এক দিকে শালের বন, বলিষ্ঠ শাখাগুলি হস্তিদন্তাভ পুষ্পদলের ভারে আনত; মাটিতে একহাঁটু গভীর পুষ্পদল; চলিতে গেলে মধুতে পা আঁটিয়া যায়; মাঝে মাঝে আমের গাছ, পাটল মঞ্জরীতে আকণ্ঠ পূর্ণ; এক-একবার দমকা বাতাস আসে, একরাশ মুকুল ঝরিয়া পড়ে; একদল মৌমাছি গুন্ গুন্ করিয়া ওঠে, আবার সব নিস্তব্ধ, কেবল কোকিলটার ছুটি নাই— নন্দনে আদিদম্পতির নিদ্রাভঙ্গের যে গান সে শিখিয়াছিল সেই কুহুস্বর সে নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়াছে।'

সেই নদীর তীরে বসিয়া আমাদের গানের আসর জমিল; গান যখন ভাঙিল তখন দেখি পূর্ব দিকের বনশাখার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নাধারায় অমৃতের পিচকারি বনভূমিতে পড়িয়াছে; ও পারের জল কালো, এ পারের জলে ঝিকিমিকি।

এই বন হইতে ফিরিবার পথ বাহির করিবার ভার পড়িল আমার উপরে। খুব লোকের উপর ভার দেওয়া হইল বটে! আমার কি ফিরিবার ইচ্ছা ছিল! এক ঘণ্টার পথ তিন ঘণ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন বন হইতে বাহির হইলাম, তখন মাথার উপরে চন্দ্রের মুখে কৌতুকের হাসি! তালের মসৃণ শাখায় নীরব জ্যোৎস্না মূর্ছিত। বিশ্বছবি হস্তিদন্তের পটে খোদিত। আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ছায়া নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কাহারো মুখে শব্দটি নাই; তখন যে ভাব আমাদের মনে দুলিতেছিল সংগীতেও তাহা প্রকাশ করা চলে না, বোধ করি নীরবতাই তাহার একমাত্র ভাষা।

কোপাই নদীর উৎস-সন্ধানে

৭ই পৌষের মেলার পরে দশ-পনেরো দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকিত, তখন ছেলেরা দলে দলে নানা স্থানে বেড়াইতে বাহির হইত। আমার মনে হইল, একবার এই সময়ে বাহির হইয়া কোপাই নদীর উৎসটা দেখিয়া আসিলে কেমন হয়। বিভূতি গুপ্তকে এই মতলবটা বলিলাম। তাঁহারও বেশ মনে লাগিল। তখন আমরা দুজনে আগামী বড়োদিনের ছুটিতে উৎসের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িবার উদ্যোগ শুরু করিলাম। আমাদের পরিকল্পনায় নূতনত্ব ছিল, কাজেই সঙ্গীদলও জুটিতে বিলম্ব হইল না। আমাদের এই-সব উদ্ভট পরিকল্পনায় আরো একজন উৎসাহদাতা ছিলেন ; তাঁহার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংক্ষেপে ধী. মু.।

বীরভূম গেজেটিয়ার হইতে জেলার ও নদীর মানচিত্র সংগ্রহ হইল ; কিন্তু সমস্যার অন্ত হইল না। আমরা নদীর ধারে ধারে যাইব, সেখানে তো গোরুর গাড়ির পথ নাই, জিনিসপত্র বহন করিবে কে ? ইহার কিছুকাল আগে স্টিভেনসনের 'ট্রাভেল্‌স্ উইথ্ এ ডঙ্কি' পড়িয়াছিলাম, কাজেই মনে হইল গোটা দুই গাধা জোগাড় করিয়া তাহাদের পিঠে মালপত্র চাপাইয়া দিলেই চলিতে পারে। লেংড়ু-নামে আমাদের এক ধোপা ছিল, তাহার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়া কয়েক দিনের জন্য গোটা দুই গাধা পাওয়া গেল। গোটা দুই ছোটো তাঁবু, চাল ডাল প্রভৃতি রসদ, পাকের জন্য বাসন, কিছু কিছু ঔষধ, বিছানা ও কাপড়-চোপড়ে জিনিস মন্দ হইল না।

তার পর একদিন বিকালবেলায় আমাদের ছোটো অভিযাত্রীদলটি দুটি গাধার পিঠে বোঝা চাপাইয়া ধীরে ধীরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পশ্চিম মুখে যাত্রা করিল। এমন নূতন অভিযান ইতিপূর্বে মানুষ বা মানুষেতর প্রাণীতে দেখে নাই, কাজেই পিছন হইতে ছেলের দল ও আশ্রমকুক্কুরেরা চীৎকার শুরু করিয়া দিল। এই বিকট চীৎকারে গাধা দুটি ভীত হইয়া পিঠের বোঝা ফেলিয়া পালাইল। কোনো রকমে আবার তাহাদের ধরিয়া আনিয়া পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিলাম। পাছে গাধার কানে চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করে তাই তাহাদের কান কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলাম ; পাছে চোখে জনতার নৃত্য দেখিতে পায়, তাই সম্মুখ হইতে সকলকে সরাইয়া দিলাম ; আর, জনতাকে দ্রুত পার হইয়া যাইবার জন্য জানোয়ার দুটাকে যষ্টির ইঙ্গিতে অনুরোধ করিলাম। গাধার আত্মসম্মান ও আমাদের আত্মসম্মান আমাদের কাছে অভেদ হইয়া গিয়াছিল ; কারণ

আমরাই তাহাদের উপরে এই নূতন দায়িত্ব চাপাইয়াছি। গাধার গতি যে এত মন্থর আগে কে জানিত! ক্রোশ দুই দূরবর্তী কোপাইতীরের বল্লভপুর গ্রামে যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানে নদীর ধারে আমাদের তাঁবু পড়িল। রাত্রে আহারান্তে যখন সকলে শয্যাগ্রহণ করিলাম তখন কী শীত! গাধা দুটি তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। মাঝরাতে গাধার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিভূতি গুপ্ত বলিল, 'আহা, বেচারাদের শীত করছে!' নিজেদের গায়ের কম্বল গাধার গায়ে জড়াইয়া দিলাম। এক-চুমুক ঘুমের পরে আবার গাধার ডাক, 'আহা, বেচারাদের শীত ভাঙে নি!' আমাদের গায়ের দুখানা কম্বল তাহাদের গায়ে উঠিল। এমনি করিয়া প্রহরে প্রহরে, আমাদের গায়ের কম্বল তাহাদের গায়ে উঠিতে লাগিল; তাহাদের শীত ভাঙিল কি না জানি না, কিন্তু আমরা শীতে জড়োসড়ো হইয়া খড়ের গাদার উপরে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলাম।

ভোর হইবামাত্র গাধা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁবু হইতে বাহির হইলাম; কিন্তু একি, গাধা কোথায়! দড়ি ছিঁড়িয়া, কম্বল ফেলিয়া, জানোয়ার দুটি কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহারা রজকালয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। অকৃতজ্ঞ প্রাণী! বিভূতি গুপ্ত বলিল, "শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, নির্বোধও বটে। এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ইতিহাসে নাম থেকে যেত— তা সহ্য হবে কেন? মরুক বেটারা এখন ধোপার কাপড় বয়ে।"

আমাদের হাতে গালাগালি ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ছিল না। আর, প্রাণী দুটিকে গাধা বলিলেও তাহাদের যথেষ্ট অপমানিত হইবার কথা নয়। এরকম অবস্থায় উহাদের অকৃতজ্ঞতায় নিজেরাই অপমান বোধ করিয়া গোরুর গাড়ির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সেইদিন হইতে আমাদের বাহন হইল গোরুর গাড়ি, গাধা-পর্বের এইখানেই শেষ।

আমরা ভোরবেলা উঠিয়া, বেলা দশটার মধ্যে রান্না ও আহার শেষ করিয়া যাত্রা করিতাম। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলিতাম। সন্ধ্যাবেলা যে গ্রামে পৌঁছিতাম সেখানেই রাত্রিযাপন। গোরুর গাড়িখানা ছাড়িয়া দিয়া পরের দিনের জন্য সেই গ্রাম হইতে আর একখানা গোরুর গাড়ি সংগ্রহ করিতাম।

প্রথমবারের অভিযানে আমরা কোপাইয়ের উৎস পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। দুবরাজপুর রেল্‌স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছিতে দশ দিন সময় লাগিল। ফলে

অভাবিত বিলম্বের নানা কারণ ঘটিল, তার উপরে আবার রসদ অর্থাৎ নগদ টাকাও ফুরাইয়া গেল। কাজেই দুবরাজপুর হইতে ট্রেন্‌যোগে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইহাতে আমরা দমিলাম না, কারণ মেরু আবিষ্কৃত হইতে বহু শত বৎসর লাগিয়াছে, আর এই তো ঘরের কাছে এভারেস্টের শিখরে মানুষ এখনো পদার্পণ করিতে পারে নাই।[১]

পরের বছর আবার দুবরাজপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়া সেখান হইতে উৎসের অনুসন্ধানে পদব্রজে অভিযান শুরু হইল। সে বছরও আমরা উৎস পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না; নদীর ধারাকে অনুসরণ করিতে হইত বলিয়া সময় অযথা বেশি লাগিত। তৃতীয় বছর আমরা কোপাই নদীর উৎসে গিয়া পৌঁছিলাম। জায়গাটার নাম খেজুরি, সাঁওতাল পরগনার প্রায় সীমান্তে; উচ্চ মালভূমিধৌত জল হইতে ইহার উদ্ভব, উৎস বলিয়া বিশেষ কিছু নাই।

সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সংসারবিষবৃক্ষের দুইটি মধুর ফল— কাব্যপাঠ ও সজ্জনের সংগম। তাহার সঙ্গে তৃতীয় একটি যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শীতের রোদ পিঠের উপরে পড়িয়াছে, সম্মুখে ধূসর পথ, দিগন্তে বাষ্পকুহেলিকাময়, বনশ্রেণী, নিরুদ্দেশ লক্ষ্য এবং মনের মধ্যে দায়িত্বহীন লঘুতা, এমনভাবে পথ চলিতে যে আনন্দ তাহা পূর্বোক্ত দুটি অমৃতফলের চেয়ে কম মধুর নয়। বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে আমরা চলিতাম; তার পরে যেখানে একটা গ্রাম জুটিত একটা জলাশয়ের তীরে তাঁবু গাড়িয়া রান্নার আয়োজন হইত। আহারান্তে তাঁবুর মধ্যে কম্বল গায়ে দিয়া নিদ্রা। ভোরবেলা উঠিয়া দেখিতাম, নিদ্রিত প্রকৃতি সবে জাগিতেছে, কচি রবিশস্যের ক্ষেত শিশিরে শ্বেতাভ, খেজুরের রস গড়াইয়া বায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধমদির, গাছের পাতা হইতে টুপ টুপ করিয়া শিশির পড়িতেছে— সমস্তই কেমন চিরনবীন। প্রকৃতির এই অক্ষয় নবীনতার মধ্যে মানুষই কেবল জরাগ্রস্ত হয়, ইহার চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি জীবনে আর কী আছে ?

মাঝে মাঝে এক-একটা অদ্ভুত লোক আমাদের সঙ্গ লইত। একবার একটা লোক জুটিয়া গেল, তাহার নাম ছানারাম। লোকটা যেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের একটা কঙ্কাল। লোকটার আর কোনো গুণ না থাকিলেও প্রচুর স্পষ্টবাদিতা ছিল। সে গোড়াতেই বলিয়াছিল, সে কোনো কাজ করিতে পারিবে না,

১ প্রথমে ১৯৫৩ সালে ও পরে কয়েকবার এই শিখর বিজিত হইয়াছে।

কাজই যদি করিতে পারিবে তবে সে ঘরবাড়ি ছাড়িল কেন ? তবে সে সন্ধ্যাবেলা আমাদের গান শুনাইবে— আর দু বেলা হোক, চার বেলা হোক, যখনই সুযোগ আসিবে তখনই পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে! সংসারে অধিকাংশ লোকই ছানারামের মতাবলম্বী ; কিন্তু সর্বত্র এমন স্পষ্টবাদিতা দেখা যায় না, কাজেই এমন আদর্শ পুরুষকে আমরা ছাড়িতে পারিলাম না।

যখন সে রাত্রে আহারান্তে গান ধরিত আমরা তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিতাম, কিন্তু সে থামিবে কেন ? উপকারের প্রত্যুপকার না দিয়া সে কি পারে ? কাজেই গ্রামের কুক্কুরদলের তারস্বরের সংগতে ছানারামের গান চলিত, আর আমরা নষ্ট ঘুমের সাধ্যসাধনা করিতাম।

মাঝে মাঝে আশ্রমের অন্য দলের সঙ্গে পথে দেখা ঘটিত। একবার এমন হইয়াছিল বক্রেশ্বর-নামক স্থানে। সকালবেলা আমাদেয় রান্না চড়িয়াছে ; এমন সময়ে শুনিলাম অদূরবর্তী আমবাগানে সন্তোষবাবুর নেতৃত্বে আশ্রমের একটি দল তাঁবু ফেলিয়াছে, সঙ্গে মেয়েরাও আছে।

এ দিকে আমাদের ভাত পুড়িয়া গিয়াছে, পাছে মেয়েরা আসিয়া এই দুর্দশা দেখিয়া অনুকম্পামিশ্রিত হাস্য করে, তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া দিয়া, বাসন মাজিয়া, মুখ ধুইয়া আহারের অভিনয় শেষ করিলাম। তাহাদের আসার চেয়ে আমাদের দেখা করাই নিরাপদ ; অতএব সেখানে গেলাম। পাঁউরুটি-মাখন-চা-সহযোগে তখন তাহাদের প্রাতরাশ চলিতেছে। পাঁউরুটি মাখন সভ্যজগৎ ছাড়িবার পরে আর দেখি নাই। সন্তোষবাবু বলিলেন, "তোমাদের খাওয়া এর মধ্যেই শেষ হল! তোমাদের ম্যানেজ্‌মেণ্ট ভালো, আমাদের যে কখন হবে তার ঠিক নেই।" হেমবালা সেন শুধাইলেন, "কী কী রান্না হয়েছিল ?" কী হইয়াছিল ? ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি, ভাজা, টক— যাহা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম ; যাহাই বলিব সবই তো মিথ্যা, এমন ক্ষেত্রে কিছু ফলাও করিয়া বলাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তাঁহারা আমাদের খাদ্যতালিকা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সন্তোষবাবু বলিলেন, "একটু পাঁউরুটি—?" তাঁহার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই বলিলাম, "মাপ করবেন, পেটে একটুও জায়গা নেই।" এত দীর্ঘ খাদ্যতালিকা আবৃত্তি করিয়া আর পাঁউরুটি খাওয়া চলে না। সন্তোষবাবু বলিলেন, "তবে, অন্তত এক পেয়ালা চা ?" নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই যেন সম্মত হইলাম। একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল। এমন

মধুর পেয়ালা জীবনে আর জোটে নাই। শূন্য জঠরে, দীর্ঘ দিনের পথ হাঁটার পরিশ্রম সম্মুখে করিয়া যখন আমি চা পান করিতে লাগিলাম তখন তাঁহারা আমাকে মনে মনে নিশ্চয় ঈর্ষা করিতেছিলেন, সকাল হইতে-না-হইতে এত খাদ্য আমার ভাগ্যে জুটিয়াছে— ভাগ্য ভালো। প্রচুর চিনি, দুধ ও প্রচুরতর ঈর্ষা-মিশ্রিত পেয়ালা শেষ করিয়া যখন উঠিলাম হেমবালা সেন বলিলেন, "আজ তোমরা যা যা খেয়েছ আমরাও ঠিক তাই খাব।" আমি ক্ষুধিত হইলেও অকৃতজ্ঞ নই, বিশেষ চায়ের স্বাদ তখনো মুখে লাগিয়া আছে; বলিলাম, "তেমন যেন আজ আপনাদের ভাগ্যে না জোটে!" তাঁহারা বোধ করি ভাবিলেন, লোকটা অকৃতজ্ঞ। আমি জানি, আমি তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। সংসারের ইহাই কমেডি অব এররস্।

চোর-ধরা

একবার মেয়েদের বোর্ডিঙে চুরি আরম্ভ হইল। প্রায় প্রতি রাত্রেই চোর আসিত। চোর যে-ই হোক সে অত্যল্পকালের মধ্যে বুঝিয়া ফেলিল, চুরির এমন নিরাপদ স্থান অল্পই আছে। চোর যে ধরা পড়িত না তার প্রধান কারণ, চোর পলাইয়া গৃহে পৌঁছিলে তবে মেয়েরা জাগিয়া উঠিয়া গোলমাল শুরু করিত। এই রকম কিছুদিন যায়, একদিন মধ্যরাত্রে চৌরোত্তর কোলাহল শুনিয়া জাগিয়া উঠিলাম— আমার ঘর মেয়ে-বোর্ডিঙের কাছেই ছিল। দেখি বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হেমবালা দেবীকে ঘিরিয়া মেয়েরা জটলা করিতেছে; তাহাদের আলোচনার বিষয় চোরের গন্তব্য পথ।

আমি শুধাইলাম, "ব্যাপার কী?"

হেমবালা দেবী বলিলেন, "চোর রেল-লাইনের দিকে গিয়াছে।"

সে রাত্রি আবার ঘোর অন্ধকার; এমন নিরেট অন্ধকারে চোরের গন্তব্য স্থান বুঝিয়া ফেলা সামান্য বুদ্ধির কাজ নয়।

"কিছু নিয়েছে কি?"

একসঙ্গে তিন-চারিটি কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল, "আমার বাক্স!"

বুঝিলাম, কণ্ঠস্বরের মালিকাদের বাক্সগুলি খোওয়া গিয়াছে। এতগুলি বাক্স লইয়া যাওয়া একজন চোরের কর্ম নয়, কাজেই চোর একাধিক আসিয়াছিল।

হেমবালা দেবী বলিলেন, "তুমি একটু ঐ দিকে এগিয়ে দেখো তো।"

সর্বনাশ! এতগুলি চোরের সন্ধানে আমি একা, তাহাতে আবার রাত্রি এমন অন্ধকার! কিন্তু 'না' বলা তো চলে না। মানুষের একটা বয়স আছে যখন মেয়েদের কাছে কিছুতেই ভীরুতা প্রকাশ করা যায় না। তাই মুখে বলিলাম, "তা, যাচ্ছি।" মনে মনে ভাবিলাম, 'কাছেই কোথাও কিছুক্ষণ গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া আসিয়া বলিব, অনেক খুঁজিলাম, চোর তো পাইলাম না।'

হেমবালা দেবী বলিলেন, "অন্ধকারে যাবে, এই আলোটা নিয়ে যাও।" এই বলিয়া একটা লণ্ঠন আমার হাতে তুলিয়া দিলেন।

আরে সর্বনাশ! অন্ধকারে গা-ঢাকা দিবার সুযোগ গেল! এখন আলো দেখিয়া সকলে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিবে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়া আর চলিবে না। কিন্তু, বেশিক্ষণ ভাবিবার অবসর ছিল না, অনেকগুলা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি আমাকে খোঁচা মারিতেছিল। কাজেই লণ্ঠনমাত্র সহায় লইয়া গভীর অন্ধকারে, খোলা মাঠের মধ্যে অনেকগুলি চোরের অভিমুখে আত্ম-বিসর্জন করিলাম। তবে আমার স্বপক্ষে এইটুকু ছিল যে, মাঠের মধ্যে চোর কোথাও ছিল না, ততক্ষণে তাহারা বোধ করি গৃহে ফিরিয়া সুখনিদ্রায় মগ্ন।

আমি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, "চোর তো মিলল না।"

অন্ধকারের মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ বলিল, "মাসিমা, আমার হাত-বাক্সটা ফেলে গিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "আজ রাতে ধরা নাই পড়ল, কাল রাত্তিরে ধরা দেবে।"

হেমবালা দেবী বলিলেন, "কেমন করে জানলে যে কাল আসবে?"

"ঐ যে হাত-বাক্সটা ফেলে গিয়েছে, ওটার লোভ তো কম নয়।"

হাতবাক্সের মালিকের দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার প্রতি সঙিন চালনা করিল।

চোর ধরিতে পারি নাই শুনিয়া পরদিন সকালে নেপালবাবু আমাকে গঞ্জনা দিয়া বলিলেন, "ও তোর কর্ম নয়।" যেন চোর-ধরা আমার কর্ম বলিয়া আমি ঘোষণা করিয়াছি। "আমাকে ডাকিস, আমি চোর ধরব।" যেন সারা জীবন তিনি চোর-ধরায় হাত পাকাইয়াছেন।

কয়েক দিন পরে আবার চোর আসিল। সেদিন জ্যোৎস্নারাত। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, চোরের সাহস ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে, এখন আর কৃষ্ণপক্ষের জন্য

সে অপেক্ষা করে না। নেপালবাবুর কথা আমার মনে ছিল। আমি তাঁহাকে খবর দিলাম। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে কোঁচার কাপড় কোমরে জড়াইয়া চলিয়া আসিলেন। চোর-ধরার উপযুক্ত পোশাক বটে। তিনি ঘটনাস্থলে আসিয়াই বলিলেন, "চোর ঐ দিকে গিয়েছে, চল্ ধরে আনি।" যেন চোর মূলার শাক, ক্ষেতে গিয়া উপড়াইয়া আনিবার অপেক্ষা মাত্র। আমি ও বিভূতি গুপ্ত (বুধবারের যুগ্ম-সম্পাদক) তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। চোর-ধরায় আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই জানিয়াও নেপালবাবু আমাদের যে কেন সঙ্গে লইলেন জানি না, বোধ করি চোর-ধরার সরল উপায় দেখাইয়া দিবার জন্যই হইবে। তিনি কিছুদূর গিয়াই সোজা খোয়াইয়ের মধ্যে নামিয়া পড়িলেন ; বলিলেন, চোরের লুকাইয়া থাকিবার এমন স্থান আর নাই। বুঝিলাম, চোর নেপালবাবুর হাতে ধরা পড়িবার জন্যই এখানে বমাল অপেক্ষা করিয়া আছে। খোয়াইয়ের মধ্যে উঁচুনিচু ঢিবি, তার গায়ে আবার কাঁকর ছড়ানো। এতক্ষণে বুঝিলাম, নেপালবাবু কেন আমাদের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উঁচুতে উঠিবার সময়ে কাঁকরে তাঁহার খড়ম ফস্‌কিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া আসেন ; আর তিনি বলেন, "তোরা আমাকে ঠেলে তোল্।" আমরা দুজনে প্রাণপণে তাঁহাকে ঠেলিতে থাকি। কী আশ্চর্য ! তিনি উপরে ওঠেন। আবার নীচে নামিবার সময় বলেন, "সাবধান, আমাকে টেনে রাখিস।" আমরা প্রাণ-পণে তাঁহাকে টানিয়া রাখি। তিনি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া পড়েন। এইভাবে খোয়াই অতিক্রম করিয়া তিনজনে চলিতেছি ; একজন চোর ধরিবেন, আর দুইজন চোর-ধরনেওয়ালাকে ধরিবেন। সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, নির্জন খোয়াইয়ে ভাগ্যিস আর কোনো দর্শক উপস্থিত ছিল না। আমরা হাসিয়া ফেলিলে তিনি ধমক দিয়া ওঠেন, "হাসছিস কেন ? এই কি হাসবার সময় হল ? চোর যে— হুঁশিয়ার ! টেনে রাখিস।" হাসির সঙ্গে চোরের কী সম্বন্ধ সে কথা শেষ করি-বার আগেই খোয়াইয়ের উৎরাই আসিয়া পড়ে, তিনি বলেন, "হুঁশিয়ার ! টেনে রাখিস।" এই রকমে ঘণ্টা-দুই ঘোরা হইল, কিন্তু চোর কোথায় ? আর, চোর কাছেই কোথাও থাকিলেও সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ ছিল না। আমাদের দুজনের মনোযোগ তাঁহার নির্বিঘ্নতার দিকে, তাঁহার মনোযোগ আমাদের কর্তব্য-বুদ্ধির দিকে, চোরের জন্য আর-কিছু অবশিষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি দাঁড়ান, একাগ্রভাবে কী যেন শোনেন, আর বলেন, "উঁহু !"

কখনো দিক পরিবর্তন করেন; কখনো পিছনে ফিরিয়া চলেন; কখনো বসিয়া বসিয়া কী যেন লক্ষ্য করেন; কখনো মুখে তর্জনী স্থাপন করেন, কখনো ভিজা জায়গায় পায়ের চিহ্ন দেখিয়া রবিন্‌সন ক্রুসোর মতো চমকিয়া ওঠেন; আমরা যদি বলি "ও তো আপনারই খড়মের দাগ" অমনি তাঁহার মুখে চোখে যে কী নীরব ধিক্‌কার ফুটিয়া ওঠে! তা বটে! আমরা যে এ বিষয়ে নিতান্ত নাবালক। গোয়েন্দা যদি খড়ম পায়ে চোরকে অনুসরণ করিতে পারে, খড়ম পায়ে দিয়া চোরের আসা কি এতই অসম্ভব। এ যেন অভিনব শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে যুগল ওয়াট্‌সন।

অবশেষে নেপালবাবুকে স্বীকার করিতে হইল যে, চোর এ দিকে আসে নাই। হায়! সংসারে চিরজয়ী কে আছে? ফিরিবার পথেও ঐভাবে ফিরিলাম, কখনো তাঁহাকে ঠেলিয়া, কখনো তাঁহাকে টানিয়া। বলা বাহুল্য, অন্য রাত্রের মতো সে রাত্রেও চোর ধরা পড়িল না, তা বলিয়া অভিজ্ঞতা কম হইল না। ইহার পরে চুরি হইলে নেপালবাবুকে আর খবর দিতাম না, তাহাতে চোরের সুবিধা হইত আর আমাদের সুবিধাও কিছু কম হইত না।

বাঘ-শিকার

এই চোর-ধরার গল্প বলিতে গিয়া আর-একটা গল্প মনে পড়িল। সে এক বাঘ-শিকারের কাহিনী। তখনো আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করি নাই, বছর দুই বাকি আছে। একদিন বিকালে কয়েকজন সাঁওতাল আসিয়া খবর দিল যে, তালতোড়ের বাঁধের ধারে একটা বাঘ আসিয়াছে। তাহারা তীর-ধনুক দিয়া বাঘটাকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বাঘটা এমনই বেরসিক যে মরিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। এই কথা শুনিবামাত্র আমাদের একটা পরামর্শসভা বসিল। তখন আমরাই ছিলাম আশ্রমের বয়স্ক ছাত্র। নরভূপ রায় (সেই যিনি নেপালের জঙ্গলে প্রত্যহ বিকালে একটি করিয়া বাঘ শিকার করিয়া বৈকালিক ব্যায়াম সমাধা করেন), সবি (Sabi is an ass ইতি খ্যাতিসম্পন্ন) ও মণি দত্ত বলিয়া একটি ছেলে বলিল, "চলো, বাঘটাকে শিকার করা যাক।" এ দিকে আমার ও অপর কয়জন সহপাঠীর মনে অকস্মাৎ 'জীবে দয়া'র আবির্ভাব হইল। সহপাঠীদের নাম আর নাই করিলাম। তবে, তন্মধ্যে অন্যতম হইল ভজু। সেদিন সে বাঘ মারিতে অস্বীকার করিয়াছিল, আজ

তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ডাক্তার হইয়া মানুষ মারিতেছে— অভিজ্ঞতা ও সাহস দুই-ই তাহার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা বলিলাম, "বাঘ তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করে নাই, তবে বৃথা মারিবে কেন ?"

মণি দত্ত বলিল, "ক্ষতি করা অবধি বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

সবি বলিল, "সাপ ও বাঘ মানুষের শত্রু। শত্রু আক্রমণ করিবার আগেই তাহাকে আক্রমণ করা উচিত।"

নরভূপ কিছু বলিল না। কেবল অদৃশ্য কুরকীর স্থানটায় অজ্ঞাতসারে হস্তচালনা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি, তাহার চোখ দুইটা আসন্ন রক্তপাতের উল্লাসে নেপালী তরক্ষুর চোখের মতো জ্বলিতেছে।

দলে আমরা ভারী, শিকারীরা মাইনরিটি— কাজেই ভরসা ছিল মেজরিটির 'জীবে দয়া'য় তাহারা নিরস্ত হইতে পারে। কিন্তু মাইনরিটি প্রায়ই ডমিনাণ্ট্ মাইনরিটি হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটিল। আমরা তখন বাস্তব বাধা উত্থাপন করিলাম, "অস্ত্র কোথায় ?" মাইনরিটি সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন, সন্তোষবাবুর বন্দুক !"

সন্তোষবাবুর একটি বন্দুক ছিল ; সমস্ত আশ্রমে ইহাই একমাত্র অস্ত্র ; কিন্তু এই একটি অস্ত্রই সমস্ত আশ্রমবাসীদের আশাভরসার স্থল ছিল। চোর ডাকাত হইতে শুরু করিয়া শিয়াল কুকুর (বাঘের কথা কখনো ভাবি নাই) প্রভৃতি কোনো বিপদের আশঙ্কা হইলেই সকলের মনে একসঙ্গে সন্তোষবাবুর বাড়ির কোনো নিভৃত-তোরঙ্গ-শায়ী দ্বিমুখ আগ্নেয়াস্ত্রটির স্মৃতি উদিত হইত। অমনি আমরা মনে বল ফিরিয়া পাইতাম। অস্ত্রের এমনি মহিমা! অধিকাংশেরই কোনোদিন সে বন্দুক দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায় ? দেখি আর নাই দেখি, আমাদের বিপৎকালের জন্য তোরঙ্গের শীতলগর্ভে সেই দোনলা কুম্ভকর্ণ ঘুমাইয়া আছে— কেবল তাহাকে জাগাইবার অপেক্ষা মাত্র।

আমরা পুনরপি বলিলাম, "হয়তো দেখিবে, গুলি নাই।"

এবারে সবির পালা। সে বলিল, "দাদা কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় কী যেন আনিয়াছেন— হয়তো গুলিই হইবে।"

ভজু বলিল, "ফাঁকা গুলি নিশ্চয়।" কারণ, আশ্রমে জীবহত্যা নিষেধ অথচ বন্দুক চালনা করিতে হইবে, এমত অবস্থায় ফাঁকা গুলিই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।"

নরভূপ নাসিকা ও মুখের সাহায্যে দুর্বোধ্য একটা তর্জন করিল। ওরে বাপ্! তাহার চোখে কী হননেচ্ছার জ্বালা! ইহার পরে বন্দুকের গুলি বাহুল্য।

শিকারীর দল নিরস্ত না হইয়া তালতোড়ের বাঁধের দিকে চলিয়া গেল। তাহার পাশেই আশ্রমের শ্মশান।

শিকারীর দল চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা খবর পাইল যে, বাঘ আসিয়াছে। তাহারাও দলে দলে সেই বাঁধের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কাহারো হাতে কোনোরূপ অস্ত্র নাই, কিন্তু মুখে হাসিটি ঠিক আছে। এমন নিরস্ত্র অভিযান কদাচিৎ দেখা যায়। বালক ক্রুজেডারদের কথা মনে পড়িল। সেই দলের মধ্যে একজনের কথা মনে আছে। তিনি বীরেন সেন, বর্তমানে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও চলিয়াছেন, হাতে একটি ছাতা।

আমি প্রশ্ন করিলাম, "ছাতাটা কেন?"

তিনি বলিলেন, "বাঘ তাড়াব।"

আমি নির্বোধ জানিতে চাহিলাম, "সে আবার কিরকম?"

তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "কেন, সেই মেমসাহেবের গল্প পড় নাই? হঠাৎ বাঘের সামনে পড়িয়া তিনি ছাতা খুলিয়া আত্মরক্ষা করেন। কোনো-একটা বস্তু বিস্ফারিত হইতে দেখিয়া বাঘটা লেজ তুলিয়া পলাইয়াছিল।"

এই বলিয়া আমার মুখে সমর্থন খুঁজিয়া একবার হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "এ বাঘটা হয়তো সে গল্প পড়ে নাই। কাজেই কিরকম আচরণ করে বলা যায় কি?"

কিন্তু, বীরেন সেন দমিলেন না। পাছে বিপদের মুখে ছাতা খুলিতে ভুলিয়া যান, তাই আগে হইতেই ছাতাটা খুলিয়া লইয়া সদর্পে চলিয়া গেলেন!

দেখিতে দেখিতে আশ্রম জনশূন্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে দেখি, জগদানন্দ-বাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "দেখো তো কী অন্যায়— সকলে গেল, কারো হাতে কোনো অস্ত্র নাই। আর এ দিকেও তো কারো কারো থাকা দরকার।"

তার পরে বিশেষ অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "তোমরা যেন যেয়ো না। অবশ্য, তোমাদেরও যাবার খুব ইচ্ছা জানি। কিন্তু জানোয়ারটা হঠাৎ এ দিকেও তো আসিয়া পড়িতে পারে তখন লোকের দরকার। তোমরা এ দিকেই থাকো।"

আমরা বলিলাম, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমাদের যতই ইচ্ছা হোক, ও দিকে কখনো যাব না ; এ দিকের জন্যই থাকিব।"

জগদানন্দবাবু তো নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু, আমাদের প্রত্যেকের মনে দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইল। 'জানোয়ারটা এ দিকেই আসিয়া পড়ে বা' এ সন্দেহ তো আগে আমাদের হয় নাই।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জগদানন্দবাবুর সন্দেহের অঙ্কুর ততক্ষণে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে ; ভজুকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না যে একবার পরামর্শ করিব। আমরা একটা টালির ঘরে থাকিতাম। রৌদ্রের তাপ নিবারণের জন্য ছাদের নীচে কাঠের একটা পাটাতন ছিল। পাটাতনের উপরে উঠিবার ব্যবস্থাও ছিল। সেখানে গিয়া দেখি পাটাতনের মুখে মই লাগানো। আমি সেই মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছি, কিন্তু পাটাতনের উপরে ও আবার কে ? মানুষের পাশ ফিরিবার যেন শব্দ !

"উপরে কে ? ভজু নাকি ?"

অন্তরাল হইতে কণ্ঠস্বর আসিল, "ওহে, এসো।"

প্রশ্নোত্তর যুগপৎ হইয়াছিল।

ভজু বলিল, "কী করিয়া জানিলে যে আমি ?"

আমারও সেই একই প্রশ্ন।

আমরা অনেক দিনের সহপাঠী, পরস্পরকে বেশ জানিতাম।

সেই অন্ধকার পাটাতনের উপর গিয়া দুই জনে পাশাপাশি গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকিলাম।

"ওটা আবার কিসের পুঁটুলি হে ?"

ভজু বলিল, "মুড়ি আর গুড়। কতক্ষণ থাকিতে হয় কে জানে। হয়তো সারা রাত্রিই কাটিতে পারে। জগদানন্দবাবু বলিয়াছেন, "জানোয়ারটা এ দিকেও আসিয়া পড়িতে পারে।"

আমি বলিলাম, "পারে নয়, নিশ্চয়ই আসিবে।" দেখিলাম ভজু মইখানা টানিয়া উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সমান বিপদ, কাজেই আমিও ধরিলাম। বাঘের উঠিবার জন্য সিঁড়ি ফেলিয়া রাখা কোনো কাজের কথা নহে। কিন্তু মই আর তুলিবার প্রয়োজন হইল না, আশ্রমের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে তুমুল জয়ধ্বনি আসিয়া কানে প্রবেশ করিল। দুইজনে দ্রুত

নামিয়া সেই বিজয়ী জনতার দিকে ছুটিলাম। ভজু আমাকে পিছনে ফেলিয়া মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল।

জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি একখানা গোরুর গাড়ির উপরে একটা সদ্যমৃত চিতা বাঘ, চারি দিকে বিজয়ী শিকারীর দল— আর বাঘের লেজ ধরিয়া সার্থক শিকারের উল্লাসে উদ্দীপ্ত ও কে? ভজু যে! ভজু এখন আমাকে আর চিনিতেই পারে না! সকলকে সে শিকারের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতেছে যে স্বয়ং শিকারীরাও তাহা হইতে অনেক কিছু নূতন শিখিতেছে!

আমিই বা হটিব কেন? বলিলাম, "ওঃ! এই বাঘ? এ যে বাঘসি।"

জনতা বলিল, "বাঘসি কী?"

আমি বলিলাম, "আম শুকাইয়া যেমন আমসি, বাঘ শুকাইয়া তেমনি বাঘসি হইয়াছে। এত আয়োজনের পরে এই বাঘ মারিয়াছ?"

ক্ষিপ্ত জনতা চাপা তর্জন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আজকার দিনের ইহাই শেষ শিকার না হইতেও পারে। যে অন্ধকার হইতে উদিত হইয়াছিলাম সেই অন্ধকারের মধ্যেই আবার বিলীন হইয়া গেলাম। ভজু তখনো বাঘের লেজটা ছাড়ে নাই।

বাঘ শিকারে নরভূপ সবি ও মণিদত্তর কৃতিত্ব আছে। বাঘটা নরভূপকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছিল।

ভাবিলাম, বাঘ-শিকার-পর্ব এইখানেই বুঝি শেষ হইল— কিন্তু, হইল না।

সুধাকান্ত রায় ছিলেন আশ্রমের একজন অধিবাসী। তাঁহার বর্ণনা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। ডন্‌কুইক্‌সট্‌-স্রষ্টার কলম যদি আমার হাতে থাকিত তবে নাহয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।

এবারে সুধাকান্তদা আসিয়া বলিলেন, "ভাই-সব, তোমরা বাঘ মারিয়াছ, বেশ ভালো কথা। এবারে আমাকে খানিকটা বাঘের মাংস দাও।"

সকলে অবাক হইয়া বলিল, "বাঘের মাংস কী করিবেন?"

সুধাকান্তদা বলিলেন, "আমি খাব।"

"খাবেন? কিন্তু, খাদ্যের অভাব কী?"

সুধাকান্তদা বলিলেন, "মানুষে খায় খিদের জন্য। কিন্তু এ খাওয়া আমার খিদের জন্য নয়।"

"তবে কী জন্যে ?"

সুধাকান্তদা সগর্বে বলিলেন, "অন প্রিন্সিপল।"

'প্রিন্সিপল'টা কী সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য সকলে অনুরোধ করাতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাই-সব, বাঘে মানুষ খায়, সেই আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কত বাঘ কত মানুষ খেয়েছে, তাহার কোনো হিসাব আছে কি ? নাই। তবে এ নিশ্চয় যে, বহু হাজার বাঘ বহু লক্ষ মানুষ খেয়েছে। কিন্তু মানুষে কখনো সাহস করে বাঘ খায় নি, বা খাবার সুযোগ পায় নি, বা খাবার কথা চিন্তাও করে নি। আজ শুভ মুহূর্ত সমাগত। লক্ষ লক্ষ খাদিত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এই ব্যাঘ্র-কুলাঙ্গারের মাংস আজ আমি খাব। এ খিদের জন্য খাওয়া নয়, এ প্রতিহিংসার খাওয়া।"

এমন প্রিন্সিপল-বিবৃতির পরে আর তাঁহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। তিনি খানিকটা বাঘের মাংস কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

শেষে শুনিলাম যে, তিনি মাংস লইয়া গিয়া, কুটিয়া, যথারীতি গরম মশলা দিয়া পাক করিয়াছিলেন, কিন্তু খাওয়া হইয়া ওঠে নাই।

কে একজন বলিল, বাঘের মাংস খাইলে পাগল হইয়া যায়।

তাহাতে সুধাকান্তদার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল।

এমন সময় অপর একজন বলিল, কিন্তু পাগলে বাঘের মাংস খাইলে পাগলামি সারিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে।

ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই সুপক্ক ঘৃতসুগন্ধি বাঘের মাংস বাহিরে লইয়া ফেলিয়া দিলেন। খাদিত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিহিংসা-গ্রহণ হইয়া উঠিল না।

যাত্রাগান

যাত্রাগান শুনিতে চিরকাল আমার ভালো লাগে। যাত্রা শুনিবার সুযোগ পাইলেই আমি আসরে গিয়া বসিতাম। বোলপুর শহরে গ্রীষ্মকালে নানা উপলক্ষে যাত্রা-অভিনয় হইয়া থাকে। খবর পাইলেই আমি যাইতাম; রাত্রির অন্ধকার বা পথের দূরত্ব কিছুই বাধা মনে হইত না; সারা রাত্রি গান শুনিয়া ভোরে ফিরিয়া আসিতাম। কিন্তু কোনোদিন যে নিজে যাত্রা লিখিব এমন কল্পনাও করি নাই।

হঠাৎ একদিন বিভূতি গুপ্ত বলিল, যাত্রাপালা লিখিলে হয়। এই বলিয়া সে একটা পালার লেখা দুই-চার পাতা দেখাইল। আমার ভালো লাগিল, পালাটা আমি লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। পালা তো লেখা হইল, এইবার অভিনয়ের কী করা যায়? দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে আইডিয়াটা বলিলাম, তাহারাও উৎসাহ অনুভব করিল।

কিন্তু যাত্রা লেখা এক কথা, আর দশজনকে টানিয়া লইয়া অভিনয় করা সে আর-এক কথা; সেটা তত সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে এমন একজনকে পাইলাম যাঁহাকে আমাদের দলের অধিকারী বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, সংক্ষেপে গোসাঁইজি। গোসাঁইজি শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের সন্তান। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও বৌদ্ধদর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন তাঁহার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার রসজ্ঞান পাণ্ডিত্যের চেয়ে কম নয়; গানে বাজনায় অভিনয়ে ও সাহিত্যালোচনার রসে ভরপুর— একেবারে সরেশ মালপোয়ার মতো। তাঁহার উপরেই প্রযোজনার ও অভিনয়শিক্ষার ভার পড়িল, তিনি দলের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নাটক ও যাত্রা সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে জটিল শিল্প। তাহার এক দিকে লেখক, অন্য দিকে দর্শক; কিন্তু মাঝখানে আছে অভিনেতা, প্রযোজক, গায়ক, নর্তক, মঞ্চসজ্জাকর, চিত্রশিল্পী। এতগুলি লোকের সমবেত চেষ্টায় লেখকের রস সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত হইয়া তবে দর্শকের কাছে পৌঁছায়। তাহাদের চেষ্টার সফলতায় রসের সার্থকতা; তাহাদের চেষ্টা বিফল হইলে ভালো লেখাও ব্যর্থ হইতে পারে। যথার্থ নাটক যৌথশিল্প, কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের কৃতি নয়।

লোকপরিচালনায় আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি একা চলিতে পারি, পাঁচজনকে লইয়া চলিতে জানি না। আর, একা চলিতে গেলে পাঁচজন যেস্থানে যাইবে খুব সম্ভব আমি তাহার বিপরীত পথই ধরিয়া বসিব। এরূপ ক্ষেত্রে গোসাঁইজিকে না পাইলে পালা লেখাই হইত, উহা অভিনয়ের আসর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না। কাজেই যাত্রাপালাগুলির অভিনয়ের জন্য প্রধান কৃতিত্ব গোসাঁইজির। শচীন করের উপর গানের দলটি পরিচালনার ভার ছিল।

অভিনেতার দল জুটিয়া গেল। কাজ বড়ো কম নয়, গান লেখা, গানে সুর দেওয়া, ছেলেদের শেখানো, বাদকসংগ্রহ, অভিনয়শিক্ষা। কিন্তু আশ্রমের সব

শ্রেণীর লোকের এমন উৎসাহ যে কোনো কাজই কঠিন বলিয়া মনে হইল না ; এমন-কি, জগদানন্দবাবুর মতো প্রবীণ লোক ও তেজেশবাবুর মতো গম্ভীর লোকও অভিনয়ের দিন আলখাল্লা পরিয়া বেহালা হাতে করিয়া আসরে নামিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে খোঁজ লইতেন, আমাদের পালাগানের অভ্যাস কিরকম অগ্রসর হইতেছে।

তার পর একদিন রাত্রে আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসর বাঁধিয়া, সামিয়ানা টাঙাইয়া, আলো জ্বালিয়া অভিনয়ের উদ্যোগ হইল। দর্শকদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল, চাকর-বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তিনি আসরে বসিয়া ধৈর্যের সঙ্গে আগাগোড়া শুনিয়াছিলেন।

আমাদের প্রথম পালার নাম 'বীরভূমেশ্বর-পরাজয়'। কাহিনীটার খানিকটা পৌরাণিক, খানিকটা কাল্পনিক। রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব যেন বীরভূমে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ; বীরভূমের রাজা সেই অশ্ব ধরিয়াছেন ; তাঁহার সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও বীরভূমেশ্বরের পরাজয়। রামচন্দ্রের অনুচরদের মধ্যে প্রধান হইলেন হনুমান— হনুমান সাজিবে কে? বাংলাদেশের বাহিরে হনুমানের অসীম প্রতিপত্তি ; অবাঙালী পিতা পুত্রের নাম হনুমানপ্রসাদ রাখিয়া গৌরব অনুভব করে, কিন্তু এমন সাহস কোনো বাঙালী পিতার নাই। কাজেই হনুমান সাজিতে কেহ রাজি হয় না। তখন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অকুতোভয়ে হনুমানরূপে অলংকৃত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অভিনয় এমন স্বাভাবিক হইয়াছিল যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শিল্পীগুরু নন্দলাল বসু মণীন্দ্রভূষণকে আসরের মধ্যে একটি পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বিভূতি গুপ্ত ও সরোজরঞ্জনের তলোয়ার-খেলা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। গোসাঁইজি ও লেখকের জন্য একজোড়া কমিক ভূমিকা ছিল। এজাতীয় অভিনয়ে গোসাঁইজির অসামান্যতা ছিল।

প্রথম পালাটির আশ্চর্য সফলতা দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তখন দ্বিতীয় পালা লিখিয়া ফেলিলাম— 'ঘোষযাত্রা'। এই পালাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন দুষ্প্রাপ্য। ঘোষযাত্রাও আসরে পরমোৎসাহে অভিনীত ও গৃহীত হইল। তার পরে লিখিলাম কর্ণমর্দন, অর্থাৎ কর্ণবধের পালা। কর্ণমর্দন নামটার মধ্যে বোধ করি কিঞ্চিৎ শ্লেষ ছিল ; স্থানীয় কোনো কোনো লোক চটিয়া গেলেন ; শেষে এমন হইল যে, শ্লেষটা লেখকের উপরে বাস্তবিক আকারে

আসিয়া পড়ে আর কি! শেষ পর্যন্ত, লেখকের কান বাঁচিয়া গেলেও যাত্রাপালা রচনার এখানেই শেষ হইল। তখন আমাদের যাত্রার অনেক গান এমন লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে, আশ্রমের অনেকের মুখেই সর্বদা শোনা যাইত। এখনো হয়তো দু-চারটা গান কারো কারো মনে থাকিতে পারে। আমাদের যাত্রা-পালার সাফল্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হইল যাত্রা লিখিবেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "দেখ্, এবার যাত্রাপালা লিখব ভাবছি।" আমি বলিলাম, "সাহিত্যের সব পথই তো আপনার পদচিহ্নিত; এক-আধটা গলিপথও কি আমাদের মতো আনাড়িদের জন্য রাখবেন না?" আমার কথা শুনিয়া তিনি কী ভাবিলেন জানি না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা।" ভাবটা এই, 'ও পথটা তোদেরই ছাড়িয়া দিলাম।'

বিদায়

ক্রমে আমার শান্তিনিকেতন ছাড়িবার সময় আসিল। এবার বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রবেশ করিতে হইবে; সেখানকার পথঘাট, রীতিনীতি, ভালোমন্দ সবই অজানা। এতদিন যাহা সত্য মনে করিয়াছি, যাহাকে জীবনের নিয়ম বলিয়া মানিয়াছি তাহা কি সেখানে স্বপ্ন বলিয়া উপহসিত হইবে না? সেখানে গিয়া কি মনে হইবে না, 'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস'? আবার বহু-কাল সেখানে বাস করিলে একদিন কি শান্তিনিকেতনের জীবনকেই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে না? হয়তো দুটাই স্বপ্ন, দুই রকমের স্বপ্ন। তা যদি হয় তবে কবির স্বপ্নের চেয়ে কর্মীর স্বপ্নকে সুন্দরতর সত্যতর মনে করিবার কী কারণ থাকিতে পারে? কিংবা কবির স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিব কেন? তাহার যে বাস্তব বৃন্ত আছে, তাহাকে স্বপ্ন না বলিয়া দিব্যদর্শন বলাই উচিত।

কৃতী ছাত্রের কৃতিত্বের দ্বারা বিদ্যালয়কে বিচার করিবার নিয়ম প্রচলিত, আমার মনে হয় এ বিচার ন্যায়বিচার নয়। অকৃতী ছাত্রের দ্বারাই বিদ্যালয়ের পরিমাপ হওয়া উচিত। কেবল ইঁটের উপর ইঁট সাজাইয়া অট্টালিকা খাড়া করা যায় না, তাহাদের শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য ইঁট-গুঁড়ানো সুরকির প্রয়োজন; অকৃতী ছাত্রেরা সেই সুরকি। শিকলের শক্তি তাহার দুর্বলতম গ্রন্থিটির উপরেই নির্ভর করে। শান্তিনিকেতনের সেই অকৃতী ছাত্রদলের আমি অন্যতম।

যে বীথিকাগৃহে আমার আশ্রমজীবনের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল সতেরো বছর পরে সেই ঘরেই আমার আশ্রমজীবনের শেষ রাত্রি প্রভাত হইল। তখন গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রম নির্জন। ইতিমধ্যেই পায়ে-চলা পথগুলির উপরে ঘাসের সবুজ আভা দেখা দিয়াছে।

অদূরে বটগাছতলায় জগদানন্দবাবু বসিয়া বইয়ের প্রুফ দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি অর্ধমনস্কভাবে প্রতিবার যেমন বলিয়া থাকেন তেমনি বলিলেন, "কী, চললে? আবার কবে আসছ?" আমি বলিলাম, "আমি তো আর আসব না।" এবারে তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে মাঠের অপর প্রান্তে তাকাইয়া রহিলেন।

পুব দিকের সদর রাস্তার উপরে স্টেশনগামী মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। আমি ধীরপদে দুই দিকে শেষ নজর নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই দিকে চলিলাম। একদিকে কূজনহীন আম্রকুঞ্জ, আর-একদিকে বাসিন্দাহীন বীথিকা গৃহ; প্রথম দৃষ্টির বিস্ময় ও শেষ দৃষ্টির অতৃপ্তির আবহাওয়া তাহার চারি দিকে আর মাঝখানে নিস্তব্ধ নিঃশব্দ বিগতকুসুম শালের শ্রেণী। শিরিষগাছে বাঁধা দোলনাটা পূর্বস্মৃতির সুখে ঈষৎ কম্পিত; শূন্য দেহলী বাড়িটার সুখদুঃখের পালা অবসিত; সম্মুখের আমলকী গাছটার পাতার ঝালরে রী রী কম্পন আজ নিস্তব্ধ, সেখানে কাহারো অতর্কিত আহ্বানে আর কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে না। মেয়ে বোর্ডিঙের দোতালার দরজা জানালাগুলা হা হা এবং ঘরগুলা খাঁ খাঁ করিতেছে। কেবল চালের উপরে শালিখ দম্পতি নীরব। দৃষ্টির দিগন্তের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। আসর যখন ভাঙে এমনি করিয়াই ভাঙে।

মোটর স্টেশনের পথে ছুটিয়া চলিল। পুবে সূর্য ওঠার মাঠ, পশ্চিমে শান্তিনিকেতন-পল্লী, মাঝখানে প্রান্তরের হৃদয়বিদীর্ণ রক্তচিহ্নিত পথটির অফুরন্ত দীর্ঘতা। পুঞ্জিত তরুরাজির অন্তরালে নিচুবাংলার টালির ছাদের চকিত রক্তিমা; বাঁধের জলে ক্ষণিক ইস্পাতের আভাস। মোটর ভুবনডাঙা গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল— এক মুহূর্তে বহুকালের শান্তিনিকেতন তরুশ্রেণীর আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আবার মোটর মাঠের মধ্যে পড়িল। পিছনে পরিচিত আর কোনো চিহ্নই দেখা যায় না: চতুর্দিক অকাল-কুয়াশায় ঝাপসা; আর সম্মুখে কেবল অন্তহীন ধূসর পথ।